প্রচার।

মাসিক পত্র।

তৃতীয় খণ্ড। ১২৯৩-৯৪ সাল।

শ্রীরাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

কলিকাতা
৫ নং প্রতাপ চাটুর্য্যের লেন হইতে
শ্রীউমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত
ও
১০ নং ওল্ড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীট
হেরাল্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কসে
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

সূচী।

প্রচার।

মাসিক পত্র।

৩য় খণ্ড] শ্রাবণ ১২৯৩। [প্রথম সংখ্যা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

[ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি প্রণীত, গীতার ভাষ্য ও টীকা থাকিতে গীতার অন্য ব্যাখ্যা অনাবশ্যক। তবে ঐ সকল ভাষ্য ও টীকা সংস্কৃত ভাষায় প্রণীত। এখনকার দিনে এমন অনেক পাঠক আছেন, যে সংস্কৃত বুঝেন না, অথচ গীতা পাঠে বিশেষ ইচ্ছুক। কিন্তু গীতা এমনই দুরূহ গ্রন্থ যে টীকার সাহায্য ব্যতীত অনেকেরই বোধগম্য হয় না। এইজন্য গীতার একখানি বাঙ্গালা টীকা প্রয়োজনীয়।

বাঙ্গালা টীকা দুই প্রকার হইতে পারে। এক, শঙ্করাদি প্রণীত প্রাচীন ভাষ্যের ও টীকার বাঙ্গালা অনুবাদ দেওয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয়, নূতন বাঙ্গালা টীকা প্রণয়ন করা যাইতে পারে। কেহ কেহ প্রথমোক্ত প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। বাবু হিতলাল মিশ্র, নিজ কৃত অনুবাদে, কখন শঙ্কর ভাষ্যের সারাংশ কখন শ্রীধরস্বামিকৃত টীকার সারাংশ সঙ্কলন করিয়াছেন। পরম বৈষ্ণব ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ দত্ত নিজ কৃত অনুবাদে, অনেক সময়ে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীতা টীকার মর্ম্মার্থ দিয়াছেন। ইহাঁদিগের নিকট বাঙ্গালী পাঠক তজ্জন্য বিশেষ ঋণী। প্রিয়বর শ্রীযুক্ত বাবু ভূধর চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গীতার আর একখানি সংস্করণ প্রকাশে উদ্যত হইয়াছেন; বিজ্ঞাপনে দেখিলাম, তাহাতে শঙ্কর ভাষ্যের অনুবাদ থাকিবে। ইহা বাঙ্গালী পাঠকের বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয়।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন দ্বিতীয় প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি নিজকৃত অনুবাদের সহিত "গীতাসন্দিপনী" নামে একখানি বাঙ্গালা টীকা প্রকাশ করিতেছেন। ইহা সুখের বিষয় যে "গীতা সন্দীপনীতে" গীতার মর্ম্ম পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, সেইরূপ বুঝান হইতেছে। বাঙ্গালী পাঠকেরা শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বাবুর নিকট তজ্জন্য কৃতজ্ঞ হইবেন সন্দেহ নাই।

এই সকল অনুবাদ বা টীকা থাকাতেও, মাদৃশ ব্যক্তির অভিনব অনুবাদ ও টীকা প্রকাশে প্রবৃত্ত হওয়া বৃথা পরিশ্রম বলিয়া গণিত হইতে পারে। কিন্তু ইহার যথার্থ প্রয়োজন না থাকিলে, আমি এই গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতাম না। সে প্রয়োজন কি তাহা বুঝাইতেছি।

এখনকার পাঠকদিগের মধ্যে প্রায় অধিকাংশই "শিক্ষিত" সম্প্রদায় ভুক্ত। যাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, তাঁহাদিগেরই সচরাচর "শিক্ষিত" বলা হইয়া থাকে; আমি প্রচলিত প্রথার বশবর্ত্তী হইয়াই তদর্থে "শিক্ষিত" শব্দ ব্যবহার করিতেছি। কাহারও শিক্ষা বেশী কাহারও শিক্ষা কম, কিন্তু কম হউক, বেশী হউক, এখনকার পাঠক অধিকাংশই "শিক্ষিত" সম্প্রদায় ভুক্ত, ইহা আমার জানা আছে। এখন গোলযোগের কথা এই যে, এই শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রাচীন পণ্ডিতদিগের উক্তি সহজে বুঝিতে পারেন না। বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া দিলেও তাহা বুঝিতে পারেন না। যেমন টোলের পণ্ডিতেরা, পাশ্চাত্যদিগের উক্তির অনুবাদ দেখিয়াও সহজে বুঝিতে পারেন না, যাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত তাঁহারা প্রাচীন প্রাচ্য পণ্ডিতদিগের বাক্য কেবল অনুবাদ করিয়া দিলে সহজে বুঝিতে পারেন না। ইহা তাঁহাদিগের দোষ নহে, তাঁহাদিগের শিক্ষার নৈসর্গিক ফল। পাশ্চাত্য চিন্তা-প্রণালী প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের চিন্তা-প্রণালী হইতে এত বিভিন্ন, যে ভাষার অনুবাদ হইলেই ভাবের অনুবাদ হৃদয়ঙ্গম হয় না। এখন, আমাদিগের "শিক্ষিত" সম্প্রদায়, শৈশব হইতে পাশ্চাত্য চিন্তা-প্রণালীর অনুবর্ত্তী, প্রাচীন ভারতবর্ষীয় চিন্তা-প্রণালী তাঁহাদিগের নিকট অপরিচিত, কেবল ভাষান্তরিত হইলে প্রাচীন ভাব সকল তাঁহাদিগের হৃদয়ঙ্গম হয় না। তাঁহাদিগকে বুঝাইতে গেলে, পাশ্চাত্য প্রথা অবলম্বন করিতে হয়, পাশ্চাত্যভাবের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। পাশ্চাত্য প্রথা অবলম্বন করিয়া, পাশ্চাত্য-ভাবের সাহায্যে গীতার মর্ম্ম তাঁহাদিগকে বুঝান, আমার এই টীকার উদ্দেশ্য।

ইহার আরও বিশেষ প্রয়োজন এই, যে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে যে সকল সংশয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, পূর্ব্বপণ্ডিতদিগের কৃত ভাষ্যাদিতে তাহার মীমাংসা নাই। থাকিবারও সম্ভাবনা নাই, কেন না তাঁহারা যে সকল পাঠকের সাহায্য জন্য ভাষ্যাদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মনে সে সকল সংশয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনাই ছিল না। এই টীকায়, যতর সাধ্য সেই সকল সংশয়ের মীমাংসা করা গিয়াছে।

অতএব, যে সকল পণ্ডিতগণ গীতার ব্যাখ্যা বাঙ্গালায় প্রচার করিয়াছেন, বা করিতেছেন, আমি তাঁহাদিগের প্রতিযোগী নহি; যথাসাধ্য তাঁহাদিগের সাহায্য করি, ইহাই আমার ক্ষুদ্রাভিলাষ। আমিও যতদূর পারিয়াছি, পূর্ব্ব পণ্ডিতদিগের অনুগামী হইয়াছি। আনন্দ-গিরি টীকা সম্বলিত শাঙ্করভাষ্য,

শ্রীধরস্বামীকৃত টীকা রামানুজভাষ্য, মধুসূদন সরস্বতীকৃত টীকা, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীকৃত টীকা ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই টীকা প্রণয়ন করিয়াছি। তবে ইহাও আমাকে বলিতে হইতেছে যে, যে ব্যক্তি পাশ্চাত্য সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং দর্শন অবগত হইয়াছে, সকল সময়েই যে সে প্রাচীনদিগের অনুগামী হইতে পারিবে, এমন সম্ভাবনা নাই। আমিও সর্ব্বত্র তাঁহাদের অনুগামী হইতে পারি নাই। যাঁহারা বিবেচনা করেন, এ দেশীয় পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলই ঠিক, এবং পাশ্চাত্যগণ জাগতিক তত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহা সকলই ভুল, তাঁহাদিগের সঙ্গে আমার কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই।

টীকাই আমার উদ্দেশ্য, কিন্তু মূল ভিন্ন টীকা চলে না, এই জন্য মূলও দেওয়া গেল। অনেক পাঠক অনুবাদ ভিন্ন মূল বুঝিতে সক্ষম নহেন, এজন্য একটা অনুবাদও দেওয়া গেল। বাঙ্গালা ভাষায় গীতার অনেক উৎকৃষ্ট অনুবাদ আছে। পাঠক যেটা ভাল বিবেচনা করেন, সেইটা অবলম্বন করিতে পারেন। সচরাচর যাহাতে অনুবাদ অবিকল হয়, সেই চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু দুই এক স্থানে অর্থব্যক্তির অনুরোধে এ নিয়মের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। }

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয়॥ ১

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, হে সঞ্জয়! পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধার্থী সমবেত আমার পক্ষ ও পাণ্ডবেরা কি করিল? ১।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, মহাভারতের ভীষ্ম পর্ব্বের অন্তর্গত। ভীষ্ম পর্ব্বের ৩ অধ্যায় হইতে ৪৩ অধ্যায় পর্য্যন্ত—এই অংশের নাম ভগবদ্গীতা পর্ব্বাধ্যায়: কিন্তু ভগবদ্গীতার আরম্ভ, পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়ে। তৎপূর্ব্বে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা সকল পাঠক জানিতে না পারেন, এজন্য তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। কেননা, তাহা না বলিলে, ধৃতরাষ্ট্র কেন এই প্রশ্ন করিলেন, এবং সঞ্জয়ই বা কে তা' অনেক পাঠক বুঝিবেন না।

যুধিষ্ঠিরের রাজ্যসমৃদ্ধি দেখিয়া, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্য্যোধন, তাহা অপহরণ

করিবার অভিপ্রায়ে যুধিষ্ঠিরকে কপটদ্যূতে আহ্বান করেন। যুধিষ্ঠির কপট-দ্যূতে পরাজিত হইয়া এই পণে আবদ্ধ হয়েন, যে দ্বাদশ বৎসর তিনি ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ বনবাস করিবেন, তার পর এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিবেন। এই ত্রয়োদশ বৎসর দুর্য্যোধন তাঁহাদিগের রাজ্য ভোগ করিবেন। তারপর, পাণ্ডবেরা এই পণ রক্ষা করিতে পারিলে, আপনাদিগের রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন। পাণ্ডবেরা দ্বাদশ বৎসর বনবাসে এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে যাপন করিলেন, কিন্তু দুর্য্যোধন তাব পর রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। কাজেই পাণ্ডবেরা যুদ্ধ করিয়া স্বরাজ্যের উদ্ধার করিতে প্রস্তুত হইলেন। উভয়পক্ষ সেনা সংগ্রহ করিলেন। উভয়পক্ষীয় সেনা যুদ্ধার্থ কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইল। যখন উভয় সেনা পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছে, কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হয় নাই, তখন এই গীতার আরম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত নহেন—তিনি হস্তিনা নগরে আপনার রাজভবনে আছেন। তাহার কারণ, তিনি জন্মান্ধ, যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া যুদ্ধ দর্শন সুখেও বঞ্চিত। কিন্তু যুদ্ধে কি হয়, তাহা জানিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভগবান্ ব্যাসদেব তাঁহার সম্ভাষণে আসিয়াছিলেন, তিনি অনুগ্রহ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে দিব্যচক্ষু প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন, বলিলেন, যে "আমি জ্ঞাতিবধ সন্দর্শন করিতে অভিলাষ করি না, আপনার তেজঃ-প্রভাবে আদ্যোপান্ত এই যুদ্ধ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিব।" তখন ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী, সঞ্জয়কে বরদান করিলেন। বর-প্রভাবে সঞ্জয় হস্তিনাপুরে থাকিয়াও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বৃত্তান্ত সকল দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইলেন, দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে শুনাইতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্ট্র মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করিতেছেন, সঞ্জয় উত্তর দিতেছেন। মহাভারতের যুদ্ধ পর্ব্বগুলি এই প্রণালীতে লিখিত। সকলই সঞ্জয়োক্তি। এক্ষণে, উভয় পক্ষীয় সেনা, যুদ্ধার্থ পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছে শুনিয়া, ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিতেছেন, উভয় পক্ষ কি করিলেন। গীতার এইরূপ আরম্ভ।

এই দিব্য চক্ষুর কথাটা অনৈসর্গিক, পাঠককে বিশ্বাস করিতে বলি না। গীতোক্ত ধর্ম্মের সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ নাই।

যে ধর্ম্মব্যাখ্যা গীতার উদ্দেশ্য, প্রথমাধ্যায়ে তাহার কিছুই নাই। কি প্রসঙ্গোপলক্ষে এই তত্ত্ব উত্থাপিত হইয়াছিল, প্রথমাধ্যায়ে এবং দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম একাদশ শ্লোকে কেবল তাহারই পরিচয় আছে। গীতার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য এতদংশের কোন প্রয়োজন নাই। পাঠক ইচ্ছা করিলে এতদংশ পরিত্যাগ করিতে পারেন। আমার যে উদ্দেশ্য তাহাতে এতদংশের কোন টীকা লিখিবারও প্রয়োজন নাই। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও এতদংশ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তবে শ্রেণী বিশেষের পাঠক কোন কোন বিষয়ে কিছু জানিতে ইচ্ছা করিতে পারেন। এজন্য দুই একটা কথা লেখা গেল।

কুরুক্ষেত্র একটি চক্র বা জনপদ। ঐ চক্র এখনকার স্থানেশ্বর বা থানেশ্বর নগরের দক্ষিণবর্ত্তী। আম্বালা নগর হইতে উহা ১৫ ক্রোশ দক্ষিণ। পানিপাট হইতে উহা ২০ ক্রোশ উত্তর। কুরুক্ষেত্র ও পানিপাট ভারতবর্ষের যুদ্ধক্ষেত্র, ভারতের ভাগ্য অনেকবার ঐ ক্ষেত্রে নিষ্পত্তি পাইয়াছে। "ক্ষেত্র" নাম শুনিয়া ভরসা করি কেহ একখানি মাঠ বুঝিবেন না। কুরুক্ষেত্র প্রাচীন কালেই পঞ্চ যোজন দীর্ঘে এবং পঞ্চ যোজন প্রস্থে। এইজন্য উহাকে সমন্তপঞ্চক বলা যাইত। চক্রের সীমা এখন আরও বাড়িয়া গিয়াছে।

কুরু নামে একজন চন্দ্রবংশীয় রাজা ছিলেন। তাঁহা হইতেই এই চক্রের নাম কুরুক্ষেত্র হইয়াছে। তিনি দুর্য্যোধনাদির ও পাণ্ডবদিগের পূর্ব্বপুরুষ; এজন্য দুর্য্যোধনাদিকে কৌরব বলা হয়, এবং কখন কখন, পাণ্ডবদিগকেও বলা হয়। তিনি এই স্থানে তপস্যা করিয়া বরলাভ করিয়াছিলেন, এইজন্য ইহার নাম কুরুক্ষেত্র। মহাভারতে কথিত হইয়াছে, যে তাঁহার তপস্যার কারণই উহা পুণ্যতীর্থ। ফলে চিরকালই কুরুক্ষেত্র পুণ্যক্ষেত্র বা ধর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। শতপথ ব্রাহ্মণে আছে, "দেবাঃ হ বৈ সত্রং নিষেদুরগ্নিরিন্দ্রঃ সোমোঃ মখোবিষ্ণুর্ব্বিশ্বেদেবা অন্যত্রৈবাশ্বিভ্যাম্। তেষাং কুরুক্ষেত্রং দেবযজনমাস। তস্মাদাহুঃ কুরুক্ষেত্রং দেবযজনম্।" অর্থাৎ দেবতারা এই স্থানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এজন্য ইহাকে 'দেবতাদিগের যজ্ঞস্থান' বলে।

মহাভারতের বনপর্ব্বের তীর্থযাত্রা পর্ব্বাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে কুরু

ক্ষেত্র ত্রিলোকীর মধ্যে প্রধান তীর্থ। বনপর্ব্বে কুরুক্ষেত্রের সীমা এইরূপ লেখা আছে—"উত্তরে সরস্বতী দক্ষিণে দৃষদ্বতী ; কুরুক্ষেত্র এই উভয় নদীর মধ্যবর্ত্তী।" (৮৩ অধ্যায়) মনুসংহিতায় বিখ্যাত ব্রহ্মাবর্ত্তেরও ঠিক সেই সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

সরস্বতীদৃষদ্বত্যো র্দেবনদ্যো র্যদন্তরং।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে। ২।১৭।

অতএব কুরুক্ষেত্র এবং ব্রহ্মাবর্ত্ত একই। কালিদাসের নিম্নলিখিত কবিতাতে তাহাই বুঝা যাইতেছে।

ব্রহ্মাবর্ত্তং জনপদমথচ্ছায়য়া গাহমানঃ
ক্ষেত্রং ক্ষত্র প্রধনপিশুনং কৌরবং তদ্ভজেথাঃ।
রাজন্যানাং শিতশরশতৈর্যত্র গাণ্ডীবধন্বা
ধারাপাতৈস্তমিবকমলান্যভ্যবর্ষন্মুখানি॥
মেঘদূত ৪৯।

কিন্তু মনুতে আবার অন্যপ্রকার আছে। যথা

কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষি দেশোবৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরঃ॥

অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে চৈনিক পরিব্রাজক হিউন্থসাঙ্ও ইঁহাকে স্বীয় গ্রন্থে "ধর্ম্মক্ষেত্র" বলিয়াছেন।

কুরুক্ষেত্র আজিও পুণ্যতীর্থ বলিয়া ভারতবর্ষে পরিচিত; অনেক যোগী সন্ন্যাসী তথা পরিভ্রমণ করে। কুরুক্ষেত্রে অনেক ভিন্ন ভিন্ন তীর্থ আছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি মহাভারতের যুদ্ধের স্মারক স্বরূপ। যে স্থানে অভিমন্যু সপ্তরথিকর্ত্তৃক অন্যায় যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন, সে স্থানকে এক্ষণে অভিমন্যুক্ষেত্র বা অমিন বলিয়া থাকে। সেখানে আজিও পুত্রহীনারা পুত্রকামনায় অদিতির মন্দিরে অদিতির উপাসনা করে। যেখানে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিহত যোদ্ধাদিগের সৎকার সমাপন হইয়াছিল, ক্ষেত্রের যে ভাগ সেই বীরগণের অস্থিতে সমাকীর্ণ হইয়াছিল; এখনও তাহাকে অস্থিপুর

---

* M. Stanislaus Julien অনুবাদে লিখিয়াছেন, *"Le champ du bonheur,'* অর্থাৎ ধর্ম্মক্ষেত্র।

বলে। যেখানে সাত্যকিতেও ভুরিশ্রবাতে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়, এবং অর্জ্জুন সাত্যকির রক্ষার্থ অন্যায় করিয়া ভুরিশ্রবার বাহুচ্ছেদ করেন, সে স্থানকে এক্ষণে "ভোর" বলে। জনপ্রবাদ আছে যে ভুরিশ্রবা'র সালঙ্কার ছিন্ন হস্ত পক্ষিতে লইয়া যায়। সেই ছিন্ন হস্তের অলঙ্কারে একখণ্ড বহুমূল্য হীরক ছিল। তাহাই কহীনুর, এক্ষণে ভারতেশ্বরীর অঙ্গে শোভা পাইতেছে। কথাটা যে সত্য, তাহার অবশ্য কোন প্রমাণ নাই।

কুরুক্ষেত্রের নাম বাঙ্গালী মাত্রেরই মুখে আছে। একটা কিছু গোল দেখিলে বাঙ্গালীর মেয়েরাও বলে "কুলুক্ষেত্র হইতেছে।" অথচ কুরুক্ষেত্রের সবিশেষ তত্ত্ব কেহই জানে না। বিশেষ টমসন, হুইলর প্রভৃতি ইংরেজ লেখকেরা সবিশেষ না জানিয়া অনেক গোলযোগ বাধাইয়াছেন। তাই কুরুক্ষেত্রের কথা এখানে এত সবিস্তারে লেখা গেল।*

সঞ্জয় উবাচ।

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২ ॥

সঞ্জয় বলিলেন—

ব্যূহিত পাণ্ডবসৈন্য দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধন আচার্য্যের নিকটে গিয়া বলিলেন, (২)

দুর্য্যোধনাদির অস্ত্র বিদ্যার আচার্য্য ভরদ্বাজ পুত্র দ্রোণ। ইনি পাণ্ডবদিগেরও গুরু। ইনি ব্রাহ্মণ। কিন্তু যুদ্ধ বিদ্যায় অদ্বিতীয়। শস্ত্রবিদ্যা

---

* সাহেবদিগের ভ্রমের উদাহরণ স্বরূপ গীতার অনুবাদক টম্সনের টীকা হইতে দুই ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি। কুরুক্ষেত্র সম্বন্ধে লিখিতেছেন,—

"A part of Dharmmakshetra, the flat plain around Dehli, which city is often identified with Hastinapur, the capital of Kurukshetra."

এই টুকুর ভিতর ৫টি ভুল। (১) ধর্ম্মক্ষেত্র নামে কোন স্বতন্ত্র ক্ষেত্র নাই। (২) কুরুক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্রের অংশ মাত্র নহে। (৩) "The flat plain around Dehli কুরুক্ষেত্র নহে। (৪) দিল্লী হস্তিনাপুর নহে। (৫) হস্তিনাপুর কুরুক্ষেত্রের রাজধানী নহে। এতটুকুর ভিতর এতগুলি ভুল একত্র করা যায়, আমরা জানিতাম না।

ক্ষত্রিয়দিগেরই ছিল, এমন নহে। দ্রোণাচার্য্য, পরশুরাম, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, ইঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ, অথচ সচরাচর ক্ষত্রিয়দিগের অপেক্ষা যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। যখন পশ্চাৎ স্বধর্ম্মপালনের কথা উঠিবে তখন এই কথা স্মরণ করিতে হইবে।

যুদ্ধার্থ সৈন্য সন্নিবেশকে ব্যূহ বলে।

সমগ্রস্যাতু সৈন্যস্য বিন্যাসঃ স্থানভেদতঃ।
স ব্যূহ ইতি বিখ্যাতো যুদ্ধেষু পৃথিবীভুজাম্॥

আধুনিক ইউরোপীয় সমরে সেনাপতির ব্যূহ রচনাই প্রধান কার্য্য।

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা॥ ৩॥

হে আচার্য্য! আপনার শিষ্য ধীমান্ দ্রুপদপুত্রের দ্বারা ব্যূহিতা পাণ্ডবদিগের মহতী সেনা দর্শন করুন। ৩।

দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, পাণ্ডবদিগের একজন সেনাপতি। তিনিই ব্যূহ রচনা করিয়াছিলেন। কথিত আছে ইঁহার পিতা দ্রোণবধ কামনায় যজ্ঞ করিলে ইঁহার জন্ম হয়। ইনিও দ্রোণের শিষ্য বলিয়া বর্ণিত হইতেছেন। এ কথাটা স্বধর্ম্মপালন বুঝিবার সময়ে স্মরণ করিতে হইবে। নিজ বধার্থ উৎপন্ন শত্রুকে দ্রোণ শিক্ষা দিয়াছিলেন। আচার্য্যের ধর্ম্ম বিদ্যা দান।

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ॥ ৪॥
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ॥ ৫॥
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাচ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ॥ ৬॥

ইহার মধ্যে শূর, বাণক্ষেপে মহান্, যুদ্ধে ভীমার্জ্জুন তুল্য, যুযুধান, (১) বিরাট, (২) মহারথ দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, (৩) চেকিতান, বীর্য্যবান্ কাশীরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, (৪) নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, বিক্রমশালী যুধামন্যু, বীর্য্যবান্

উত্তমৌজা, সুভদ্রাপুত্র, (৫) দ্রৌপদীর পুত্রগণ, ইহারা সকলেই মহারথ। ৪, ৫, ৬।

(১) যুযুধান—যদুবংশীয় মহাবীর সাত্যকি (২) দ্রুপদ "বিরাট" সাত্যকি, ধৃষ্টকেতু, প্রভৃতি সকলে অক্ষৌহিণীপতি।

(৩) ধৃষ্টকেতু মহাভারতে চেদি দেশের অধিপতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। অন্যবিধ বর্ণনাও আছে। (মহা, উদ্যোগ, ১৭১ অধ্যায়।

(৪) কুন্তিভোজ বংশের নাম। বৃদ্ধ কুন্তিভোজ বসুদেবের পিতা শূরের পিতৃসখ্য-পুত্র। পাণ্ডব-মাতা কুন্তী তাঁহার ভবনে প্রতিপালিতা হয়েন। পুরুজিৎ এ সম্বন্ধে পাণ্ডব মাতুল।

(৫) বিখ্যাত অভিমন্যু।

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ ৭ ॥

হে দ্বিজোত্তম! আমাদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রধান, আমার সৈন্যের নায়ক, তাঁহাদিগের অবগত হউন। আপনার অবগতির জন্য সে সকল আপনাকে বলিতেছি ৭।

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ ॥ ৮ ॥ *

আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, যুদ্ধজয়ী কৃপ, (৬) অশ্বত্থামা, (৭) বিকর্ণ, সোমদত্ত পুত্র (৮) ও জয়দ্রথ (৯) ৮।

(৬) ইনিও ব্রাহ্মণ এবং অস্ত্র বিদ্যায় কৌরবদিগের আচার্য্য।
(৭) দ্রোণপুত্র।
(৮) ইনিই বিখ্যাত ভূরিশ্রবা।
(৯) দুর্য্যোধনের ভগিনীপতি।

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯ ॥

* সৌমদত্তিস্তথৈবচ ইতি পাঠান্তর আছে।

আরও অনেক অনেক বীর আমার জন্য ত্যক্তজীবন হইয়াছেন (অর্থাৎ জীবন ত্যাগে প্রস্তুত হইয়াছেন)। তাঁহারা সকলে নানাস্ত্রধারী এবং যুদ্ধ বিশারদ ॥ ৯ ॥

গীতার প্রথমাধ্যায়ে ধর্ম্মতত্ত্ব কিছু নাই। কিন্তু প্রথম অধ্যায় কাব্যাংশে বড় উৎকৃষ্ট। উপরে উভয় পক্ষের বহু গুণবান সেনানায়কদিগের নাম যে পাঠককে স্মরণ করিয়া দেওয়া হইল, ইহা কবির একটা কৌশল। পশ্চাতে অর্জ্জুনের যে করুণাময়ী মনোমোহিনী উক্তি লিখিত হইয়াছে, তাহা পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য এখন হইতে উদ্যোগ হইতেছে।

অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিবক্ষিতম্।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিবক্ষিতম্॥ ১০॥

ভীষ্মাভিরক্ষিত আমাদিগের সেই সৈন্য অসমর্থ। আর ইহাদিগের ভীমাভিরক্ষিত সৈন্য সমর্থ। ১০।

পর্য্যাপ্ত এবং অপর্য্যাপ্ত শব্দের অর্থ শ্রীধর স্বামির টীকানুসারে করা গেল। অন্যে অর্থ করিয়াছেন—পরিমিত এবং অপরিমিত।

অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্বএব হি॥ ১১॥

আপনারা সকলে স্ব-স্ব বিভাগানুসারে সকল ব্যূহদ্বারে অবস্থিতি করিয়া ভীষ্মকে রক্ষা করুন। ১১।

ভীষ্ম দুর্য্যোধনের সেনাপতি।

তস্য সঞ্জনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনাদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্॥১২॥

(তখন) প্রতাপবান্ কুরুবৃদ্ধ পিতামহ (ভীষ্ম) দুর্য্যোধনের হর্ষ জন্মাইয়া উচ্চ সিংহনাদ করতঃ শঙ্খধ্বনি করিলেন। ১২।

পূর্ব্বকালে রথীগণ যুদ্ধের পূর্ব্বে শঙ্খ-ধ্বনি করিতেন। ভীষ্ম দুর্য্যোধনের পিতামহের ভাই।

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥ ১৩॥

তখন, শঙ্খ, ভেরী, পনব, আনক, গোমুখ সকল (বাদ্যযন্ত্র) সহসা আহত হইলে সে শব্দ তুমুল হইয়া উঠিল। ১৩।

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥ ১৪॥

তখন, শ্বেতাশ্বযুক্ত মহারথে স্থিত কৃষ্ণার্জ্জুন দিব্য শঙ্খ বাজাইলেন। ১৪।

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ ॥ ১৫॥
অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬॥

কৃষ্ণ পাঞ্চজন্য নামে শঙ্খ, অর্জ্জুন দেবদত্ত এবং ভীমকর্ম্মা ভীম পৌণ্ড্র নামে মহাশঙ্খ বাজাইলেন। কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয়, নকুল সুঘোষ, এবং সহদেব মণিপুষ্পক (নামে) শঙ্খ বাজাইলেন। ১৫।১৬।

কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭॥
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮॥

পরম ধনুর্দ্ধর কাশীরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, অপরাজিত সাত্যকি, দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, মহাবাহু সুভদ্রাপুত্র,—হে পৃথিবীপতে— ইঁহারা সকলেই পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খ বাজাইলেন। ১৭ ১৮।

স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্ ॥ ১৯ ॥*

সেই শব্দ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগের হৃদয় বিদীর্ণ করিল ও আকাশ এবং পৃথিবীকে তুমুল ধ্বনিত করিল। ১৯।

---

* তুমুলোব্যনুনাদয়ন্ ইতি পাঠান্তর আছে।

সীতারাম।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ভূষণা দখল হইল। যুদ্ধে সীতারামের জয় হইল। তোরাব খাঁ মেনাহাতির হাতে মারা পড়িলেন। সে সকল ঐতিহাসিক কথা। কাজেই আমাদের কাছে ছোট কথা। আমরা তাহার বিস্তারিত বর্ণনায় কালক্ষেপ করিতে পারি না। উপন্যাস লেখক অন্তর্বিষয়ের প্রকটনে যত্নবান হইবেন—ইতিবৃত্তের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখা নিষ্প্রয়োজনীয়।

ভূষণা অধিকৃত হইল। বাদশাহী সনদের বলে এবং নিজ বাহুবলে সীতারাম বাঙ্গালার দ্বাদশ ভৌমিকের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়া মহারাজা উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক প্রচণ্ড প্রতাপে শাসন আরম্ভ করিলেন।

শাসন সম্বন্ধে আগেই গঙ্গারামের দণ্ডের কথাটা উঠিল। তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণের অভাব ছিল না। পতিপ্রাণা অপরাধিনী রমাই সমস্ত বৃত্তান্ত অকপটে সীতারামের নিকট প্রকাশ করিল। বাকি যে টুকু সে টুকু মুরলা ও চাঁদশাহ ফকির সকলই প্রকাশ করিল। কেবল গঙ্গারামকে জিজ্ঞাসা করা বাকি—এমন সময়ে এ কথা লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হইল।

কথা গুলা রমা, অন্তঃপুরে বসিয়া, সীতারামের কাছে, চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে বলিল। সীতারাম তাহার একবর্ণ অবিশ্বাস করিলেন না। বুঝিলেন সরলা রমা নিরপরাধিনী, অপরাধের মধ্যে কেবল পুত্রস্নেহ। কিন্তু সাধারণ পুরবাসী লোক তাহা ভাবিল না। গঙ্গারাম কয়েদ হইল কেন? এই কথাটা লইয়া সহরে বড় আন্দোলন পড়িয়া গেল। কতক মুরলার দোষে, কতক সেই পাহারাওয়ালা পাঁড়ে ঠাকুরের গল্পের জাঁকে,

রমার নামটা সেই সঙ্গে লোকে মিশাইতে লাগিল। কেহ বলিল যে গঙ্গারাম মোগলকে রাজ্য বেচিতে বসিয়াছিল, কেহ বলিল যে সে ছোট রাণীর মহলে গিরেপ্তার হইয়াছিল, কেহ বলিল দুই কথাই সত্য, আর রাজ্য বেচার পরামর্শে ছোট রাণীও ছিলেন। রাজার কাণে এত কথা উঠে না, কিন্তু রাণীর কানে উঠে—মেয়ে মহলে এ রকম কথা গুলা সহজে প্রচার পায়—শাখা প্রশাখা সমেত। দুই রাণীর কানেই কথা উঠিল। রমা শুনিয়া শয্যা লইল, কাঁদিয়া বালিশ ভাসাইল, শেষ গলায় দড়ি দিয়া কি জলে ডুবিয়া মরা ঠিক করিল। নন্দা শুনিয়া বুদ্ধিমতীর মত কাজ করিল।

নন্দা খুঁজিয়া খুঁজিয়া রমা যেখানে বালিশে মুখ ঝাঁপিয়া কাঁদিতেছে, আর পুকুরে ডুবিয়া মরা সোজা কি গলায় দড়ি দিয়া মরা সোজা, ইহার যতদূর সাধ্য মিমাংসা করিতেছে, সেইখানে গিয়া তাহাকে ধরিল। বলিল,

"দেখিতেছি, তুমিও এ ছাই কথা শুনিয়াছ?" রমা কেবল ঘাড় নাড়িল—অর্থাৎ "শুনিয়াছি।" চক্ষের জল বড় বেশী ছুটিল।

নন্দা তাহার চক্ষের জল মুছাইয়া, সস্নেহ বচনে বলিল, "কাঁদিলে কলঙ্ক যাবে না, দিদি! না কাঁদিয়া, যাতে এ কলঙ্ক মুছিয়া তুলিতে পারি, তাই করিতে হইবে। পারিস ত উঠিয়া বসিয়া ধীরে সুস্থে আমাকে সকল কথা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বল্ দেখি। এখন আমাকে সতীন্ ভাবিস না—কালি চুন তোর গালে পড়ুক না পড়ুক, রাজারই বড় মাথা হেঁট হয়েছে। তিনি তোর ও প্রভু—আমারও প্রভু; এ লজ্জা আমার চেয়ে তোর যে বেশী তা মনে করিস্ না। আর মহারাজা আমাকে অন্তঃপুরের ভার দিয়া গিয়াছিলেন,—তাঁর কানে এ কথা উঠিলে আমি কি জবাব দিব?"

রমা বলিল, "যাহা যাহা হইয়াছিল, আমি তাঁহাকে বলিয়াছি। তিনি আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন। আমার ত কোন দোষ নাই।"

নন্দা। তা বলিতে হইবে না—তোর যে কোন দোষ নাই, সে কথা আমায় বলিয়া কেন দুঃখ পাস্। তবে কি হইয়াছিল, তা আমাকে বলিস না বলিস—

রমা। বলিব না কেন? আমি একথা সকলকেই বলিতে পারি।

এই বলিয়া রমা চক্ষের জল সামলাইয়া উঠিয়া বসিয়া, সকল কথা যথার্থ রূপে নন্দাকে বলিল। নন্দার সে কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিল। নন্দা বলিল,

"যদি ঘুণাক্ষরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া এ কাজ করিতে দিদি, তবে কি এত কাণ্ড হইতে পায়? তা যাক্—যা হয়ে গিয়েছে, তার জন্য তিরস্কার করিয়া এখন আর কি হইবে? এখন যাহাতে আবার মান সম্ভ্রম বজায় হয়, তাই করিতে হইবে।"

রমা। যদি তা না কর দিদি, তবে তোমায় নিশ্চিত বলিতেছি, আমি জলে ডুবিয়া মরিব কি গলায় দড়ি দিয়া মরিব। আমি ত রাজার মহিষী—এমন কাঙ্গাল গরিব ভিখারীর মেয়ে কে আছে যে এ অপবাদ হইলে আর প্রাণ রাখিতে চায়?

নন্দা। মরিতে হইবে না, দিদি! কিন্তু একটা খুব সাহসের কাজ করিতে পারিস্? বোধ হয়, তা হলে কাহারও মনে আর কোন সন্দেহ থাকিবে না।

রমা। এমন কাজ নাই যে এর জন্য আমি করিতে পারি না। কি করিতে হইবে?

নন্দা। তুমি যে রকম করিয়া আমার কাছে সকল কথা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বলিলে, এই রকম করিয়া তুমি যার সাক্ষাতে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বলিবে সেই তোমার কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিবে, ইহা আমার নিশ্চিত বিবেচনা হয়। যদি রাজধানীর লোক সকলে তোমার মুখে এ কথা শুনে, তবে আর এ কলঙ্ক থাকে না।

রমা। তা, কি প্রকারে হইবে?

নন্দা। আমি মহারাজকে বলিয়া দরবার করাইব। তিনি ঘোষণা দিয়া সমস্ত নগরবাসীকে সেই দরবারে উপস্থিত করিবেন; সেখানে গঙ্গারামের সাক্ষাৎকারে, সমস্ত নগরবাসীর সাক্ষাৎকারে, তুমি এই কথা গুলি বলিবে। আমরা রাজমহিষী, সূর্য্যও আমাদিগকে দেখিতে পান না, এই সমস্ত নগর-বাসীর সম্মুখে বাহির হইয়া, মুক্তকণ্ঠে তুমি এই সকল কথা কি বলিতে পারিবে? পার ত সব কলঙ্ক হইতে আমরা মুক্ত হই।

রমা তখন সিংহীর মত গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল, "তুমি সমস্ত নগরবাসী কি বলিতেছ দিদি! সমস্ত জগতের লোক জমা কর, আমি জগতের লোকের সম্মুখে মুক্তকণ্ঠে এ কথা বলিব।"

নন্দা। পারিবি?

রমা। পারিব—নহিলে মরিব।

নন্দা। আচ্ছা, তবে আমি গিয়া মহারাজকে বলিয়া দরবারের বন্দোবস্ত করাই। তুই আর কাঁদিস না।

নন্দা উঠিয়া গেল। রমাও শয্যা ত্যাগ করিয়া, চোখের জল মুছিয়া, পুত্রকে কোলে লইয়া মুখচুম্বন করিল। এতক্ষণ তাহাও করে নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নন্দা রাজাকে সম্বাদ দিয়া অন্তঃপুরে আনাইল। যে কুরব উঠিয়াছে, সকলেই যাহা বলিতেছে, তাহা রাজাকে শুনাইল। তার পর রমার সঙ্গে নন্দার যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা সকলই অবিকল তাঁহাকে বলিল। তার পর বলিল, "আমরা দুইজনে গলায় কাপড় দিয়া তোমার পায়ে লুটাইয়া (বলিবার সময়ে নন্দা গলায় কাপড় দিয়া জুস্থু পাতিয়া বসিয়া, দুই হাতে দুই পা চাপিয়া ধরিল) পায়ে লুটাইয়া বলিতেছি, যে এখন তুমি আমাদের মান রাখ, এ কলঙ্ক হইতে উদ্ধার কর, নহিলে আমরা দুইজনেই আত্মহত্যা করিয়া মরিব।"

সীতারাম বড় বিষণ্ণভাবে কলঙ্কের জন্যেও বটে, নন্দার প্রস্তাবের জন্যও বটে, বলিলেন,

"রাজার মহিষী—আমি কি প্রকারে দরবারে বাহির করিব? কি প্রকারে আপনার মহিষীকে সামান্যা কুলটার ন্যায় বিচারালয়ে খাড়া করিয়া দিব?"

নন্দা। তুমি যেমন বুঝিবে, আমরা কিন্তু তেমন বুঝিবনা; কিন্তু সে বেশী লজ্জা, না রাজমহিষীর কুলটা অপবাদ বেশী লজ্জা?

সীতা। এরূপ মিথ্যা অপবাদ রাজার ঘরে, সীতা হইতে চলিয়া

আসিতেছে। প্রথামত কাজ করিতে হইবে, এত কাণ্ড না করিয়া, সীতার ন্যায় রমাকে আমার ত্যাগ করাই শ্রেয়। তাহা হইলে আর কোন কথা থাকে না।

নন্দা। মহারাজ! নিরপরাধিনীকে ত্যাগ করিবে, তবু তার বিচার করিবে না? এই কি তোমার রাজধর্ম্ম? রামচন্দ্র করিয়াছিলেন বলিয়া কি তুমিও করিবে? যিনি পূর্ণ ব্রহ্ম, তাঁর আর ত্যাগই কি গ্রহণই বা কি? তোমার কি তা সাজে মহারাজ!

সীতা। এই সমস্ত প্রজা, শত্রু মিত্র, ইতর ভদ্র লোকের সাক্ষাতে আপনার মহিষীকে কুলটার ন্যায় খাড়া করিয়া দিতে আমার বুক কি ভাঙ্গিয়া যাইবে না? আমি ত পাষাণ নহি?

নন্দা। মহারাজ—যখন পঞ্চাশ হাজার লোকের সামনে, শ্রী, গাছের ডালে চড়িয়া নাচিয়াছিল, তখন কি তোমার বুক দশ হাত হইয়াছিল?

সীতারাম নন্দার প্রতি ক্রূর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। বলিলেন, "তা হয়েছিল, নন্দা! আবার তেমন হইল না, সেই দুঃখই আমার বেশী।"

ইট্‌টী মারিয়া, পাটখেল খাইয়া, নন্দা যোড় হাতে ক্ষমা প্রার্থনা করিল। যোড় হাত করিয়া, নন্দা জিঁতিয়া গেল। সীতারাম শেষ দরবারে সম্মত হইলেন। বুঝিলেন, ইহা না করিলে রমাকে ত্যাগ করিতে হয়। অথচ রমা নিরপরাধিনী। কাজেই দরবার ভিন্ন আর কর্ত্তব্য নাই।

বিষণ্ণভাবে রাজা, চন্দ্রচূড়ের নিকটে আসিয়া দরবারের কর্ত্তব্যতা নিবেদিত হইলেন। ব্রাহ্মণ ঠাকুরের আব্রু পরদার উপর ততটা শ্রদ্ধা হইল না। তিনি সাধুবাদ করিয়া সম্মত হইলেন। তাঁর কেবল ভয়, রমা কথা কহিতে পারিবে না। সীতারামেরও সে ভয় ছিল। সে যদি না পারে, তবে সকল দিক যাইবে। তাই দরবারে আরও অনিচ্ছুক ছিলেন। তবে রাজা রাজপুরুষেরা সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলেন না—এই জন্য তিনি নন্দাকে কেবল আব্রু পরদার কথা বলিয়া ভুলাইতেছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

তখন সীতারাম ঘোষণা করিলেন, যে আমদরবারে গঙ্গারামের বিচার হইবে। রাজার আজ্ঞানুসারে সমস্ত নগরবাসী উপস্থিত হইয়া বিচার দর্শন করিবে। আজ্ঞা পাইয়া অবধারিত দিবসে, সহস্র সহস্র প্রজাবৃন্দ আসিয়া দরবার পরিপূর্ণ করিল। দিল্লীর অনুকরণে সীতারাম ও এক "দরবারে আম" প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আজিকার দিন তাহা রাজ কর্ম্মচারিদিগের যত্নে সুসজ্জিত হইয়াছিল। দিল্লীর মত তাঁহার রূপার চাদনি, মতির ঝালর ছিল না, কিন্তু তথাপি চন্দ্রাতপ পট্টবস্ত্র নির্ম্মিত, তাহাতে জরির কাজ। স্তম্ভ সকল সেই রূপ কারুকার্য্যখচিত, পট্টবস্ত্রে আবৃত। নানাচিত্রবর্ণরঞ্জিত কোমল গালিচায় সভামণ্ডপ শোভিত, তাহার চারি পার্শ্বে বিচিত্রপরিচ্ছদধারী সৈনিকগণ সশস্ত্রে শ্রেনীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান। বাহিরে অশ্বরূঢ় রক্ষিবর্গ শান্তি রক্ষা করিতেছে। সভা মণ্ডপমধ্যে উচ্চ বেদীর উপর সীতারামের জন্য স্বর্ণখচিত, রৌপ্যনির্ম্মিত, মুক্তাঝালরশোভিত সিংহাসন রক্ষিত হইয়াছে।

ক্রমে ক্রমে দুর্গ লোকারণ্য হইয়া উঠিল। সভা মণ্ডপ মধ্যে কেবল উচ্চ শ্রেণীর লোকেরাই স্থান পাইল। নিম্ন শ্রেণীর লোকে সহস্রে সহস্রে সভা মণ্ডপ পরিবেষ্টিত করিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল।

বাতায়ন হইতে এই মহাসমারোহ দেখিতে পাইয়া, মহারাজ্ঞী নন্দা দেবী, রমাকে ডাকিয়া আনিয়া এই ব্যাপার দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কেমন, এই সমারোহের মধ্যস্থানে দাঁড়াইয়া বলিতে পারিবে? সাহস হইতেছে ত?"

রমা। যদি আমার স্বামীপদে ভক্তি থাকে তবে নিশ্চয় পারিব।

নন্দা। আমরা কেহ সঙ্গে যাইব? বল ত আমি যাই?

রমা। তুমি ও কেন আমার সঙ্গে এ অসম্ভ্রমের সমুদ্রে ঝাঁপ দিবে? কাহাকে যাইতে হইবে না। কেবল একটা কাজ করিও। যখন আমার কথা কহিবার সময় হইবে, তখন যেন আমার ছেলেকে কেহ লইয়া গিয়া আমার নিকট দাঁড়ায়। তাহার মুখ দেখিলে আমার সাহস হইবে।

নন্দা স্বীকৃত হইয়া বলিল, "এখন সভামধ্যে যাইতে হইবে, একটু কাপড় চোপড় দুরস্ত করিয়া নাও। এই বেলা প্রস্তুত হও।"

রমা স্বীকৃত হইয়া আপনার মহলে গেল। সেখানে ঘর রুদ্ধ করিয়া মাটিতে পড়িয়া, যুক্ত করে ডাকিতে লাগিল, "জয় লক্ষ্মীনারায়ণ! জয় জগদীশ্বর! আজিকার দিনে আমার যাহা বলিবার তাহা বলিয়া, আমি যদি তার পর জন্মের মত বোবা হই, তাহা ও আমি তোমার কাছে ভিক্ষা করি। আজিকার দিন সভা মধ্যে আপনার কথা বলিয়া, আর কখন ইহ জন্মে কথা না কই, তাও তোমার কছে ভিক্ষা করি। আজিকার দিন মুখ রাখিও! তার পর মরণে আমার কোন দুঃখ থাকিবে না।"

তার পর বেশ পরিবর্ত্তনের কথাটা মনে পড়িল। রমা, ধাত্রীদিগের একখানা সামান্য বস্ত্র চাহিয়া লইয়া তাই পরিয়া সভামণ্ডপে যাইতে প্রস্তুত হইল। নন্দা দেখিয়া বলিল "এ কি এ?"

রমা বলিল, "আজ আমার সাজিবার দিন নয়। বিধাতা যদি আবার কখন সাজিবার দিন দেন, তবে আবার সাজিব। নহিলে এই সাজাই শেষ। এই বেশেই সভায় যাইব।"

নন্দা বুঝিল, ইহা উপযুক্ত। আর কোন আপত্তি করিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যথাকালে, মহারাজা সীতারাম রায় সভাস্থলে সিংহাসনে গিয়া বসিলেন। নকিব স্তুতিবাদ করিল, কিন্তু গীত বাদ্য সে দিন নিষেধ ছিল।

তখন শৃঙ্খলাবদ্ধ গঙ্গারাম, সম্মুখে আনীত হইল। তাহাকে দেখিবার জন্য বাহিরে দণ্ডায়মান জনসমূহ বিচলিত ও উন্মুখ হইয়া উঠিল। শান্তিরক্ষকেরা তাহাদিগকে শান্ত করিল।

রাজা তখন গঙ্গারামকে গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "গঙ্গারাম! তুমি আমার কুটুম্ব, আত্মীয়, প্রজা এবং বেতনভোগী। আমি তোমাকে বিশেষ

স্নেহ ও অনুগ্রহ করিতাম, তুমি বড় বিশ্বাসের পাত্র ছিলে. ইহা সকলেই জানে। একবার আমি তোমার প্রাণও রক্ষা করিয়াছি। তার পর, তুমি বিশ্বাসঘাকতার কাজ করিলে কেন? তুমি রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।"

গঙ্গারাম বিনীতভাবে বলিল. "কোন শত্রুতে আপনার কাছে আমার মিথ্যাপবাদ দিয়াছে। আমি কোন বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করি নাই। মহারাজ স্বয়ং আমার বিচার করিতেছেন—ভরসা করি ধর্ম্মশাস্ত্র সম্মত প্রমাণ না পাইলে আমার কোন দণ্ড করিবেন না।"

রাজা। তাহাই হইবে। ধর্ম্মশাস্ত্র সম্মত যে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা শুন, আর যথাসাধ্য উত্তর দাও।

এই বলিয়া রাজা চন্দ্রচূড়কে অনুমতি করিলেন, যে "আপনি যাহা জানেন, তাহা ব্যক্ত করুন।"

তখন চন্দ্রচূড় যাহা জানিতেন, তাহা সবিস্তারে সভামধ্যে বিবৃত করিলেন। তাহাতে সভাস্থ সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইল যে. যে দিন মুসলমান, দুর্গ আক্রমণ করিবার জন্য নদী পার হইতেছিল, সে দিন চন্দ্রচূড়ের পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও গঙ্গারাম দুর্গ রক্ষার কোন চেষ্টা করেন নাই। চন্দ্রচূড়ের কথা সমাপ্ত হইলে, রাজা গঙ্গারামকে আজ্ঞা করিলেন,

"নরাধম! ইহার কি উত্তর দাও?"

গঙ্গারাম, যুক্ত করে বলিল, "ইনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত. ইনি যুদ্ধের কি জানেন? মুসলমান এপারে আসেও নাই, দুর্গ আক্রমণও করে নাই। যদি তাহা করিত, আর আমি তাহাদের না হঠাইতাম, তবে ঠাকুর মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা শিরোধার্য্য হইত। মহারাজ! দুর্গ মধ্যে আমিও বাস করি; দুর্গের বিনাশে আমার কি লাভ?"

রাজা। কি লাভ, তাহা আর এক জনের নিকট শুন।

এই বলিয়া রাজা চাঁদশাহ ফকিরকে আজ্ঞা করিলেন, "আপনি যাহা জানেন তাহা বলুন।

চাঁদশাহ তখন দুর্গ আক্রমণের পূর্ব্ব রাত্রে তোরাবখাঁর নিকট গঙ্গারামের গমন বৃত্তান্ত যাহা জানিতেন, তাহা বলিলেন। রাজা তখন গঙ্গারামকে আজ্ঞা করিলেন,

"ইহার কি উত্তর দাও ?"

গঙ্গারাম বলিল, "আমি সে রাত্রে তোরাবখাঁর নিকট গিয়াছিলাম বটে। বিশ্বাসঘাতক জানিয়া, কুপথে আনিয়া তাঁহাকে গড়ের নীচে আনিয়া টিপিয়া মারিব—আমার এই অভিপ্রায় ছিল।"

রাজা। সে জন্য তোরাবখাঁর কাছে কিছু পুরস্কার প্রার্থনা করিয়াছিলে ?

গঙ্গারাম। নহিলে তাহার বিশ্বাস জন্মিবে কেন ?

রাজা। কি পুরস্কার চাহিয়াছিলে ?

গঙ্গারাম। অর্দ্ধেক রাজ্য।

রাজা। আর কিছু ?

গঙ্গা। আর কিছু না।

তখন রাজা চাঁদশাহ ফকিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি সে কথা কিছু জানেন ?"

চাঁদশাহ। জানি।

রাজা। কি প্রকারে জানিলেন ?

চাঁদ। আমি মুসলমান ফকির, তোরাব খাঁর কাছে যাতায়াত করিতাম। তিনিও আমাকে বিশেষ আদর করিতেন। আমি কখন তাঁহার কথা মহারাজের কাছে বলিতাম না, অথবা মহারাজের কথা তাঁহার কাছে বলিতাম না। এজন্য কোন পক্ষ বলিয়া গণ্য নহি। এখন তিনি গত হইয়াছেন, এখন ভিন্ন কথা। যে দিন তিনি মহারাজের হাতে ফতে হইয়া মধুমতীর তীর হইতে প্রস্থান করেন, সেই দিন তাঁহার সঙ্গে পথিমধ্যে আমার দেখা হইয়াছিল। তখন গঙ্গারামের বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। গঙ্গারাম তাঁহাকে প্রতারণা করিয়াছে, এই বিবেচনায় তিনি আপনা হইতেই সে সকল কথা আমাকে বলিয়াছিলেন। গঙ্গারাম অর্দ্ধেক রাজ্য পুরস্কারস্বরূপ চাহিয়াছিল বটে, কিন্তু আরও কিছু চাহিয়াছিল। তবে সে কথা হুজুরে নিবেদন করিতে বড় ভয় পাই—অভয় ভিন্ন বলিতে পারি না।

রাজা। নির্ভয়ে বলুন।

চাঁদ। দ্বিতীয় পুরস্কার মহারাজের কনিষ্ঠা মহিষী।

দর্শকমণ্ডলী সমুদ্রবৎ গর্জ্জিয়া উঠিল—গঙ্গারামকে নানাবিধ গালি পাড়িতে লাগিল। শান্তিরক্ষকেরা শান্তি রক্ষা করিল। গঙ্গারাম বলিল,

"মহারাজ! এ অতি অসম্ভব কথা। আমার নিজের পরিবার আছে—মহারাজের অবিদিত নাই। আর আমি নগররক্ষক—স্ত্রীলোকে আমার রুচি থাকিলে, আমার দুষ্প্রাপ্য বড় অল্প। আমি মহারাজের কনিষ্ঠা মহিষী কখন দেখি নাই—কিজন্য তাঁহাকে কামনা করিব?

রাজা। তবে, তুমি কুকুরের মত রাত্রে লুকাইয়া আমার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে কেন?

গঙ্গারাম। কখন না।

তখন সেই পাঁড়েঠাকুর পাহারাওয়ালাকে তলব হইল। পাঁড়েঠাকুর, দাড়ি নাড়িয়া বলিলেন, যে গঙ্গারাম প্রত্যহ গভীর রাত্রে মুরলার সঙ্গে, তাহার ভাই পরিচয়ে, অন্তঃপুরে যাতায়াত করিত।

শুনিয়া গঙ্গারাম বলিল, "মহারাজ ইহা সম্ভব নহে। মুরলার ভাইকেই বা ঐ ব্যক্তি পথ ছাড়িয়া দিবে কেন?"

তখন পাঁড়েঠাকুর উত্তর করিলেন, যে তিনি গঙ্গারামকে বিলক্ষণ চিনিতেন তবে কোতোয়ালকে তিনি রোখেন কি প্রকারে? এজন্য চিনিয়াও চিনিতেন না।

গঙ্গারাম দেখিল, ক্রমে গতিক মন্দ হইয়া আসিল। এক ভরসা মনে এই উদয় হইল, যে মুরলা নিজে কখনও এ সকল কথা প্রকাশ করিবে না—কেন না তাহা হইলে সেও দণ্ডনীয়—তার কি আপনার প্রাণের ভয় নাই? তখন গঙ্গারাম বলিল,

"মুরলাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা হউক—কথা সকলই মিথ্যা প্রকাশ পাইবে।"

বেচারা জানিত না যে মুরলাকে, মহারাজ্ঞী শ্রীমতী নন্দা ঠাকুরাণী পূর্ব্বেই হাত করিয়া রাখিয়াছিলেন। নন্দা, মুরলাকে বুঝাইয়াছিল, যে "মহারাজা স্ত্রীহত্যা করেন না—তোর মরিবার ভয় নাই। স্ত্রীলোককে শারীরিক কোন রকম সাজা দেন না। অতএব বড় সাজার তোর ভয় নাই। কিছু সাজা তোর হইবেই হইবে। তবে, তুই যদি সত্য কথা বলিস্—তোর সাজা বড়

কম হবে।” মুরলাও তাহা বুঝিয়াছিল, সুতরাং সব কথা ঠিক বলিল—কিছুই ছাড়িল না—আড়াইটা বিবাহের বাজটাও ছাড়িল না। শুনিয়া বাহিরের দর্শকমণ্ডলী মধ্যে অস্ফুট স্বরে কেহ কেহ বলিল, “আমি, আমি রাজি।” কেহ বা বলিল, “মাসী, আমার খুড়ো রাজি।”

মুরলার কথা গঙ্গারামের মাথায় বজ্রাঘাতের মত পড়িল। তথাপি সে আশা ছাড়িল না। বলিল, “মহারাজ! এ স্ত্রীলোক অতি কুচরিত্রা। আমি নগর মধ্যে ইহাকে অনেকবার ধরিয়াছি, এবং কিছু শাসনও করিতে হইয়াছিল। বোধ হয় সেই রাগে এসকল কথা বলিতেছে।”

রাজা। তবে কার কথায় বিশ্বাস করিব, গঙ্গারাম? খোদ মহারাণীর কথা বিশ্বাসযোগ্য কি?

গঙ্গারাম যেন হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইল। তাহার নিশ্চিত বিশ্বাস, যে রমা কখন এ সভামধ্যে আসিবে না, বা এ সভায় এ সকল কথা বলিতে পারিবে না। গঙ্গারাম বলিল,

“অবশ্য বিশ্বাস যোগ্য। তাঁর কথায় যদি আমি দোষী হই, আমাকে সমুচিত দণ্ড দিবেন।”

রাজা অন্তঃপুর অভিমুখে দৃষ্টি করিলেন। তখন গঙ্গারাম সবিস্ময়ে দেখিল, অতি ধীরে ধীরে, সশঙ্কিত শিশুর মত, এক মলিনবেশধারিনী অবগুণ্ঠনবতী রমণী সভামধ্যে আসিতেছে। যে রূপ, গঙ্গারামের হাড়ে হাড়ে আঁকা, তাহা দেখিবাই চিনিল। গঙ্গারাম বড় শঙ্কিত হইল। দর্শকমণ্ডলী মধ্যে মহা কোলাহল পড়িয়া গেল। শান্তি রক্ষকেরা তাহাদের থামাইল।

রমা আসিয়া আগে রাজাকে, পরে গুরু চন্দ্রচূড়কে দূর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া সর্ব্বসমক্ষে দাঁড়াইল—মলিনবেশেও রূপ রাশি উছলিয়া পড়িতে লাগিল। চন্দ্রচূড় দেখিল, রাজা কথা কহিতে পারিতেছেন না—অধোবদনে আছেন। তখন চন্দ্রচূড় রমাকে বলিলেন,

“মহারাণি! এই গঙ্গারামের বিচার হইতেছে। এ ব্যক্তি কখন আপনার অন্তঃপুরে গিয়াছিল কি না, গিয়া থাকে তবে কেন গিয়াছিল, আপনার

সঙ্গে কি কি কথা হইয়াছিল, সব স্বরূপ বলুন। রাজার আজ্ঞা, আর আমি তোমার গুরু, আমারও আজ্ঞা, সকল কথা সত্য বলিবে।”

রমা গ্রীবা উন্নত করিয়া গুরুকে বলিল, “রাজার রাণীতে কখন মথ্যা বলে না। আমরা যদি মিথ্যাবাদিনী হইতাম, তবে এই সিংহাসন এত দিন ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া যাইত।”

দর্শকমণ্ডলী বাহির হইতে জয়ধ্বনি দিল—“জয় মহারাণীজিকী!”

রমা সাহস পাইয়া বলিতে লাগিল, “বলিব কি গুরুদেব! আমি রাজার মহিষী—রাজার ভৃত্য আমার ভৃত্য—আমি যে আজ্ঞা করিব—রাজার ভৃত্য তা কেন পালন করিবে না? আমি রাজকার্য্যের জন্য কোতোয়ালকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলাম—কোতোয়াল আসিয়া আজ্ঞা শুনিয়া গিয়াছিল—তার আর বিচারই বা কেন, আমি বলিবই বা কি?”

কথা শুনিয়া দর্শকমণ্ডলী এবার আর জয়ধ্বনি করিল না—অনেকে বিষণ্ণ হইল—অনেকে বলিল—“কবুল।” চন্দ্রচূড় বলিলেন,

“এমন কি রাজকার্য্য মা! যে রাত্রে কোতোয়ালকে ডাকিতে হয়?”

রমা তখন বলিল, “তবে সকল কথা শুনুন।” এই বলিয়া রমা, দেখিল, পুত্র কোথা? পুত্র সুসজ্জিত হইয়া ধাত্রীক্রোড়ে। মুখ দেখিয়া সাহস পাইল। তখন রমা সবিশেষ বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিল।

প্রথমে অতি ধীরে ধীরে, অতি দূরাগত সঙ্গীতের মত, রমা বলিতে লাগিল—সকলে শুনিতে পাইল না। বাহিরের দর্শকমণ্ডলী বলিতে লাগিল, “মা! আমরা শুনিতে পাইতেছি না—আমরা শুনিব।” রমা আরও একটু স্পষ্ট বলিতে লাগিল। ক্রমে আরও স্পষ্ট—আরও স্পষ্ট। তার পর যখন রমা, পুত্রের বিপদ শঙ্কায় এই সাহসের কাজ করিয়াছিল, এই কথা বুঝাইতে লাগিল—যখন একবার একবার সেই চাঁদমুখ দেখিতে লাগিল, আর অশ্রু পরিপ্লুত হইয়া, মাতৃস্নেহের উচ্ছ্বাসের উপর উচ্ছ্বাস, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তুলিতে লাগিল—তখন পরিষ্কার, স্বর্গীয়, অপ্সরানিন্দিত তিনগ্রাম সংমিলিত মনোমুগ্ধকর সঙ্গীতের মত শ্রোতৃদিগের কর্ণে সেই মুগ্ধকর বাক্য বাজিতে লাগিল। সকলে মুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল। তার পর সহসা রমা, ধাত্রীক্রোড় হইতে শিশুকে কাড়িয়া লইয়া, সীতারামের পদতলে

তাহাকে ফেলিয়া দিয়া যুক্তকরে বলিতে লাগিল, "মহারাজ! আপনার আরও সন্তান আছে—আমার আর নাই। মহারাজ আপনার রাজ্য আছে—আমার রাজ্য এই শিশু। মহারাজ! তোমার ধর্ম্ম আছে, কর্ম্ম আছে, যশ আছে, স্বর্গ আছে—আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, আমার ধর্ম্ম এই, কর্ম্ম এই, যশ এই, স্বর্গ এই—মহারাজ! অপরাধিনী হইয়া থাকি, তবে দণ্ড করুন—" শুনিয়া দর্শকমণ্ডলী অশ্রুপূর্ণ হইয়া পুনঃ পুনঃ জয় ধ্বনি করিতে লাগিল। কিন্তু লোক ভাল মন্দ দুই রকমই আছে—অনেকেই জয়ধ্বনি করিতে লাগিল—কিন্তু আবার অনেকেই তাহাতে যোগ দিল না। জয়ধ্বনি ফুরাইলে তাহারা কেহ অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিল—"আমার ত এ কথায় বিশ্বাস হয় না!" কোন বর্ষীয়সী বলিল, "পোড়া কপাল! রাত্রে মানুষ ডাকিয়া নিয়া গিয়াছেন—উনি আবার সতী!" কেহ বলিল, "রাজা এ কথায় ভুলেন ভুলুন—আমরা এ কথায় ভুলিব না।" কেহ বলিল, "রাণী হইয়া যদি উনি এই কাজ করিবেন, তবে আমরা গরিব দুঃখী কি না করিব?"

এ সকল কথা সীতারামের কাণে গেল। তখন রাজা, রমাকে বলিলেন, "প্রজাবর্গ সকলে ত তোমার কথা বিশ্বাস করিতেছে না।"

রমা কিছুক্ষণ মুখ অবনত করিয়া রহিল। চক্ষে প্রবল বারিধারা বহিল—তার পর রমা সামলাইল। তখন মুখ তুলিয়া রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল—

"যখন লোকের বিশ্বাস হইল না, তখন আমার এক মাত্র গতি। আপনার রাজপুরীর কলঙ্ক স্বরূপ এ জীবন আর রাখিতে পারিব না। আপনি চিতা প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা দিন—আমি সকলের সম্মুখেই পুড়িয়া মরি। দুঃখ তাহাতে কিছু নাই! লোকে আমাকে কলঙ্কিনী বলিল—মরিলেই সে দুঃখ গেল। কিন্তু এক নিবেদন মহারাজ! আপনিও কি আমাকে অবিশ্বাসিনী ভাবিতেছেন? তাহা হইলে বুঝি—(আবার রমার চক্ষে জলের ধারা ছুটিল,)—বুঝি আমার পুড়িয়া মরাও বৃথা হইবে। তুমি যদি এই লোক সমারোহের সম্মুখে বল, যে আমার প্রতি তোমার অবিশ্বাস নাই—তাহা হইলে আমি সেই চিতাই স্বর্গ মনে করিব। মহারাজ! পরলোকের উদ্ধার কর্ত্তা, ভূদেব তুল্য, আমার গুরুদেব এই

সম্মুখে, আমি তাঁহার সম্মুখে, ইষ্টদেবকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি আমি অবিশ্বাসিনী নহি। যিনি গুরুর অপেক্ষাও আমার পূজ্য, যিনি মনুষ্য হইয়াও দেবতার অপেক্ষা আমার পূজ্য, সেই পতি দেবতা, আপনি স্বয়ং আমার সম্মুখে—আমি পতিদেবতাকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, আমি অবিশ্বাসিনী নহি। মহারাজ! এই নারী-দেহ ধারণ করিয়া যে কিছু দেবসেবা, ব্রাহ্মণসেবা, দান ব্রত নিয়ম করিয়াছি, যদি আমি বিশ্বাসঘাতিনী হইয়া থাকি, তবে সে সকলেরই ফলে যেন বঞ্চিত হই। পতিসেবার অপেক্ষা স্ত্রীলোকের আর পুণ্য নাই, কায়মনোবাক্যে আমি যে আপনার চরণসেবা করিয়াছি, তাহা আপনিই জানেন,—আমি যদি অবিশ্বাসিনী হইয়া থাকি, তবে আমি যেন সে পুণ্যফলে বঞ্চিত হই। আমি ইহজীবনে যে কিছু আশা, যে কিছু ভরসা, যে কিছু কামনা, যে কিছু মানস করিয়াছি,—আমি যদি অবিশ্বাসিনী হইয়া থাকি, সকলই যেন নিষ্ফল হয়। মহারাজ! নারীজন্মে স্বামী সন্দর্শনের তুল্য পুণ্যও নাই, সুখও নাই—যদি আমি অবিশ্বাসিনী হইয়া থাকি, যেন ইহজন্মে আমি সে সুখে চিরবঞ্চিত হই। যে পুত্রের জন্য আমি এই কলঙ্ক রটাইয়াছি—যাহার তুলনায় জগতে আমার আর কিছুই নাই—যদি আমি অবিশ্বাসিনী হই, আমি যেন সেই পুত্রমুখ দর্শনে চিরবঞ্চিত হই। মহারাজ! আর কি বলিব—যদি আমি অবিশ্বাসিনী হইয়া থাকি, তবে জন্মে জন্মে যেন নারীজন্ম গ্রহণ করিয়া, জন্মে জন্মে স্বামী পুত্রের মুখ দর্শনে চিরবঞ্চিত হই।”—

রমা আর বলিতে পারিল না—ছিন্ন লতার মত সভাতলে পড়িয়া গিয়া মূর্চ্ছিতা হইল—ধাত্রীগণে ধরাধরি করিয়া অন্তঃপুরে বহিয়া লইয়া গেল। ধাত্রী-ক্রোড়স্থ শিশু মার সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিতে কাঁদিতে গেল। সভাতলস্থ সকলে অশ্রুমোচন করিল। গঙ্গারামের করচরণস্থিত শৃঙ্খলে ঝঝনা বাজিয়া উঠিল। দর্শকমণ্ডলী বাত্যাপীড়িত সমুদ্রের ন্যায় চঞ্চল হইয়া মহান্ কোলাহল সমুত্থিত করিল—রক্ষিবর্গ কিছুই নিবারণ করিতে পারিল না।

তখন “গঙ্গারাম কি বলে?” “গঙ্গারাম কি এ কথা মিছা বলে!” “গঙ্গারাম যদি মিছা বলে, তবে আইস আমরা সকলে মিলিয়া গঙ্গারামকে

মারিয়া ফেলি।” এইরূপ রব চারিদিক হইতে উঠিতে লাগিল। গঙ্গারাম দেখিল, এই সময়ে লোকের মন ফিরাইতে না পারিলে, তাহার আর রক্ষা নাই। গঙ্গারাম বুদ্ধিমান্, বুঝিয়াছিল, যে প্রজাবর্গ যেমন নিষ্পত্তি করিবে, রাজাও সেই সেই মত করিবেন। তখন সে রাজাকে সম্বোধন করিয়া লোকের মনভুলান কথা বলিতে আরম্ভ করিল,

“মহারাজ! কথাটা এই যে স্ত্রীলোকের কথায় বিশ্বাস করিবেন—না আমার কথায় বিশ্বাস করিবেন? প্রভু! আপনার এই রাজ্য কি স্ত্রীলোকে সংস্থাপিত করিয়াছে—না আমার ন্যায় রাজভৃত্যদিগের বাহুবলে স্থাপিত হইয়াছে? মহারাজ! সকল স্ত্রীলোকেই বিপথগামিনী হইতে পারে, রাজরাণীরাও বিপথগামিনী হইয়া থাকেন; রাজরাণী বিপথগামিনী হইলে রাজার কর্ত্তব্য যে তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। বিশ্বাসী ভৃত্য কখন বিপথগামী হয় না; তবে স্ত্রীলোকেরা আপনার দোষ ক্ষালন জন্য ভৃত্যের ঘাড়ে চাপ দিতে পারে। এই মন্মরাণী রাত্রে কাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আমাকে দোষী করিতেছেন তাহার স্থিরতা—“মহারাজ রক্ষা কর! রক্ষা কর!”

কথা কহিতে কহিতে গঙ্গারাম কথা সমাপ্ত না করিয়া,—অতিশয় ভীত হইয়া, “মহারাজ রক্ষা কর! রক্ষা কর!” এই শব্দ করিয়া স্তম্ভিত ও বিহ্বলের মত হইয়া নীরব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সকলে দেখিল গঙ্গারাম থর থর কাঁপিতেছে। তখন সমস্ত জনমণ্ডলী সবিস্ময়ে, সভয়ে চাহিয়া দেখিল—অপূর্ব্বমূর্ত্তি! জটাজুটবিলম্বিনী গৈরিকধারিণী, জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি, সাক্ষাৎ সিংহবাহিনী দুর্গা তুল্য, ত্রিশূল হস্তে, গঙ্গারামকে ত্রিশূলাগ্রভাগে লক্ষ্য করিয়া, প্রখরগমনে তাহার অভিমুখে সভামণ্ডপ পার হইয়া আসিতেছে। দেখিবা মাত্র সেই সাগরবৎ সংক্ষুব্ধ জনমণ্ডলী একেবারে নিস্তব্ধ হইল। গঙ্গারাম এক দিন রাত্রে সে মূর্ত্তি দেখিয়াছিল—আবার এই বিপৎকালে যখন মিথ্যা প্রবঞ্চনার দ্বারায় নিরপরাধিনী রমার সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত, সেই সময়ে সেই মূর্ত্তি দেখিয়া, চণ্ডী তাহাকে বধ করিতে আসিতেছেন, বিবেচনা করিয়া “ভয়ে কাতর হইয়া রক্ষা কর! রক্ষা কর!” শব্দ করিয়া উঠিল। এ দিকে রাজা, ও দিকে চন্দ্রচূড় সেই

রাত্রিদৃষ্ট দেবীতুল্য মূর্ত্তি দেখিয়া চিনিলেন, এবং নগরের রাজলক্ষ্মী মনে করিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিলেন। তখন সভাস্থ সকলেই গাত্রোত্থান করিল।

জয়ন্তী কোনদিকে দৃষ্টি না করিয়া, খরপদে গঙ্গারামের নিকট আসিয়া, গঙ্গারামের বক্ষে ত্রিশূলাগ্রভাগ স্থাপন করিল। কথার মধ্যে কেবল বলিল, এখন বল।"

গঙ্গারাম মনে করিল, আর একটি মিথ্যা কথা বলিলেই এই ত্রিশূল আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইবে। গঙ্গারাম তখন সভয়ে, বিনীতভাবে, সত্য বৃত্তান্ত সভাসমক্ষে বলিতে আরম্ভ করিল। যতক্ষণ না তাহার কথা সমাপ্ত হইল, ততক্ষণ জয়ন্তী তাহার হৃদয় ত্রিশূলাগ্রভাগের দ্বারা স্পর্শ করিয়া রহিল। গঙ্গারাম তখন রমার নির্দ্দোষিতা, আপনার মোহ, লোভ, ফৌজদারের সহিত সাক্ষাত, কথোপকথন, এবং বিশ্বাসঘাতকতার চেষ্টা সমুদায় সবিস্তারে কহিল।

জয়ন্তী তখন ত্রিশূল লইয়া খরপদে চলিয়া গেল। গমনকালে সভাস্থ সকলেই নতশিরে সেই দেবীতুল্য মূর্ত্তিকে প্রণাম করিল। সকলেই ব্যস্ত হইয়া পথ ছাড়িয়া দিল। কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে বা অনুসরণ করিতে সাহস পাইল না। সে কোন দিকে কোথায় চলিয়া গেল কেহ জানিল না।

জয়ন্তী চলিয়া গেলে রাজা গঙ্গারামকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এখন তুমি আপন মুখে সকল অপরাধ স্বীকৃত হইলে। এরূপ কৃতঘ্নের মৃত্যু ভিন্ন অন্য দণ্ড উপযুক্ত নহে। অতএব তুমি রাজদণ্ডে প্রাণত্যাগ করিতে প্রস্তুত হও।"

গঙ্গারাম দ্বিরুক্তি করিল না। প্রহরীরা তাহাকে লইয়া গেল। বধ দণ্ডের আজ্ঞা শুনিয়া সকল লোক স্তম্ভিত হইয়াছিল। কেহ কিছু বলিল না। নীরবে সকলে আপনার ঘরে ফিরিয়া গেল। গৃহে গিয়া সকলেই রমাকে "সাক্ষাৎ লক্ষ্মী" বলিয়া প্রশংসা করিল। রমার আর কোন কলঙ্ক রহিল না।

গোময়ের সদ্ব্যবহার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গোময়ে যে সকল দ্রব্য একত্রে মিশিয়া আছে, তাহারা মাটির সঙ্গে মিশিয়া উদ্ভিদ্ আকারে পরিণত হইয়া, গোজাতির আহারের স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া পুনরায় যখন গোময়ের আকার প্রাপ্ত হয় তখনই সেই দ্রব্যগুলির একটি চক্র পূর্ণ হয়, গোময়স্থিত পদার্থ সকল এইরূপ চক্রাবর্ত্তে ঘুরিয়া পুনরায় গোময়রূপ প্রাপ্ত হইবে ইহাই স্বভাবের নিয়ম। গোজাতি উদ্ভিদ্ হইতে যে ধার করে, স্বভাবের বশে তাহারা সেই ধার শোধ দিতে বিলম্ব করে না। গোজাতি ক্ষেত্রোৎপন্ন পদার্থ ই আহার করে। ঘাস, বিচালী, ভুষি, খোল, কেন সকল গুলিই ক্ষেত্রোৎপন্ন পদার্থ। গরুরা স্বভাবের বশে যদি থাকিতে পায় তবে ক্ষেত্রোৎপন্ন দ্রব্য আহার করিয়া মলমূত্র ক্ষেত্রেই ত্যাগ করে, এবং ঐ মলমূত্র উদ্ভিদ্-জীবনের উপযোগী সারের কার্য্য করিয়া থাকে; সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উদ্ভিদগণের ধাব শোধ দিবার জন্য গোময় ও গোমূত্র ক্ষেত্রে নিহিত হয় ইহাই স্বভাবের নিয়ম।

প্রাণীগণ যে উদ্ভিজ্জ দ্রব্য সকল ভক্ষণ করে উদ্ভিদ্গণ সেই দ্রব্য সকল কতক ভূমি হইতে কতক বায়ু হইতে সংগ্রহ করে; ভূমি হইতে উদ্ভিদ্গণ যে দ্রব্য ধার করে, উদ্ভিদ্ভোজী প্রাণীগণেব মলমূত্র ভূমিতে ফিরাইয়া দিলে সেই ধার শোধ যায়, এবং উদ্ভিদেরা বায়ু হইতে যে সকল দ্রব্য সংগ্রহ করে প্রাণীগণ প্রশ্বাস সহকারে যে সকল দ্রব্য বায়ুতে মিশায়, তাহা দ্বারাই বায়ুর ধার শোধ যায়। এখন দেখ স্বভাবের বশে প্রাণী উদ্ভিদ্ এবং মাটি বায়ু জল প্রভৃতি সকলে যে রকমে আপনাদের ভিতর দেনা পাওনা পরিষ্কার রাখিতে চায়, মানুষে যদি তাহার বিপরীতাচরণ করে তবে কি মনুষ্য তাহার ফলভোগ করিবে না? স্বভাবের নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাইতে গেলে যে কুফল ফলিবে তাহাতে কেহই সন্দেহ করেন না।

গোময় ও গোমূত্র শস্যক্ষেত্রে নিপতিত হইয়া ক্ষেত্রের সারের কার্য্য করিবে ইহাই স্বভাবের নিয়ম, ইহার অন্যথা করিলে কি কুফল ফলে তাহাই এইবারে দেখাইব। ঘুঁটে পুড়াইলে গোময়স্থিত অধিকাংশ দ্রব্যই ধুয়া হইয়া উড়িয়া গিয়া বাতাসে মিশে, কেবল ভস্মগুলি পড়িয়া থাকে। যাহা উড়িয়া যায় তাহার মধ্যে এমন একটি দ্রব্য থাকে যাহা ভূমিতে না থাকিলে ভূমির উর্ব্বরা শক্তি কমিয়া যায়। এই পদার্থটি যবক্ষার-জান বিশিষ্ট পদার্থ। ক্ষেত্রে উহা না থাকিলে তথায় শস্য জন্মিতে পারে না এবং এই পদার্থের ইতর-বিশেষে ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্যের পরিমাণের অনেক ইতর-বিশেষ হয়। সার পদার্থের মধ্যে এইটিই শ্রেষ্ঠ। ঘুঁটে পুড়াইলে এই সার পদার্থটি বাতাসে মিশাইয়া যাইল, যে ভস্ম বাকি রহিল তাহা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় না হইলেও (কোন কোন উদ্ভিদ্‌ভস্ম সারে সমধিক বৰ্দ্ধিত হয় ইহা সত্য) তাহার আবশ্যকতা অপেক্ষাকৃত অল্প। সুতরাং ঘুঁটে পুড়াইলে এই ফল হয়, যে পদার্থগুলি মাটির প্রাপ্য তাহা মাটিতে না পড়িয়া বাতাসে মিশে। মাটি উদ্ভিদ্‌গণকে যে যে দ্রব্যগুলি ধার দিয়া ছিল মাটি তাহা আর শীঘ্র ফিরিয়া পায় না; সুতরাং উহার শস্যোৎপাদিকা শক্তি কমিয়া যায়, ভূমি আর সুন্দর শস্য উৎপন্ন করে না, শস্য আর প্রণীগণের উপযুক্ত সম্যক আহার যোগায় না, মানুষে আপনার দুর্ব্বুদ্ধিতার ফল আপনারা ভোগ করে।

ঘুঁটে পোড়াইলে ভূমির সারোপযোগী যে পদার্থ বায়ুতে মিশিয়া যায় তাহা যে চিরকালই বায়ুতে মিশিয়া থাকে এ কথা ঠিক নহে বটে। কেন না স্বভাবের নিয়ম বশে ভূমির যে দ্রব্যে দাওয়া আছে তাহা কালে ভূমিতেই মিশিবে ইহা নিশ্চয়, কেন না তাহা না হইলে চক্র পূরে না। কিন্তু ঘুঁটে পোড়াইলে এই চক্র পূর্ণ হইতে অকারণ এত বেশী বিলম্ব হইয়া পড়ে, যে সেই বিলম্ব শস্যজীবনের পক্ষে বড়ই হানিজনক হইয়া উঠে। শস্য উৎপাদনের জন্য ভূমির যে দ্রব্যগুলি যখন প্রয়োজন তখন পায় না। এ বৎসর যে ক্ষেত্রে ধান্য জন্মিল, সে বৎসর সেই ক্ষেত্র হইতে কতকগুলি দ্রব্য খড় ও ধান্যের সঙ্গে মিশিল, পর বৎসর ধান্য উৎপন্ন হইবার সময় ক্ষেত্রের সেই অভাবগুলি পূরণ হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু ঘুঁটে পোড়াইলে বায়ুর সহিত

যে সার পদার্থ মিশিয়া যায় তাহা শস্যক্ষেত্রে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে হয়ত যুগযুগান্তের বিলম্ব হইবে। সুতরাং ক্ষেত্রের অভাব ক্রমশঃই বাড়িতে থাকে। ভারতবর্ষের কৃষিক্ষেত্র সমূহে যবক্ষারজানবিশিষ্ট পদার্থের সে অভাব জন্মিয়াছে। গোময় সার স্বরূপ ব্যবহৃত না হইয়া জালানী কার্য্যে ব্যবহৃত হওয়াই যে ইহার এক প্রধান কারণ তাহার আর সন্দেহ নাই।

জলের স্রোতে পাহাড়ের মাটি ধুইয়া যায়; প্রতি বৎসর পাহাড়ের যে মাটি ধুইয়া যায় তাহা সমগ্র পাহাড়ের সহিত তুলনায় এত কম যে পাহাড়ের কোন পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে ইহা টের পাওয়া যায় না। কিন্তু এইরূপে একটু একটু করিয়া ক্ষয় হইয়া কালে সমগ্র পাহাড় ধূলিসাৎ হইয়া যায়। গোময় ঘুঁটের আকারে পরিণত হইয়া জালানি কার্য্যে ব্যবহৃত হওয়ায় দেশের ভূমির উৎপাদিকা শক্তির যে হ্রাস হয় তাহা দু এক বৎসরে বড় টের পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু এই একটু একটু হ্রাস হইয়া কালে যে কত ক্ষতি হইয়াছে তাহা বলা যায় না। ঘুঁটের ব্যবহার আমাদের দেশে বহুকাল হইতে প্রচলিত এবং এই বহুকাল ধরিয়া ভূমির প্রাপ্য পদার্থ বাতাসে মিশিতেছে; বায়ু হইতে মাটিতে ফিরিয়া আসিতে গিয়া আমাদের দেশের ভূমির প্রাপ্য পদার্থ কোন দেশের জমিতে মিশিতেছে তাহা কে জানে? শস্য ক্ষেত্রের প্রাপ্য দ্রব্য কোন অরণ্যে পতিত হইতেছে তাহা কে জানে? আমরা আপনাদের দোষে আমাদের ভূমির উর্ব্বরাশক্তি কমাইতেছি। ভারত ভূমি তাই রাগ করিয়া ভারতবাসিগণকে দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত করিতেছে; ভূমির প্রাপ্য দ্রব্য ভূমিকে দিয়া ভূমিকে সন্তুষ্ট কর, তবেই ভূমি তোমাদের উপযুক্ত আহার যোগাইবে।

আমাদের শাস্ত্রে এইরূপ কথা আছে যে, ভূমি আদি ভূতাধিষ্ঠাতা দেবতাগণ আমাদের ইষ্ট ভোজ্যবস্তু সকল প্রদান করিয়া দাসের ন্যায় সেবা করিয়া থাকে, তাহাদের প্রাপ্য দ্রব্য তাহাদিগকে প্রদান না করিয়া যে জন ভোজ্য বস্তু ভোগ করে সে চোর। সেই জন্য আমরা বলিতে চাই যে যাঁহারা গোময় মাটির সার স্বরূপ ব্যবহার না করিয়া জালানী ইন্ধন স্বরূপ ব্যবহার করেন তাঁহারা চোর।

পাশ্চাত্য কৃষিবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণ অনেক পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়াছেন যে গোময়ের সারে উদ্ভিদ্ জীবনের আবশ্যকীয় সকল প্রকার দ্রব্যই আছে,

এই জন্য গোময়ের সার সকল প্রকার সার অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ। আমাদের দেশীয় কৃষকগণ সার স্বরূপ ব্যবহার করার পক্ষে গোময়ের উপকারিতা যে কিছুই বুঝে না এমন নহে, তথাপি এই দেশের অধিকাংশ গোময় কেন যে ইন্ধন স্বরূপ ব্যবহৃত হয় তাহার অবশ্য একটা কারণ আছে। সেই কারণটা কি তাহাই এইবারে বলিব। গোবরকে ঘুঁটে করিলে গৃহস্থের সদ্য লাভ হয়, আর সারের জন্য ব্যবহার করিলে যে উপকার পাওয়া যায় তাহা অনেক দিন পরে পাওয়া যায়। আজ ঘুঁটে দিলাম দু দিন পরেই তাহা পুড়াইতে পারিব, কিম্বা দু দিন বাদে তাহা বিক্রয় করিয়া তাহা হইতে দু পয়সা লাভ করিতে পারি, কিন্তু সার দিয়া জমি উর্ব্বরা করিতে পারিলে যে লাভ হইবে তাহা সেই বৎসরের শেষে ফসল পাকিবার সময় বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং সে লাভ বেশী হইলেও অত দিন অপেক্ষা করে কে? পরিণাম ভেবে কাজ করার চলনটা আমাদের দেশ থেকে এক রকম উঠিয়া গিয়াছে। সকলেই আজিকার দিনটা এক রকমে কাটাইয়া দিবার জন্য ব্যস্ত, কালিকার দিনের কথা প্রায়ই কেউ ভাবে না। এই হেতু যাহাতে সদ্য দু পয়সা পাওয়া যায় সেই জন্যই ব্যস্ত হইয়া লোকে গোময়ের ঘুঁটে করিয়া ঘুঁটে পোড়াইয়া ফেলে এবং ঘুঁটে করা অপেক্ষা জমিতে সার দেওয়ায় যে কত বেশী লাভ সে বিষয় আদৌ লক্ষ্য করে না। যাঁহারা একটু পরিণাম ভাবিয়া দেখিবেন তাঁহারাই কিন্তু বুঝিতে পারিবেন সে গোময় সার স্বরূপ ব্যবহৃত হইলে পয়সা সম্বন্ধে অনেক বেশী লাভ নিশ্চয়ই হইবে। পাশ্চাত্য কৃষিবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণ কত গোময় সার হইতে কিরূপ লাভ হয় তাহা সম্যক্‌ পরীক্ষা দ্বারা যেরূপ স্থির করিয়াছেন এবং আমাদের দেশে ঘুঁটে করিয়া সেই পরিমাণ গোময় হইতে কি লাভ হয় তাহার একটা হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল। কৃষকগণকে এই গুলি সম্যক বুঝাইয়া দিয়া জমির উর্ব্বরা শক্তি যাহাতে সম্যক বৃদ্ধি পায় সে বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছে।

একটি বড় ভাল গরু হইতে বৎসরে প্রায় ২৫০ মণ গোময় ও ১০০ মণ গোমূত্র পাওয়া যায়। ২৫০ মণ গোময় হইতে কমবেশি ৬০ মণ ঘুঁটে প্রস্তুত হয়, কলিকাতায় এই ঘুঁটে বিক্রয় করিলে প্রায় ১৪ টাকা পাওয়া যায়।

পল্লিগ্রামে ঘুঁটের দর কলিকাতার দর অপেক্ষা অনেক সস্তা। নানা স্থানের দর সামঞ্জস্য করিয়া হিসাব করিলে ২৫০ মণ গোময় হইতে যে ঘুঁটে পাওয়া যায় তাহার দর যদি ১৪ টাকা ধরা যায় তবে দর বেশী বই কম ধরা হইল না। একটী ভাল গরু হইতে ২৫০ মণ গোময় ও ১০০ মণ গোমূত্র পাওয়া যায় ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি; ঘুঁটে করিতে গেলে গোমূত্র কোন কাজে আসে না কিন্তু উহাতে যবক্ষারজান বিশিষ্ট পদার্থ যে পরিমাণে আছে তাহাতে সারের ব্যবহারে গোমূত্রের অপব্যয় হয় না। সকল গরু হইতেই যে ২৫০ মণ গোময় ও ১০০ মণ গোমূত্র পাওয়া যায় এ কথা ঠিক না হইলেইও ২৫০ মণ গোময় ও ১০০ মণ গোমূত্র হইতে ভাল সার কত মণ প্রস্তুত হয় তাহা বিজ্ঞানবিৎগণ যেমন দেখাইয়াছেন তাহা বলিতেছি। ঐ ২৫০ মণ গোময় ও ১০০ মণ গোমূত্র হইতে ক্ষেত্রের ব্যবহারের নিতান্ত উপযোগী সুন্দর সার প্রায় ১৭০ মণ পাওয়া যাইবে। * অর্থাৎ ৩৫০ মিশ্রিত মল ও মূত্র শুকাইয়া গিয়া ১৭০ মণ খাঁটি সারে দাঁড়াইবে। এই ১৭০ মণ ভাল সারে ক্ষেত্রের উর্ব্বরা শক্তি কিরূপ বৃদ্ধি করে এবং তাহা হইতে কত লাভ হয় তাহা নিম্নের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে।

* বিনা সারে গমের চাষ করিলে ভালরূপ হইলে অর্থাৎ অনাবৃষ্টি ইত্যাদি কারণে গাছ মরিয়া না যাইলে বিঘা পেছু— গম ৩মণ-২০ সের ও বিচালি ৫মণ-১৫ সের হয়

আর বিঘা পেছু ১৩০ মণ গোময় সার দিলে, তাহা হইতে— ৮মণ ৩০ সের ও ১৫মণ ২০ সের হয়

অর্থাৎ ১৩০ মণ গোময় সারে	=৫মণ ১০সের ও ১০মণ ৫সের লাভ হইয়া থাকে।
সুতরাং—১৭০মণ সারে	=৬মণ ৩৪ সের ও ১৩ মণ ১০ সের লাভ হইবে।
মূল্য অল্প করিয়া ধরিলে	=১৮।৫ গম ও ৮॥৶১৫ বিচালি

এই তালিকা ২৮ বৎসর ধরিয়া পরীক্ষা করার পর প্রস্তুত হইয়াছে। সুতরাং ইহাতে ভুলচুকের সম্ভাবনা নাই।

এই ত গেল লাভালাভের কথা। তার পর দেখাইতে চাই যে পূর্ব্বে আমাদের দেশে ঘুঁটে জ্বালাইবার যে প্রয়োজন ছিল আজ কাল আর সে প্রয়োজন নাই। জ্বালানী কাষ্ঠের অভাবেই ঘুঁটে পোড়াইবার প্রয়োজন ছিল। আজকাল পাথুরিয়া কয়লা আমাদের দেশে যে পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে তাহাতে জ্বালানী ইন্ধনের অভাব প্রকৃত পক্ষে আদৌ নাই। তবে আমাদের দেশের লোকেরা চির প্রচলিত প্রথা উঠাইয়া কোন নূতন ধরণের কার্য্য করিতে বড়ই নারাজ, এই জন্যই রন্ধন কার্য্যে পাথুরিয়াকয়লার চলনটা এখন ও বড় বেশী হয় নাই। অনেকের মনে এরূপ বিশ্বাস আছে যে ঘুঁটের রান্না যেমন সুন্দর হয়, কয়লার রান্না তেমন হয় না; ঘুঁটের আগুণে যেমন ভাত হয়, কয়লার আগুণে তেমন ভাত হয় না। আজকাল গৃহস্থেরা যেরূপ কয়লার জ্বাল দিয়া ভাত রাঁধেন তাহাতে ঘুঁটের জ্বালের ভাত যে কয়লার জ্বালের ভাত হইতে ভাল হয় একথা স্বীকার করি। কিন্তু কেন যে ঘুঁটের জ্বালের ভাত কয়লার জ্বালের ভাত হইতে ভাল হয় তাহা কেহই ভাবিয়া দেখেন না। একটু ভাবিয়া দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে এ বিষয়ে দোষটা কয়লার নহে, কয়লা রন্ধন কার্য্য সম্বন্ধে সুচারুরূপে ব্যবহার করিতে না জানাতেই এইরূপ ঘটিয়া থাকে।

ঘুঁটের জ্বালটা নরম, কিন্তু আজকাল যে রকম উনানে একগাদি কয়লা চাপাইয়া রন্ধন কার্য্য চলিতেছে তাহাতে কয়লার আঁচ বড় বেশী হয়, সেই জন্যই রান্না অনেক স্থলে ভাল হয় না। অল্প অল্প কয়লা দিয়া আঁচ নরম রাখিয়া কয়লা ব্যবহার করিলে কয়লার জ্বালের আর কোন দোষই লক্ষিত হইবে না।

আমরা এই যে সকল কথাগুলি বলিলাম সাধারণে সেই গুলি সম্যক্ আলোচনা করিয়া গোময় সারের যথার্থ উপযোগিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে শিখেন ইহাই আমাদের একান্ত ইচ্ছা। প্রচারের কৃতবিদ্য পাঠকেরা সামান্য গোবরের কথায় অনাস্থা প্রকাশ না করিয়া সাধারণকে—বিশেষতঃ কৃষকগণকে—সুবিধামত এই সকল কথা বুঝাইবার চেষ্টা করেণ ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ রায়।

কালিদাসের উপমা।

রঘুবংশের প্রথম সর্গ উপমা জন্য বিখ্যাত। প্রথম শ্লোকে গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ স্বরূপ কবি পার্ব্বতী পরমেশ্বরকে প্রণাম করিতেছেন—বাক্য এবং অর্থের ন্যায় উঁহারা চিরসম্পৃক্ত।

বাগর্থাধিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ ॥

তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরং।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ ॥

ভেলায় সাগর পার—বামণ হইয়া চাঁদে হাত ইত্যাদি কথা আজকাল আমাদের 'household word'। কালিদাস এই সকল উপমার প্রথম প্রয়োক্তা বলিয়াই বোধ হয়।

রাজা প্রজাদিগের নিকট কর স্বরূপ যে অর্থ লন, প্রজাদের হিতের জন্যই আবার উহা ব্যয় করা উচিত—অন্ততঃ কালিদাসের সময়ে লোকের মনে এইরূপ ভাবটা ছিল। রঘুবংশীয়েরা এক গুণ কর লইতেন, সহস্র গুণে প্রজার হিতে ব্যয় করিতেন।

প্রজানামেব ভূত্যর্থং স তাভ্যো বলিমগ্রহীৎ।
সহস্র গুণমুৎস্রষ্টুমাদত্তে হি রসং রবিঃ ॥

তস্য সংবৃতমন্ত্রস্য গূঢ়াকারেঙ্গিতস্য চ
ফলানুমেয়াঃ প্রারম্ভাঃ সংস্কারাঃ প্রাক্তনা ইব।

তিনি গোপনে রাজনৈতিক মন্ত্রণা করিতেন এবং বাহ্যিক আকার ইঙ্গিতে তাঁহার আন্তরিক চেষ্টা প্রকাশ হইয়া পড়িত না, সুতরাং জন্মান্তরীন সংস্কার-সমূহের ন্যায়—কেবল ফলেরদ্বারাই তাঁহার উপায়প্রয়োগাদি অনুমিত হইত।

এই জন্মান্তরীন সংস্কারের কথা কুমারসম্ভবেও আছে—

স্থিরোপদেশামুপদেশকালে
প্রপেদিরে প্রাক্তনজন্মবিদ্যাঃ ॥

গর্ভলক্ষণা সুদক্ষিণার বর্ণনে কবি দুই একটী মাত্র তারা এবং ম্লানপ্রভ চন্দ্রযুক্ত প্রায়াবসন্না রজনীর সহিত, শরীরের অবসাদনিবন্ধন দুই একখানি মাত্র অলঙ্কারবিশিষ্টা এবং লোধ্রপুষ্পতুল্যপাণ্ডুবর্ণমুখী রাজ্ঞীর তুলনা করিতেছেন—

শরীরসাদাদসমগ্রভূষণা
মুখেন সালক্ষ্যত লোধ্রপাণ্ডুনা।
তনু প্রকাশেন বিচেয়তারকা
প্রভাতকল্পা শশিনেব শর্ব্বরী॥

দিলীপ রঘুকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলে রাজ্যলক্ষ্মী কিয়দংশে রঘুকে আশ্রয় করিলেন।

নরেন্দ্রমূলায়তনাদনন্তরং
তদাস্পদং শ্রীর্যুবরাজসংজ্ঞিতম্।
অগচ্ছদংশেন গুণাভিলাষিণী
নবাবতারং কমলাদিবোৎপলম্॥

যেমন শোভার অধিষ্ঠাত্রী শ্রী, পূর্ণবিকসিত একটী অরবিন্দ হইতে অচিরোদ্গত উৎপলে কিয়ৎ পরিমাণে আবির্ভূত হয়, গুণাভিলাষিণী রাজ্যলক্ষ্মী সেইরূপ নিজের প্রধান আশ্রয় স্থল নরপতি হইতে রাজার সন্নিহিত যুবরাজ সংজ্ঞাযুক্ত আশ্রয়ে অংশে সংক্রমণ করিতে লাগিলেন।

রঘুর পুত্র অজ ঠিক রঘুর মত হইলেন—

রূপং তদোজস্বি তদেব বীর্য্যং
তদেব নৈসর্গিকমুন্নতত্বং।
ন কারণাৎ স্বাদ্বিভিদে কুমারঃ
প্রবর্ত্তিতো দীপ ইব প্রদীপাৎ॥

সেই উজ্জ্বলরূপ, বীর্য্যও সেইরূপ, নৈসর্গিক উন্নতত্বও সেই, প্রদীপ হইতে উৎপাদিত দীপের ন্যায় কুমার পিতা হইতে কোন প্রকারেই ভিন্ন হইল না।

ইন্দুমতীস্বয়ম্বরে দৌবারিকী সুনন্দা ইন্দুমতীকে এক রাজার নিকট হইতে অন্য রাজার নিকট লইয়া যাইতেছে—

তাং সৈব বেত্রগ্রহণে নিযুক্তা
রাজান্তরং রাজসুতাং নিনায়।
সমীরণোত্থেব তরঙ্গলেখা
পদ্মান্তরং মানসরাজহংসীং ॥

সেই বেত্রগ্রহণে নিযুক্তা (দৌবারিকী) ইন্দুমতীকে, সমীরণে উত্থিত তরঙ্গলেখা যেমন মানস রাজহংসীকে পদ্মান্তরে লইয়া যায়—তদ্রূপ অন্য রাজার নিকট লইয়া গেল।

সুনন্দা অঙ্গেশ্বরের সম্বন্ধে বলিতেছেন—

অনেন পর্য্যাসয়তাশ্রুবিন্দূন্
মুক্তাফলস্থূলতমান্ স্তনেষু।
প্রত্যর্পিতাঃ শত্রুবিলাসিনীনা
মুন্মুচ্য সূত্রেন বিনেব হারাঃ ॥

ইনি শত্রুবিলাসিনীদিগের স্তনে মুক্তাফলবৎ স্থূলতম অশ্রুবিন্দু সকল পাতিত করিয়াছেন। তাহাদের মুক্তাহার কাড়িয়া লইয়া সুতাগাছটী খুলিয়া লইয়া যেন উহা ফিরাইয়া দিয়াছেন।

সুনন্দা ইন্দুমতীকে যে রাজার কাছে লইয়া যান তিনি তাহাকেই পরিত্যাগ করিয়া গমন করেন। কেহ রাত্রিকালে প্রদীপ হস্তে রাজপথস্থিত প্রাসাদাবলির নিকট দিয়া যাইলে তখনকার প্রদীপের সহিত ইন্দুমতীর তুলনা করিয়া কবি বলিতেছেন—

সঞ্চারিণী দীপশিখেব রাত্রৌ
যং যং ব্যতীয়ায় পতিম্বরা সা।
নরেন্দ্র মার্গাট্ট ইব প্রপেদে
বিবর্ণভাবং স স ভূমিপালঃ ॥

রাত্রিকালে সঞ্চারিণী দীপশিখা রাজমার্গ স্থিত অট্টালিকার নিকট দিয়া গমন করিলে পরে সেই অট্টালিকা যেমন ম্লান দেখায়, পতিম্বরা ইন্দুমতী যে২ রাজাকে অতিক্রম করিয়া গেলেন সেই সেই রাজা তদ্রূপ বিবর্ণভাব প্রাপ্ত হইলেন।

সুনন্দা ইন্দুমতীকে অবন্তিনাথের নিকট লইয়া গিয়া সেই রাজার

শারীরিক সৌন্দর্য্য, প্রতাপ, ঐশ্বর্য্য, এবং বিলাসিতার সম্যক পরিচয় শুনাইল। কিন্তু ইন্দুমতী তাঁহাকে মনোনিত করিলেন না।

তস্মিন্নভিদ্যোতিতবন্ধুপদ্মে
প্রতাপসংশোষিতশত্রুপঙ্কে।
ববন্ধ সা নোত্তমসৌকুমার্য্যা
কুমুদ্বতী ভানুমতীব ভাবম্‌॥

সূর্য্যে কুমুদিনীর ন্যায় মিত্ররূপ পদ্মের হর্ষবর্দ্ধক এবং শত্রুরূপ পঙ্কের শোষণকারী সেই অবন্তি নাথে, উৎকৃষ্ট সৌকুমার্য্যবিশিষ্টা সেই ইন্দুমতী অনুরাগিনী হইলেন না।—

এখানে চন্দ্রানুরাগিণী কুমুদিনীর সহিত ইন্দুমতীর এবং প্রতাপশালী অবন্তিনাথের সহিত সূর্য্যের তুলনা করা হইল। আবার এই সর্গে আর দুইটী শ্লোকে সূর্য্যপ্রিয়া নলিনীর সহিত, ইন্দুমতীর, এবং চন্দ্রের সহিত প্রত্যাখ্যাত রাজার তুলনা আছে।

তস্যাঃ প্রকামং প্রিয়দর্শনোঽপি
ন স ক্ষিতীশো রুচয়ে বভূব।
শরৎপ্রমৃষ্টাম্বুধরোপরোধঃ
শশীব পর্য্যাপ্তকলো নলিন্যাঃ॥

নলিনীর সম্বন্ধে মেঘাবরণশূন্য শারদীয় পূর্ণশশীর ন্যায়, যথেষ্ট প্রিয়দর্শন হইলেও, সেই রাজা ইন্দুমতীর রুচিকর হইলেন না।

সম্ভুর্বিদর্ভাধিপতেস্তদীয়ঃ
লেভেঽন্তরং চেতসি নোপদেশঃ।
দিবাকরাদর্শনবদ্ধকোষে
নক্ষত্রনাথাংশুরিবারবিন্দে॥

দিবাকরের অদর্শনে মুকুলিত পদ্মে, চন্দ্র কিরণের ন্যায়, বিদর্ভাধিপতির ভগিনী ইন্দুমতীর চিত্তে, সুনন্দার উপদেশ, প্রবেশ লাভ করিতে পারিল না।

অনন্তর ইন্দুমতী অন্যান্য রাজগণকে অতিক্রম করিয়া অজকে বরণ করিলেন। তখন সেই রাজসভার সহিত প্রভাত কালীন সরোবরের কেমন তুলনা!

প্রমুদিত বরপক্ষমেকতস্তৎ
ক্ষিতিপতিমণ্ডলমন্যতো বিতানম্।
উষসি সর ইব প্রফুল্লপদ্মম্
কুমুদবনপ্রতিপন্ননিদ্রমাসীৎ ॥

সভার একপার্শ্বে হৃষ্টচিত্ত বরপক্ষ, অপর পার্শ্বে ভগ্নমনোরথ রাজন্যবর্গ—সরোবরের একপার্শ্বে সূর্য্যসম্মিলনে হর্ষোৎফুল্লা কমলিনীশ্রেণী—অপর পার্শ্বে চন্দ্র বিরহে বিষণ্না কুমুদিনীমালা।

তার পর সেই ভগ্নমনোরথ ঈর্ষান্বিত রাজাদের আন্তরিক দুরভিসন্ধি এবং বাহ্যিক ভদ্রতার বর্ণনে—

লিঙ্গৈর্মুদা সংবৃতবিক্রিয়াস্তে
হ্রদাঃ প্রসন্না ইব গূঢ়নক্রাঃ ॥

হ্রদটী বাহিরে বেশ প্রসন্ন—কেমন নির্ম্মল ঢল ঢল করিতেছে—কিন্তু ভিতরে—দারুণহিংস্রনক্রসঙ্কুল।

ভবিতব্যতানিবন্ধন নারদের বিনাচ্যুত স্বর্গীয় মালা স্তনাগ্রভাগে পতিত হওয়ায় ইন্দুমতীর মৃত্যু হইল।

ক্ষণমাত্র সখীং সুজাতয়ো
স্তনয়োস্তামবলোক্য বিহ্বলা।
নিমিমীল নরোত্তমপ্রিয়া
হৃতচন্দ্রা তমসেব কৌমুদী ॥

সুন্দর স্তন যুগলের ক্ষণমাত্র সখী সেই মালা দৃষ্টে বিহ্বলা রাজমহিষী রাহুগ্রস্ত চন্দ্রকিরণের ন্যায় নিমীলিত হইলেন।

বপুষা করণোজ্ঝিতেন সা
নিপতন্তী পতিমপ্যপাতয়ৎ।
ননু তৈল নিষেকবিন্দুনা
সহ দীপার্চ্চিরুপৈতি মেদিনীং ॥

ইন্দুমতীর ইন্দ্রিয় চেষ্টাশূন্য শরীর পতিত হইয়া স্বামীকেও পাতিত করিল। প্রদীপ্ত দীপশিখায় নিষিক্ত তৈলবিন্দু দীপার্চ্চি সহিতই ভূতলে পতিত হইয়া থাকে।

অজের ক্রোড়ে ইন্দুমতীর মৃতদেহ—

পতিরঙ্কনিষন্নয়া তয়া
করণাপায়নিবন্নবর্ণয়া।
সমলক্ষত বিভ্রদাবিলাম্
মৃগলেখামুষসীব চন্দ্রমা॥

প্রাণবিনাশ হেতু ম্লান ক্রোড়স্থিত সেই ইন্দুমতী কর্ত্তৃক অজ উষাকালে ম্লানমৃগচিহ্নধারী চন্দ্রের ন্যায় দৃষ্ট হইয়াছিলেন।

অজ ইন্দুমতীর জন্য বিলাপ করিতে করিতে বলিতেছেন

অথবা মৃদুবস্তুহিংসিতুং
মৃদুনৈবারভতে প্রজান্তকঃ।
হিমসেক বিপত্তিরত্র মে
নলিনী পূর্ব্বনিদর্শনংমতা॥

অথবা প্রজানাশক কাল কোমল বস্তু হিংসার জন্য কোমল বস্তুই অবধারিত করিয়াছেন। হিমপাতে বিনশ্বর কমলই আমার পক্ষে ইহার প্রথমোদাহরণ।

অথবা মম ভাগ্য বিপ্লবাৎ
অশনিঃ কল্পিত এব বেধসা।
যদনেন তরুর্ণপাতিতঃ
ক্ষপিতা তদ্বিটপাশ্রয়া লতা॥

কিম্বা আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ বিধাতা এই পুষ্পমালাকেই বজ্র কল্পনা করিয়াছেন, যে হেতু এই বজ্র দ্বারা আশ্রয় বৃক্ষ পাতিত হইল না কিন্তু তদাশ্রিতা লতা বিনষ্টা হইল।

কুমারসম্ভবে রতি খেদ করিতেছেন যে যখন আশ্রয়বৃক্ষ পাতিত হইল তখন তদাশ্রিতা লতা বিনষ্ট হইল না কেন—

অনপায়িনি সংশ্রয়দ্রুমে
গজভগ্নে পতনায় বল্লরী—

তারপর—

শশিনং পুনরেতি শর্ব্বরী—
দয়িতা দ্বন্দ্বচরং পতত্রিণম্।
ইতি তৌ বিরহান্তরক্ষমৌ
কথমত্যন্তগতা ন মাং দহে।

শর্ব্বরী শশীকে আবার পায়, চক্রবাকবধূ ও সহচর পক্ষীর সহিত আবার মিলিত হয়, সুতরাং তাহারা বিরহান্তর সহিতে পারে। কিন্তু তুমি একেবারে গিয়াছ সুতরাং কেন না আমাকে দগ্ধ করিবে?

কুমারসম্ভবে—

শশিনা সহ যাতি কৌমুদী
সহ মেঘেন তড়িৎ প্রলীয়তে।
প্রমদাঃপতিবর্ত্মগা ইতি
প্রতিপন্নং হি বিচেতনৈরপি॥

শশীর সহিত কৌমুদী নষ্ট হয়; বিদ্যুৎ মেঘের সহিত বিলীন হয়। যে পথে পতি গিয়াছেন স্ত্রীরও যে সেই পথে যাওয়া উচিত ইহা বিচেতন পদার্থরাও প্রতিপন্ন করিতেছে।

[ক্রমশঃ

সীতারাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রাজা মুরলাকে মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া নগরের বাহির করিয়া দিবার আদেশ করিলেন। সে হুকুম তখনই তামিল হইল। মুরলার নির্গমনকালে একপাল ছেলে, এবং অন্যান্য রসিক লোক দল বাঁধিয়া করতালি দিতে দিতে এবং গীত গায়িতে গায়িতে চলিল। অনেকেই মুরলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আয়ি, আড়াইটার উপর সাড়ে তিনটা হয় না?" মুরলারও লজ্জা নাই—সে উত্তর দিল, "হয়—তোর বাবাকে ডেকে আন্‌গে যা—"

গঙ্গারামের ন্যায় কৃতঘ্নের পক্ষে, শূলদণ্ড ভিন্ন অন্য দণ্ড তখনকার রাজনীতিতে ব্যবস্থিত ছিল না। অতএব তাহার প্রতি সেই আজ্ঞাই হইল। কিন্তু গঙ্গারামের মৃত্যু আপাততঃ দিন কতক স্থগিত রাখিতে হইল। কেন না সম্মুখে রাজার অভিষেক উপস্থিত। সীতারাম নিজ বাহুবলে হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিয়া রাজা হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অভিষেক হয় নাই। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে তাহা হওয়া উচিত। চন্দ্রচূড়ঠাকুর এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিলে, সীতারাম তাহাতে সম্মত হইয়াছিলেন। তিনি বিবেচনা করিলেন, এরূপ একটা মহোৎসবের দ্বারা প্রজাবর্গ পরিতুষ্ট হইলে তাহাদের রাজভক্তি বৃদ্ধি পাইতে পারে। অতএব বিশেষ সমারোহের সহিত অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন করিবার কল্পনা হইতেছিল। নন্দা এবং চন্দ্রচূড় উভয়েই এক্ষণে সীতারামকে অনুরোধ করিলেন, যে এখন একটা মাঙ্গলিক ক্রিয়া উপস্থিত, এখন গঙ্গারামের বধরূপ অশুভ কর্ম্মটা করা বিধেয় নহে; তাহাতে অমঙ্গলও যদি না হয়, লোকের আনন্দেরও লাঘব হইতে পারে। একথায় রাজা অতি সহজে সম্মত হইলেন। ভিতরের আসল কথা এই যে, গঙ্গারামকে শূলে দিতে সীতারামের আন্তরিক ইচ্ছা নাই, তবে রাজধর্ম্ম পালন এবং রাজ্যশাসন

জন্য ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। ইচ্ছা ছিল না. তাহার কারণ—গঙ্গারাম শ্রীর ভাই। শ্রীকে সীতারাম ভুলেন নাই, তবে এতদিন ধরিয়া তাহাকে খুঁজিয়া, না পাইয়া নিরাশ হইয়া বিষয়কর্ম্মে চিত্তনিবেশ করিয়া শ্রীকে ভুলিবেন ইহা স্থির করিয়াছিলেন। অতএব আবার রাজ্যের উপর তিনি মন স্থির করিতেছিলেন সেইজন্যই দিল্লীতে গিয়া, বাদশাহের দরবারে হাজির হইয়াছিলেন। এবং বাদশাহকে সন্তুষ্ট করিয়া সনন্দ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেইজন্য উৎসাহ সহকারে সংগ্রাম করিয়া ভূষণা অধিকার করিয়াছিলেন এবং দক্ষিণ বাঙ্গালায় এক্ষণে একাধিপত্য প্রচার করিতেছিলেন। কিন্তু শ্রী এখনও হৃদয়ের সম্পূর্ণ অধিকারিণী। অতএব গঙ্গারামের শূলে যাওয়া এখন স্থগিত রহিল।

এদিকে অভিষেকের বড়ধূম পড়িয়া গেল। অত্যন্ত সমারোহ—অত্যন্ত গোলযোগ। দেশ বিদেশ হইতে লোক আসিয়া নগর পরিপূর্ণ করিল—রাজা, রাজপুরুষ, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, অধ্যাপক, দৈবজ্ঞ, ইতর, ভদ্র, আহূত. অনাহূত, রবাহূত, ভিক্ষুক, সন্ন্যাসী, সাধু, অসাধুতে নগরে আর স্থান হয় না। এই অসংখ্য জনমণ্ডলের কর্ম্মের মধ্যে প্রতিনিয়ত আহার। ভক্ষ্য ভোজ্য লুচি সন্দেশের দধির ছড়াছড়িতে সহরে এক হাঁটু কাদা হইয়া উঠিল, পাতা কাটার জ্বালায় সীতারামের রাজ্যের সব কলাগাছ নিষ্পত্র হইল, ভাঙ্গা ভাঁড় ও ছেঁড়া কলাপাতে গড়খাই ও মধুমতী বুজিয়া উঠিবার গোছ হইয়া উঠিল। অহরহ বাদ্য ও নৃত্য গীতের দৌরাত্ম্যে ছেলেদের পর্য্যন্ত মাথা গরম হইয়া উঠিল।

এই অভিষেকের মধ্যে প্রধান ব্যাপার দান। সীতারাম অভিষেকের দিনে সমস্ত দিবস, কখন স্বহস্তে, কখন আপন কর্ত্তৃত্বাধীনে ভৃত্য হস্তে, সুবর্ণ. রজত. তৈজস, এবং বস্ত্র দান করিতে লাগিলেন। অসংখ্য দীন, বিপন্ন, এবং লোভী লোক আসিয়া দুর্গ পরিপূর্ণ করিল—তাহাদিগের জয় জয় শব্দ উচ্চ প্রাসাদ সকল চারি দিগ হইতে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। রাজপুরুষেরা একে একে ভিক্ষুকদিগকে সীতারামের সিংহাসন সন্নিধানে আনিল, তিনি তাহাদিগকে উপযুক্ত দান করিতে বা করাইতে লাগিলেন—তখন রাজপুরুষেরা দ্বারান্তর দিয়া তাহাদিগকে

বিদায় করিয়া দিল। যে টাকা চাহিল সে টাকা পাইল, যে সোণা চাহিল সে সোণা পাইল, যে তৈজস চাহিল সে তৈজস পাইল, যে বনাত চাহিল সে বনাত পাইল, যে শাল চাহিল সে শাল পাইল, যে ভূমি চাহিল সে ভূমি পাইল। অর্দ্ধ রাত্রি পর্য্যন্ত এইরূপ দান করিয়া সীতারাম আর পারিয়া উঠিলেন না। অবশিষ্ট লোকের বিদায় জন্য রাজপুরুষদিগের উপর ভার দিয়া অন্তঃপুরে বিশ্রামার্থ চলিলেন। যাইতে সভয়ে, সবিস্ময়ে সেই অন্তঃপুর দ্বারে—দেখিলেন যে, ত্রিশূলধারিণী স্বর্ণময়ী রাজলক্ষ্মী মূর্ত্তি!

রাজা ভক্তিভাবে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিলেন,

"মা! আপনি কে, আমাকে দয়া করিয়া বলুন।"

জয়ন্তী বলিল, "মহারাজ! আমি ভিখারিণী! আপনার নিকট ভিক্ষার্থ আসিয়াছি।"

রাজা। মা! কেন আমায় ছলনা করেন? আপনি দেবী আমি চিনিয়াছি। আপনি সাক্ষাৎ কমলা—আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

জয়ন্তী। মহারাজ! আমি সামান্যা মানুষী। নহিলে আপনার নিকট ভিক্ষার্থ আসিতাম না। শুনিলাম আজ যে যাহা চাহিতেছে, আপনি তাহাকে তাই দিতেছেন। আমার আশা বড়, কিন্তু যার এমন দান, তার কাছে আশা নিষ্ফলা হইবে না মনে করিয়া আসিয়াছি।"

রাজা বলিলেন, "মা, আপনাকে অদেয় আমার কিছুই নাই। আপনি একবার আমার রাজ্য রক্ষা করিয়াছেন, দ্বিতীয়বারে আমার কুলমর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন! আপনি দেবীই হউন, আর মানবীই হউন—আপনাকে সকলি আমার দেয়। কি বস্তু কামনা করেন আজ্ঞা করুন, আমি এখনিই আনিয়া উপস্থিত করিতেছি।"

জয়ন্তী। মহারাজ! গঙ্গারামের বধ-দণ্ডের বিধান হইয়াছে। কিন্তু এখনও সে মরে নাই। আমি তার জীবন ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি!

রাজা। আপনি!

জয়ন্তী। কেন মহারাজ? অসম্ভাবনা কি?

রাজা। গঙ্গারাম কীটানুকীট—আপনার তার প্রতি দয়া কিসে হইল?

জয়ন্তী। আমরা ভিখারী—আমাদের কাছে সবাই সমান।

রাজা। কিন্তু আপনিই ত তাহাকে ত্রিশূল বিঁধিয়া মারিতে চাহিয়াছিলেন—আপনা হইতেই দুইবার তাহার অসদভিসন্ধি ধরা পড়িয়াছে। বলিতে কি, আপনি মহারাণীর প্রতি দয়াবতী না হইলে, সে সত্য স্বীকার করিত না, তাহার বধদণ্ড হইত না। এখন তাহার অন্যথা করিতে চান কেন?

জয়ন্তী। মহারাজ! আমা হইতে ইহা ঘটিয়াছে বলিয়াই তাহার প্রাণ ভিক্ষা চাহিতেছি। ধর্ম্মের উদ্ধার জন্য ত্রিশূলঘাতে অধর্ম্মাচারির প্রাণ বিনাশেও দোষ বিবেচনা করিনা, কিন্তু ধর্ম্মের এখন রক্ষা হইয়াছে, এখন প্রাণিহত্যা পাপ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছি। গঙ্গারামের জীবন আমাকে ভিক্ষা দিন।

রাজা। আপনাকে অদেয় কিছুই নাই। আপনি যাহা চাহিলেন, তাহা দিলাম। গঙ্গারাম এখনই মুক্ত হইবে। কিন্তু মা! তোমাকে ভিক্ষা দিই, আমি তাহার যোগ্য নহি। আমি তোমায় ভিক্ষা দিব না। গঙ্গারামের জীবন তোমাকে বেচিব—মূল্য দিয়া কিনিতে হইবে।

জয়ন্তী। (ঈষৎ হাস্যের সহিত) কি মূল্য মহারাজ! রাজ-ভাণ্ডারে এমন কোন ধনের অভাব, যে ভিখারিনী তাহা দিতে পারিবে?

রাজা। রাজভাণ্ডারে নাই—রাজার জীবন। আপনি সেই মধুমতীতীরে ঘাটের উপর কামানের নিকট দাঁড়াইয়া স্বীকার করিয়াছিলেন যে আমার জীবন একদিন আমায় দান করিবেন। যে অমূল্য সামগ্রী আমাকে দিবেন বলিয়াছিলেন—সেই মূল্যে আজ গঙ্গারামের জীবন আপনার নিকট বেচিব।

জয়ন্তী। সে কি মহারাজ! আপনার ন্যায় ধর্ম্মাত্মা রাজাধিরাজের জীবনের সঙ্গে সেই নরাধম পাপাত্মার জীবনের কি বিনিময় হয়? মহারাজ! কাণা কড়ি লইয়া কি রত্নাকর বেচিব?

রাজা। মা! জননী যত দেন, ছেলে কি মাকে কখনও তত দিতে পারে?

জয়ন্তী। মহারাজ! আপনি আজ অন্তঃপুর দ্বার সকল মুক্ত রাখিবেন;

আর অন্তঃপুরের প্রহরীদিগকে আজ্ঞা দিবেন ত্রিশূল দেখিলে যেন পথ ছাড়িয়া দেয়। আপনার শয্যাগৃহে আজ রাত্রেই মূল্য পৌঁছিবে। গঙ্গারামের মুক্তির হুকুম হোক।

রাজা হর্ষে অভিভূত হইয়া বলিলেন, "গঙ্গারামের এখনই মুক্তি দিতেছি।" এই বলিয়া অনুচর বর্গকে সেইরূপ আজ্ঞা দিলেন।

জয়ন্তী বলিলেন, "আমি এই অনুচর দিগের সঙ্গে গঙ্গারামের কারাগারে যাইতে পারি কি?"

রাজা। আপনি যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন, কিছুতেই আপনার নিষেধ নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অন্ধকারে, কূপের ন্যায় নিম্ন, আর্দ্র, বায়ু শূন্য কারাগৃহ মধ্যে, গঙ্গারাম শৃঙ্খলবদ্ধ হইয়া একা পড়িয়া আছে। সেই নিশীথ কালেও তাহার নিদ্রা নাই—যে পর্য্যন্ত সে শুনিয়াছে যে তাহাকে শূলে যাইতে হইবে, সেই পর্য্যন্ত আর সে ঘুমায় নাই—আহার নিদ্রা সকলই বন্ধ। এক দণ্ডে মরা যায়, মৃত্যু তত বড় কঠিন দণ্ড নহে; কিন্তু কারাগৃহে একাকী পড়িয়া দিবারাত্র সম্মুখেই মৃত্যু দণ্ড, ইতি ভাবনা করার অপেক্ষা গুরুতর দণ্ড আর কিছুই নাই। গঙ্গারাম পলকে পলকে শূলে যাইতেছিল। দণ্ডের আর তাহার কিছু বাকি নাই। ভাবিয়া ভাবিয়া, চিত্তবৃত্তি সকল প্রায় নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। মন অন্ধকারে ডুবিয়া রহিয়া ছিল—ক্লেশ অনুভব করিবার শক্তি পর্য্যন্ত যেন তিরোহিত হইয়াছিল। মনের মধ্যে কেবল দুটি ভাব এখনও জাগরিত ছিল—ভৈরবীকে ভয়, আর রমার উপর রাগ। এ ভয়ের অপেক্ষা, এই রাগই প্রবল। গঙ্গারাম, আর রমার প্রতি আসক্ত নহে, এখন রমার তেমন আন্তরিক শত্রু আর কেহ নহে।

গঙ্গারাম এখন রমাকে সম্মুখে পাইলে মধ্যে বিদীর্ণ করিতে প্রস্তুত। গঙ্গারামের যখন কিছু চিন্তাশক্তি হইত, তখন কি উপায়ে মরিবার সময়ে

রমার সর্ব্বনাশ করিয়া মরিতে পারিবে, গঙ্গারাম তাহাই ভাবিতেছিল। শূল তলে দাঁড়াইয়া রমার সম্বন্ধে কি অশ্লীল অপবাদ দিয়া যাইবে, গঙ্গারাম তাহাই কখন কখন ভাবিত। অন্য সময়ে জড়পিণ্ডের মত স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়া থাকিত। কেবল মধ্যে মধ্যে বাহিরে অভিষেকের উৎসবের মহান্‌ কোলাহল শুনিত। যে পাচক ব্রাহ্মণ প্রত্যহ তাহার নূন ভাত লইয়া আসিত, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া গঙ্গারাম উৎসবের বৃত্তান্ত শুনিয়াছিল। শুনিল যে রাজ্যের সমস্ত লোক অতি বৃহৎ উৎসবে নিমগ্ন—কেবল সেই একা অন্ধকারে আর্দ্র ভূমিতে মূষিকদষ্ট হইয়া, কীটপতঙ্গপীড়িত হইয়া, শৃঙ্খল ভার বহন করিতেছে। মনে মনে বলিতে লাগিল, রমার কবে এই রকম স্থান মিলিবে!

যেমন অন্ধকারে বিদ্যুৎ জ্বলে তেমনি গঙ্গারামের একটা কথা মনে পড়িত। যদি শ্রী বাঁচিয়া থাকিত! শ্রী একবার প্রাণ ভিক্ষা করিয়া লইয়াছিল, আবার ভিক্ষা চাহিলে কি ভিক্ষা পাইত না! আমি যত পাপী হই না কেন, শ্রী কখন আমাকে পরিত্যাগ করিত না। এমন ভগিনীও মরিল!

দুই প্রহর রাত্রে ঝঞ্জনা বাজাইয়া কারাগৃহের বাহিরের শিকল খুলিল। গঙ্গারামের প্রাণ শুখাইল—এত রাত্রে কেন শিকল খুলিতেছে! আরও কিছু নূতন বিপদ আছে না কি?

অগ্রে রাজপুরুষেরা প্রদীপ লইয়া প্রবেশ করিল। গঙ্গারাম স্তম্ভিত হইয়া তাহাদের প্রতি চাহিয়া রহিল। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। তাহার পর জয়ন্তীকে দেখিল—উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল,

"রক্ষা কর! রক্ষা কর! আমি কি করিয়াছি।"

জয়ন্তী বলিল, "বাছা! কি করিয়াছ, তাহা জান। কিন্তু তুমি রক্ষা পাইবে। শ্রীকে মনে আছে কি?

গঙ্গা। শ্রী! যদি শ্রী বাঁচিয়া থাকিত!

জয়ন্তী। শ্রী বাঁচিয়া আছে। তার অনুরোধে আমি মহারাজের কাছে তোমার জীবন ভিক্ষা চাহিয়াছিলাম। ভিক্ষা পাইয়াছি। তোমাকে মুক্ত

করিতে আসিয়াছি। পলাও গঙ্গারাম! কাল প্রভাতে এ রাজ্যে আর মুখ দেখাইও না। দেখাইলে আর তোমাকে বাঁচাইতে পারিব না।

গঙ্গারাম বুঝিতে পারিল কি না, সন্দেহ। বিশ্বাস করিল না, ইহা নিশ্চিত। কিন্তু দেখিল, যে রাজপুরুষেরা বেড়ী খুলিতে লাগিল। গঙ্গারাম নীরবে দেখিতে লাগিল। যখন বেড়ী প্রায় খোলা হইয়াছে—তখন গঙ্গারাম জয়ন্তীকে জিজ্ঞাসা করিল,

"মা! রক্ষা করিলে কি?"

জয়ন্তী বলিলেন, "বেড়ী খুলিয়াছে। চলিয়া যাও।"

গঙ্গারাম ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। সেই রাত্রেই নগর ত্যাগ করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

গঙ্গারামের মুক্তির আজ্ঞা প্রচার করিয়া, জয়ন্তীর আজ্ঞা মত দ্বার মুক্ত রাখিবার অনুমতি প্রচার করিয়া, রাজা শয্যাগৃহে আসিয়া পর্য্যঙ্কে শয়ন করিলেন। নন্দা তখনই আসিয়া পদসেবায় নিযুক্ত হইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,

"রমা কেমন আছে?"

রমার পীড়া। সে কথা পরে বলিব। নন্দা উত্তর করিল,

"কই—কিছু বিশেষ হইতে ত দেখিলাম না।"

রাজা। আমি এত রাত্রে তাহাকে দেখিতে যাইতে পারিতেছি না, বড় ক্লান্ত আছি। তুমি আমার স্থলাভিষিক্ত হইয়া যাও—তাহাকে আমি যেমন যত্ন করিতাম তেমনি যত্ন করিও; আর আমি যে জন্য যাইতে পারিলাম না তাহাও বলিও।"

কথাটা শুনিয়া পাঠক সীতারামকে ধিক্কার দিবেন। কিন্তু সে সীতারাম আর নাই। যে সীতারাম হিন্দু সাম্রাজ্য সংস্থাপন জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছিলেন, সে সীতারাম রাজ্যপালন ত্যাগ করিয়া কেবল শ্রীকে খুঁজিয়া বেড়াইল। যে সীতারাম আপনার প্রাণ দিয়া শরণাগত বলিয়া গঙ্গারামের

প্রাণরক্ষা করিতে গিয়াছিলেন—সেই সীতারাম রাজা হইয়া, রাজদণ্ডপ্রণেতা হইয়া, শ্রীর লোভে গঙ্গারামকে ছাড়িয়া দিল। যে লোকবৎসল ছিল, সে এখন আত্মবৎসল হইতেছে।

নন্দা বুঝিল, প্রভু আজ একা থাকিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। নন্দা আর কথা না কহিয়া চলিয়া গেল। সীতারাম তখন পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া শ্রীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সীতারাম সমস্ত দিন. রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত ছিলেন। অন্য দিন হইলে পড়িতেন আর নিদ্রায় অভিভূত হইতেন। কিন্তু আজ স্বতন্ত্র কথা—যাহার জন্য রাজ্যসুখ বা রাজ্যভার ত্যাগ করিয়া এতকাল ধরিয়া দেশে দেশে নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়াছেন, যাহার চিন্তা অগ্নিস্বরূপ দিবারাত্রি হৃদয় দাহ করিতেছিল, তাহার সাক্ষাৎলাভ হইবে। সীতারাম জাগিয়া রহিলেন।

কিন্তু নিদ্রাদেবীও ভুবন-বিজয়িনী। যে যতই বিপদাপন্ন হউক না কেন, এক সময়ে না এক সময়ে তাহারও নিদ্রা আসে। সীতারাম বিপদাপন্ন নহেন, সুখের আশায় নিমগ্ন, সীতারামের একবার তন্দ্রা আসিল। কিন্তু মনের ততটা চাঞ্চল্য থাকিলে তন্দ্রাও বেশী ক্ষণ থাকে না। ক্ষণকাল মধ্যেই সীতারামের নিদ্রা ভঙ্গ হইল—চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে গৈরিকবস্ত্র রুদ্রাক্ষভূষিতা মুক্ত-কুন্তলা কমনীয় মূর্ত্তি!

সীতারাম প্রথমে জয়ন্তী মনে করিয়া অতি ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "কই? শ্রী কই?" কিন্তু তখনই দেখিলেন জয়ন্তী নহে, শ্রী!

তখন চিনিয়া, "শ্রী! শ্রী! ও শ্রী! আমার শ্রী!" বলিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিতে ডাকিতে রাজা গাত্রোত্থান করিয়া বাহু প্রসারণ করিলেন। কিন্তু কেমন মাথা ঘুরিয়া গেল—চক্ষু বুজিয়া রাজা আবার শুইয়া পড়িলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে আপনিই মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল।

তখন সীতারাম, ঊর্দ্ধমুখে, স্পন্দিততারলোচনে, অতৃপ্ত দৃষ্টিতে শ্রীর পানে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। কোন কথা নাই—যেন বা নয়নের তৃপ্তি না হইলে কথায় স্ফূর্ত্তি সম্ভাবিত হইতেছে না। দেখিতে দেখিতে, দেখিতে দেখিতে—যেন তাঁহার আনন্দ-প্রফুল্ল মুখ-মণ্ডল আর তত প্রফুল্ল রহিল না—

একটা নিশ্বাস পড়িল। রাজা, আমায় শ্রী বলিয়া ডাকিয়া ছিলেন, বুঝি দেখিলেন, আমার শ্রী নহে। বুঝি দেখিলেন, যে স্থিরমূর্ত্তি, অবিচলিত ধৈর্য্যসম্পন্না, অশ্রু-বিন্দুমাত্রশূন্যা, উদ্ভাসিতরূপরশ্মিমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনী, মহা-মহিমাময়ী এ যে দেবী প্রতিমা! বুঝি এ শ্রী নহে!

হায়! মূঢ় সীতারাম মহিষী খুঁজিতে ছিল—দেবী লইয়া কি করিবে!

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অথ ব্যবস্থিতান্দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে ॥২০॥

পরে হে মহীপতে! * ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে ব্যবস্থিত দেখিয়া অস্ত্র নিক্ষেপে প্রবৃত্ত কপিধ্বজ অর্জ্জুন ধনু উত্তোলন করিয়া হৃষীকেশকে এই কথা বলিলেন।২০।

"ব্যবস্থিত" শব্দের ব্যাখ্যায় শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন "যুদ্ধোদ্যোগে অবস্থিত।"

অর্জ্জুন উবাচ

সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত॥২১॥
যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ম্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥২২॥
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং যএতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥২৩॥

---

* বোধ করি পাঠকের স্মরণ আছে যে সঞ্জয়োক্তি চলিতেছে। সঞ্জয় কুরুক্ষেত্রের বৃত্তান্ত ধৃতরাষ্ট্রকে শুনাইতেছেন।

অর্জ্জুন বলিলেন—

যাহারা যুদ্ধ কামনায় অবস্থিত, আমি যাবৎ তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করি, এই রণসমুদ্যমে কাহাদিগের সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে (যাবৎ তাহা দেখি), যাহারা দুর্ব্বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের প্রিয়চিকীর্ষায় এই খানে যুদ্ধে সমাগত হইয়াছে, সেই সকল যুদ্ধার্থিদিগকে (যাবৎ) আমি দেখি, (তাবৎ) তুমি উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন কর। ২১।২২।২৩।

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥২৪॥
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥২৫॥

সঞ্জয় বলিলেন—

হে ভারত*! অর্জ্জুনের দ্বারা হৃষীকেশ এইরূপ অভিহিত হইয়া উভয় সেনার মধ্যে ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখ সকল রাজগণের সম্মুখে সেই উৎকৃষ্ট রথ স্থাপন করিয়া কহিলেন, হে পার্থ সমবেত কুরুগণকে এই নিরীক্ষণ কর।২৪।২৫।

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৃনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্মাতুলান্ ভ্রাতৃন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা ॥
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥২৬॥

তখন অর্জ্জুন সেইখানে স্থিত উভয়সেনায় পিতৃব্যগণ, পিতামহগণ, আচার্য্যগণ, মাতুলগণ, ভ্রাতৃগণ, পুত্রগণ, পৌত্রগণ, শ্বশুরগণ, সখিগণ † এবং সুহৃদগণকে দেখিলেন। ২৬।

---

* ধৃতরাষ্ট্র এবং অর্জ্জুন উভয়কেই "ভারত" বলিয়া এই গ্রন্থে সম্বোধন করা হইয়াছে, তাহার কারণ, ইহাঁরা দুষ্মন্তপুত্র ভরতের বংশ।

† সখা ও সুহৃদে অবশ্য প্রভেদ আছে। যাঁহার নিকট উপকার পাওয়া গিয়াছে সেই সখা।

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥২৭॥

সেই কুন্তীপুত্র সেই সকল বন্ধুগণকে অবস্থিত দেখিয়া, পরম কৃপাবিষ্ট হইয়া বিষাদপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন।২৭।

অর্জ্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্। *
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥২৯॥

অর্জ্জুন বলিলেন—

হে কৃষ্ণ! এই যুদ্ধেচ্ছু সম্মুখে অবস্থিত স্বজনগণকে দেখিয়া আমার শরীর অবসন্ন হইতেছে এবং মুখ শুষ্ক হইতেছে ২৮।

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥২৯॥

আমার দেহ কাঁপিতেছে, রোমহর্ষ জন্মিতেছে, হস্ত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িতেছে এবং চর্ম্ম জ্বালা করিতেছে।২৯।

ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥ ৩০ ॥

হে কেশব! আমি আর থাকিতে পারিতেছি না, আমার মন যেন ভ্রান্ত হইতেছে, আমি দুর্লক্ষণ সকল দর্শন করিতেছি। ৩০।

ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥৩১॥

যুদ্ধে আত্মীয়বর্গকে বিনাশ করায় আমি কোন মঙ্গল দেখিনা—হে কৃষ্ণ! আমি জয় চাহি না, রাজ্য সুখ চাহি না।৩১।

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥৩২॥

---

* দৃষ্ট্বেমং স্বজনং কৃষ্ণ যুযুৎসুং সমুপস্থিতম্। ইতি পাঠান্তর আছে।

তদর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ।

তইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥৩৩॥
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন ॥ ৩৪ ॥

যাহাদিগের জন্য রাজ্য, ভোগ, সুখ, কামনা করা যায়, সেই আচার্য্য, পিতা, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালা, এবং কুটুম্বগণ, ধন প্রাণ ত্যাগ করিয়া এই যুদ্ধে অবস্থিত, তখন হে গোবিন্দ! আমাদের রাজ্যেই কাজ কি' ভোগেই কাজ কি, জীবনেই কাজ কি? হে মধুসূদন! আমি হত হই হইব; তথাপিও তাহাদিগকে মারিতে ইচ্ছা করি না। ৩২,৩৩।৩৪।

"আমি হত হই হইব (ঘ্নতোপি)" কথার তাৎপর্য্য এই যে "আমি না মারিলে তাহারা আমাকে মারিয়া ফেলিতে পারে বটে। যদি তাই হয়, সেও ভাল, তথাপি আমি তাহাদিগকে মারিব না।" বস্তুতঃ ভীষ্ম, দ্রোণের সহিত অর্জ্জুন এই ভাবেই যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অর্জ্জুনের 'মৃদুযুদ্ধের" কথা আমরা অনেকবার শুনিতে পাই।

অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন ॥ ৩৫ ॥

পৃথিবীর কথা দূরে থাক ত্রৈলোক্যের রাজ্যের জন্যই বা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণকে বধ করিলে কি সুখ হইবে, জনার্দ্দন? ৩৫।

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্। *
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥৩৬॥

এই আততায়িদিগকে বিনাশ করিলে আমাদিগকে পাপ আশ্রয় করিবে, অতএব আমরা সবান্ধব ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদিগকে বিনাশ করিতে পারিব না। হে মাধব! স্বজন হত্যা করিয়া আমরা কি প্রকারে সুখী হইব। ৩৬।

---

* স্ববান্ধবান্ ইতি পাঠান্তর আছে।

ছয় জনকে আততায়ী বলে—

অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ।

ক্ষেত্রদারাপহারীচ ষড়েতে আততায়িনঃ॥

যে ঘরে আগুণ দেয়, যে বিষ দেয়, শস্ত্রপাণি, ধনাপহারী, ভূমি যে অপহরণ করে, ও বনিতা অপহরণ করে, এই ছয়জন আততায়ী। অর্থ শাস্ত্রানুসারে আততায়ী বধ্য। টীকাকারেরা অর্জ্জুনের বাক্যের এইরূপ অর্থ করেন, যে যদিও অর্থশাস্ত্রানুসারে আততায়ী বধ্য তথাপি ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে গুরু প্রভৃতি অবধ্য। ধর্ম্মশাস্ত্রের কাছে অর্থশাস্ত্র দুর্ব্বল, সুতরাং দ্রোণ ভীষ্মাদি আততয়ী হইলেও তাঁহাদিগের বধে পাপাশ্রয় হইবে। একালে আমরা "Law" এবং "Morality"র মধ্যে যে প্রভেদ করি এ বিচার ঠিক সেই রূপ। "Law"র উপর "Morals"। ইংরেজের পিনাল কোডেও লিখে যে অবস্থা বিশেষে আততায়ীর বধ জন্য দণ্ড নাই। কিন্তু সেই সকল অবস্থায় আততায়ীর বধ সর্ব্বত্র আধুনিক নীতিশাস্ত্রসঙ্গত নহে।

আনন্দগিরি এই শ্লোকের আর একটা অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন এমন ও বুঝাইতে পারে যে গুরু প্রভৃতি বধ করিলে আমরাই আততায়ী হইব; সুতরাং আমাদের পাপাশ্রয় করিবে। "গুরুভ্রাতৃসুহৃৎপ্রভৃতীনেতান-হত্বা বয়মাততায়িনঃ স্যামঃ।"

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।

কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্॥৩৭॥

কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুং।

কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দ্দন॥৩৮॥

যদ্যপি ইহারা লোভে হতজ্ঞান হইয়া কুলক্ষয়দোষ এবং মিত্রদ্রোহে যে পাতক তাহা দেখিতেছে না, কিন্তু হে জনার্দ্দন! আমরা কুলক্ষয় করার দোষ দেখিতেছি, আমরা সে পাপ হইতে নিবৃত্তিবুদ্ধিবিশিষ্ট কেন না হইব? । ৩৭।৩৮।

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।

ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত॥৩৯॥

কুলক্ষয়ে সনাতন কুলধর্ম্ম নষ্ট হয়। ধর্ম্ম নষ্ট হইলে অবশিষ্ট কুল অধর্ম্মে অভিভূত হয়। ৩৯।

সনাতন কুলধর্ম্ম—অর্থাৎ পূর্ব্বপুরুষপরম্পরা প্রাপ্ত কুলধর্ম্ম।

অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥৪০॥

হে কৃষ্ণ! অধর্ম্মাভিভবে কুলস্ত্রীগণ দুষ্টা হয়, স্ত্রীগণ দুষ্টা হইলে, হে বার্ষ্ণেয়! * বর্ণসঙ্কর জন্মায়। ৪০।

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরোহ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥৪১॥

এই সঙ্কর কুলনাশকারিদিগের কুলের নরকের নিমিত্ত হয়। পিণ্ডোদক ক্রিয়ার লোপ হেতু তাহাদিগের পিতৃগণ পতিত হয়। ৪১।

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥৪২॥

এইরূপ কুলঘ্নদিগের বর্ণসঙ্করকারক এই দোষে জাতিধর্ম্ম এবং সনাতন কুলধর্ম্ম উৎসন্ন যায়। ৪২।

উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসোভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥৪৩॥

হে জনার্দ্দন! আমরা শুনিয়াছি যে যে মনুষ্যদিগের কুলধর্ম্ম উৎসন্ন যায় তাহাদিগের নিয়ত নরকে বাস হয়। ৪৩।

৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, এই পাঁচটী শ্লোক আধুনিক কৃতবিদ্য পাঠকদিগের কানে ভাল লাগিবে না। ইহা বর্ণসঙ্কর বিরোধী প্রাচীন কুসংস্কারপূর্ণ বলিয়া বোধ হইবে, তার উপর "লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ" প্রভৃতি অলঙ্কারও আছে। বর্ণসঙ্করের উপর গীতাকারের বিশেষ বিদ্বেষ দেখা যায়। ইনি স্বয়ং ভগবানের মুখেও বর্ণসঙ্করের নিন্দা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। আমরা যখন তদ্বিষয়িণী ভগবদুক্তির সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব তখন তদুক্তির তাৎ-

* কৃষ্ণ বৃষ্ণিবংশসম্ভূত, এজন্য বার্ষ্ণেয়।

পর্য্য বুঝিবার চেষ্টা করিব। এক্ষণে অর্জ্জুনোক্তির স্থূল মর্ম্ম বুঝিলেই যথেষ্ট হইল। কুলের পুরুষগণ মরিলে কুলস্ত্রীগণ যে ব্যভিচারিণী হয় ইহা সচরাচর দেখা যায়। কুলস্ত্রীগণ ব্যভিচারিণী হইলে তাহাদিগের গর্ভে নীচ লোকের ঔরসে সন্তান জন্মিতে থাকে। বংশ নীচসন্ততিতে পরিপূর্ণ হয়, কাজেই কুলধর্ম্ম লোপ পায়। বর্ণসঙ্করে যাঁহারা দোষ না দেখেন, এবং পিতৃাদির স্বর্গকারকতায় যাঁহারা বিশ্বাসবান্ নহেন—স্বর্গ নরকাদিও যাঁহারা মানেন না, তাঁহারাও বোধ করি এতটুকু স্বীকার করিবেন।* বাকীটুকু কালোচিত ভাষা এবং অলঙ্কার। † কথাটা অতি মোটা কথা বটে। কথাটা অর্জ্জুনের মুখে বসাইবার একটু কারণ আছে—অর্জ্জুনের এই "কুলধর্ম্মের" বড়াইয়ের উত্তরে ভগবান্ "স্বধর্ম্মের" কথাটা তুলিবেন। এটুকু গ্রন্থকারের কৌশল। "ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ" এই অমৃতময় বাক্যের পর বলিবার যোগ্য কথা এ নহে।

---

* The women, for instance, whose husbands, friends or relations have been all slain in battle, no longer restrained by law, seek husbands among other and lower castes, or tribes, causing a mixture of blood, which many nations at all ages have regarded as a most serious evil ; but particularly those who—like the Aryans, the Jews and the Scotch—were at first surrounded by foreigners very different to themselves, and thus preserved the distinction and genealogies of their races more effectively than any other. (*Thomson's Translation of the Bhagavadgita P. 7*).

* By the destruction of the males the rites of both tribe and family would cease, because women were not allowed to perform them ; and confusion of castes would arise, for the women would marry men of another caste. Such marriages were considered impure (Manu X. 1-40) Such marriages produced elsewhere a confusion of classes. Livy tells us that the Roman patricians at the instance of Canuleius complained of the intermarriages of the plebian class with their own, affirming that "omnia divina humanaque turbari, ut qui natus sit, ignoret, cujus sanguinis, quorum sacrorum sit"

(*Davies' Translation of the Bhagavadgita p. 26*)

† In bringing forward these and other melancholy superstitions of Brahmanism in the mouth of Arjuna, we are not to suppose that our poet—though as much Brahman as philosopher in many unimportant points of belief—himself received and approved of them. (*Thomson p. 7*)

অহো বত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ং।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥৪৪॥

হায়! আমরা রাজ্যসুখলোভে স্বজনকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছি—মহৎ পাপ করিতে অধ্যবসায় করিয়াছি। ৪৪।

যদিমামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণেহন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥৪৫॥

যদি আমি প্রতীকারপরাঙ্মুখ এবং অশস্ত্র হইলে শস্ত্রধারী ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ যুদ্ধে আমাকে বিনাশ করে তাহাও আমার পক্ষে অপেক্ষাকৃত মঙ্গলকর হইবে। ৪৫।

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থউপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরংচাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥৪৬॥

সঞ্জয় বলিলেন—

অর্জ্জুন এই রূপ বলিয়া শোকাকুল মানসে ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিয়া সংগ্রামস্থলে রথোপস্থে উপবেশন করিলেন। ৪৬

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াংযোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদে অর্জ্জুনবিষাদো*
নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

বলিয়াছি, গীতার প্রথম অধ্যায়ে ধর্ম্মতত্ত্ব কিছু নাই, কিন্তু এই অধ্যায় একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য। কাব্যের উপাদান সকল এখানে বড় সুন্দর সাজান হইয়াছে। কুরুক্ষেত্রে উভয় সেনা সুসজ্জিত হইয়া পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছে। পাণ্ডবদিগের মহতী সেনা ব্যূহবদ্ধা হইয়াছে দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধন, পরম রণপণ্ডিত আপনার আচার্য্যকে দেখাইলেন। একটু ভীত হইয়া আচার্য্যকে বলিলেন, "আপনারা আমার সেনাপতি ভীষ্মকে রক্ষা করিবেন।" কিন্তু সেই বৃদ্ধ ভীষ্ম যুবার অপেক্ষাও উদ্যমশীল—

* কোন কোন পুস্তকে "সৈন্যদর্শনং" ইতি পাঠ আছে।

তিনি সেই সময়ে সিংহনাদ করিয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন—(শঙ্খ তখনকার bugle)। তাঁহার শঙ্খধ্বনি শুনিয়া উৎসাহে বা প্রত্যুত্তরে উভয় সৈন্যস্থ যোদ্ধৃগণ সকলেই শঙ্খধ্বনি করিলেন। তখন উভয়দলে নানাবিধ রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল—শঙ্খে, ভেরীতে, অন্যান্য বাদ্যের কোলাহলে, গগন বিদীর্ণ হইল—আকাশ পৃথিবী তুমুল হইয়া উঠিল। সেই মহোৎসাহের সময়ে স্থিরচিত্ত অর্জ্জুন—যাঁহার উপরে কৌরব জয়ের ভার—আপনার সারথি কৃষ্ণকে বলিলেন—"একবার উভয় সেনার মধ্যে রথ রাখ দেখি—দেখি কাহার সঙ্গে আমায় যুদ্ধ করিতে হইবে।" কৃষ্ণ, শ্বেতাশ্বযুক্ত মহারথ উভয় সেনার মধ্যে স্থাপিত করিলেন,—সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বকর্ত্তা বলিলেন, "এই দেখ।" অর্জ্জুন দেখিলেন দুই দিকেই ত আপনার জন,—পিতৃব্য, পিতামহ, পুত্র পৌত্র, মাতুল, শ্বশুর, শ্যালা, সুহৃৎ, সখা—তাঁহার গা কাঁপিয়া উঠিল, শরীরে রোমাঞ্চ হইল, মুখ শুকাইল, দেহ অবসন্ন হইল, মাথা ঘুরিল, হাত হইতে সেই মহাধনু গাণ্ডীব খসিয়া পড়িল। বলিলেন, "কৃষ্ণ! রাজ্য যাদের জন্য, তাদের মারিয়া রাজ্যে কি ফল?—আমি যুদ্ধ করিব না।" এই সংগ্রামক্ষেত্র, দুই দিকে দুই মহতী সেনা, এই তুমুল কোলাহল, রণবাদ্য এবং ঘোরতর উৎসাহ—সেই সময়ে এই মহাবীরের প্রথমে স্থৈর্য্য তার পর তাঁহার হৃদয়ে সেই করুণ এবং মহা প্রশান্ত ভাব—এরূপ মহচ্চিত্র সাহিত্য জগতে দুর্লভ। "ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ নচ রাজ্যং সুখানি চ"—ঈদৃশী অমৃতময়ী বাণী আর কে কোথায় শুনিয়াছে?

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সঞ্জয় উবাচ।

তন্তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ॥ ১॥

সঞ্জয় বলিলেন।

তখন সেই কৃপাবিষ্ট অশ্রুপূর্ণাকুললোচন বিষাদযুক্ত (অর্জ্জুন) কে মধুসূদন এই কথা বলিলেন ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ।

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন ॥ ২ ॥

শ্রীভগবান বলিলেন।

হে অর্জ্জুন! এই শঙ্কটে অনার্য্যসেবিত স্বর্গহানিকর এবং অকীর্ত্তিকর তোমার এই মোহ কোথা হইতে উপস্থিত হইল? ॥ ২ ॥

মা ক্লৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয়* নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠপরন্তপ ॥ ৩ ॥

হে কৌন্তেয়! ক্লীবতা প্রাপ্ত হইও না, ইহা তোমার উপযুক্ত নহে। হে পরন্তপ! ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করিয়া উত্থান কর।৩।

অর্জ্জুন উবাচ।

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥ ৪ ॥

অর্জ্জুন বলিলেন,

হে শত্রুনিসূদন মধুসূদন! পূজার্হ যে ভীষ্ম এবং দ্রোণ, যুদ্ধে তাঁহাদের সহিত বাণের দ্বারা কি প্রকারে আমি প্রতিযুদ্ধ করিব? ৪।

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়োভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহলোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ॥ ৫ ॥

মহানুভব গুরুদিগকে বধ না করিয়া ইহলোকে ভিক্ষা অবলম্বন করিতে

---

* "ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ" ইতি আনন্দগিরি ধৃত পাঠ।

হয় সেও শ্রেয়। আর গুরুদিগকে বধ করিয়া যে অর্থ কাম ভোগ করা যায় তাহা রুধিরলিপ্ত। ৫।

ন চৈতদ্বিদ্ম কতরন্নো গরীয়ো
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম
স্তেবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬ ॥

আমরা জয়ী হই, বা আমাদিগকে জয় করুক, ইহার মধ্যে কোনটী শ্রেয় তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না—যাহাদিগকে বধ করিয়া আমরা বাঁচিতে ইচ্ছা করি না, সেই ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ সম্মুখে অবস্থিত।৬।

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেহহংশাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥ ৭ ॥

কার্পণ্য দোষে আমি অভিভূত হইয়াছি এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার চিত্ত বিমূঢ় হইয়াছে, তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। যাহা ভাল হয় আমাকে নিশ্চিত করিয়া বল। আমি তোমার শিষ্য এবং তোমার শরণাপন্ন হইতেছি—আমাকে শিক্ষা দাও।৭।

কার্পণ্য অর্থে দীনতা। তারানাথ 'বাচস্পত্যে' এই অর্থ নির্দ্দেশ করিয়া উদাহরণস্বরূপ গীতার এই বচনটী উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভরসা করি কোন পাঠকই এখানে দীনতা অর্থে দারিদ্র্য বুঝিবেন না। 'দীন' অর্থে মহাব্যসন-প্রাপ্ত। উদাহরণস্বরূপ—তারানাথ রামায়ণ হইতে আর একটী বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন যথাঃ—"মহদ্বাব্যসনং প্রাপ্তো দীনঃ কৃপণ উচ্যতে।" আনন্দগিরি বলেন "যোহল্পাং স্বল্পামপি স্বক্ষতিং ন ক্ষমতে স কৃপণঃ।" যে সামান্য ক্ষতি স্বীকার করিতে পারে না সেই কৃপণ * শ্রীধরস্বামী বুঝাইয়াছেন যে "এই

* কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাং "কার্পণ্য" শব্দের প্রতিবাক্য দিয়াছেন "helplessness."

সকল বন্ধুবর্গকে নষ্ট করিয়া কি প্রাণ ধারণ করিব ?” অর্জ্জুনের ইতি বুদ্ধিই কার্পণ্য। তিনি “কার্পণ্য দোষ” ইতি সমাসকে দ্বন্দ্ব সমাস বুঝিয়াছেন— কার্পণ্য এবং দোষ। দোষ শব্দে এখানে পূর্ব্বকথিত কুলক্ষয়কৃতের পাপ বুঝিতে হইবে। অন্যান্য টীকাকারেরা সেরূপ অর্থ করেন নাই।

নহি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্‌-
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্যভূমাবসপত্নমৃদ্ধম্
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥ ৮ ॥

পৃথিবীতে অসপত্ন সমৃদ্ধ রাজ্য এবং সুরলোকের আধিপত্য পাইলেও যে শোক আমার ইন্দ্রিয়গণকে বিশোষণ করিবে, তাহা কিসে যাইবে, আমি দেখিতেছি না।৮।

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ ॥ ৯ ॥

সঞ্জয় বলিতেছেন,

শত্রুজয়ী অর্জ্জুন * হৃষীকেশকে এইরূপ বলিয়া, যুদ্ধ করিব না, ইহা গোবিন্দকে বলিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। ৯।

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০ ॥

হে ভারত! হৃষীকেশ হাস্য করিয়া উভয় সেনার মধ্যে বিষাদপর অর্জ্জুনকে এই কথা বলিলেন। ১০।

---

* মূলে ‘গুড়াকেশ’ শব্দ আছে। গুড়াকেশ অর্জ্জুনের একটি নাম। টীকাকারেরা ইহার অর্থ করেন ‘নিদ্রাজয়ী’। অন্যাবিধ অর্থও দেখা গিয়াছে।

শ্রীভগবান উবাচ।

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ॥ ১১॥

শ্রীভগবান বলিতেছেন

তুমি বিজ্ঞের ন্যায় কথা কহিতেছ বটে; কিন্তু যাহাদের জন্য শোক করা উচিত নহে তাহাদের জন্য শোক করিতেছ। কি জীবিত, কি মৃত, কাহারও জন্য পণ্ডিতেরা শোক করেন না।১১।

এইখানে প্রকৃত গ্রন্থারম্ভ। এখন, কি কথাটা উঠিতেছে তাহা বুঝিয়া দেখা যাউক।

দুর্য্যোধনাদি অন্যায় পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের রাজ্যাপহরণ করিয়াছে। যুদ্ধ বিনা তাহার পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। এখানে যুদ্ধ কি কর্ত্তব্য?

মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব্বে এই কথাটার অনেক বিচার হইয়াছে। বিচারে স্থির হইয়াছিল যে যুদ্ধই কর্ত্তব্য। তাই এই উভয় সেনা সংগৃহীত হইয়া পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছে।

এ অবস্থায় যুদ্ধ কর্ত্তব্য কি না, আধুনিক নীতির অনুগামী হইয়া বিচার করিলেও, আমরা পাণ্ডবদিগের সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য স্বীকার করিব। এই জগতে যত প্রকার কর্ম্ম আছে, তন্মধ্যে সচরাচর যুদ্ধই সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। কিন্তু ধর্ম্মযুদ্ধও আছে। আমেরিকায় ওয়াশিংটন, ইউরোপে উলিয়ম দি সাইলেণ্ট, এবং ভারতবর্ষে প্রতাপসিংহ প্রভৃতি যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা পরম ধর্ম্ম—দানাদি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। পাণ্ডবদিগেরও এই যুদ্ধপ্রবৃত্তি সেই শ্রেণীর ধর্ম্ম। এ বিচার আমি কৃষ্ণচরিত্রে সবিস্তারে করিয়াছি—এক্ষণে সে সকল পুনরুক্ত করিবার প্রয়োজন নাই।* এ বিচারের স্থূল মর্ম্ম এই যে, যেটি যাহার ধর্ম্মানুমত অধিকার, তাহার সাধ্যানুসারে রক্ষা করা তাহার ধর্ম্ম। রক্ষার অর্থ এই যে, কেহ অন্যায় পূর্ব্বক, তাহার অপহরণ বা অবরোধ করিতে না পারে; করিলে তাহার পুনরুদ্ধার এবং অপহর্ত্তার দণ্ড বিধান করা কর্ত্তব্য। যদি লোকে স্বেচ্ছামত পরকে অধিকারচ্যুত করিয়া সচ্ছন্দে পরস্বাপ-

* এবং নবজীবন প্রথম খণ্ড দেখ।

হরণ পূর্ব্বক উপভোগ করিতে পারে, তবে সমাজ এক দিন টিকে না। সকল মনুষ্যই তাহা হইলে অনন্তঃ দুঃখ ভোগ করিবে। অতএব আপনার সম্পত্তির পুনরুদ্ধার কর্ত্তব্য। যদি বল ভিন্ন অন্য সদুপায় থাকে, তবে তাহাই অগ্রে অবলম্বনীয়। যদি বল ভিন্ন সদুপায় না থাকে, তবে বলই প্রযুজ্য। এখানে বলই ধর্ম্ম।

মহাভারতে দেখি যে অর্জ্জুন ইতিপূর্ব্বে সকল সময়েই যুদ্ধপক্ষ ছিলেন। যখন, যুদ্ধে স্বজনবধের সময় উপস্থিত হইল, বধ্য স্বজনবর্গের মুখ দেখিয়া তিনি যে কাতরচিত্ত ও যুদ্ধবুদ্ধি হইতে বিচলিত হইবেন, ইহাও সজ্জনস্বভাব-সুলভ ভ্রান্তি।

মহাভারতে ইহাও দেখিতে পাই, যে যাহাতে যুদ্ধ না হয়, তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। পরে যখন যুদ্ধ অলংঘ্য হইয়া উঠিল, তখন তিনি যুদ্ধে কোন পক্ষে ব্রতী হইতে অস্বীকৃত হইয়া কেবল অর্জ্জুনের সারথ্য মাত্র স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত হইলেও তিনি পরম ধর্ম্মজ্ঞ, সুতরাং এ স্থলে ধর্ম্মের পথ কোন্‌টা তাহা অর্জ্জুনকে বুঝাইতে বাধ্য। অতএব অর্জ্জুনকে বুঝাইতেছেন, যে যুদ্ধ করাই এখানে ধর্ম্ম, যুদ্ধ না করাই অধর্ম্ম।

বাস্তবিক যে, যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধারম্ভসময়ে কৃষ্ণার্জ্জুনে এই কথোপকথন হইয়াছিল, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু গীতাকার এইরূপ কল্পনা করিয়া কৃষ্ণপ্রচারিত ধর্ম্মের সার মর্ম্ম সঙ্কলিত করিয়া মহাভারতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, ইহা বিশ্বাস করা যাইতে পারে।

যুদ্ধে প্রবৃত্তিসূচক যে সকল উপদেশ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে দিতেছেন, তাহা এই দ্বিতীয় অধ্যায়েই আছে। অন্যান্য অধ্যায়েও "যুদ্ধ কর" এইরূপ উপদেশ দিয়া ভগবান্ মধ্যে মধ্যে আপনার বাক্যের উপসংহার করেন বটে, কিন্তু সে সকল বাক্যের সঙ্গে যুদ্ধের কর্ত্তব্যতার বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। ইহাই বোধ হয়, যে যে কৌশলে গ্রন্থকার এই ধর্ম্মব্যাখ্যার প্রসঙ্গ মহাভারতের সঙ্গে সম্বদ্ধ করিয়াছেন, তাহার অপ্রকৃততা পাঠক অনুভূত করিতে না পারেন, এই জন্য যুদ্ধের কথাটা মধ্যে মধ্যে পাঠককে স্মরণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। নতুবা যুদ্ধপক্ষ সমর্থন এই গ্রন্থের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে। যুদ্ধ-

পক্ষ সমর্থনকে উপলক্ষ্য করিয়া সমস্ত মনুষ্যধর্ম্মের প্রকৃত পরিচয় প্রচারিত করাই ইহার উদ্দেশ্য।

এই কথাটা বিশেষ করিয়া আলোচনা করিলে, বোধ হয় পাঠক মনে মনে বুঝিবেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে উভয় সেনার সম্মুখে রথ স্থাপিত করিয়া, কৃষ্ণার্জ্জুনে যথার্থ এইরূপ কথোপকথন যে হইয়াছিল তাহাতে বিশেষ সন্দেহ। দুই পক্ষের সেনা ব্যূহিত হইয়া পরস্পরকে প্রহার করিতে উদ্যত, সেই সময়ে যে এক পক্ষের সেনাপতি উভয় সৈন্যের মধ্যে রথ স্থাপন করিয়া অষ্টাদশ অধ্যায় যোগধর্ম্ম শ্রবণ করিবেন, এ কথাটা বড় সম্ভবপর বলিয়াও বোধ হয় না। একথার যৌক্তিকতা স্বীকার করা যাউক না যাউক, পাঠকের আর কয়েকটি কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

(১) গীতায় ভগবৎ প্রচারিত ধর্ম্ম সঙ্কলিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু, গীতাগ্রন্থখানি ভগবৎপ্রণীত নহে, অন্য ব্যক্তি ইহার প্রণেতা।

(২) যে ব্যক্তি এই গ্রন্থের প্রণেতা, তিনি যে কৃষ্ণার্জ্জুনের কথোপকথন-কালে সেখানে উপস্থিত থাকিয়া সকলই স্বকর্ণে শুনিয়াছিলেন, এবং শুনিয়া সেইখানে বসিয়া সব লিখিয়াছিলেন, বা স্মৃতিধরের মত স্মরণ রাখিয়াছিলেন, এমন কথাও বিশ্বাস যোগ্য হইতে পারে না। সুতরাং যে সকল কথা গীতাকার ভগবানের মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন, সে সকলই যে প্রকৃত পক্ষে ভগবানের মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল, এমন বিশ্বাস করা যায় না। অনেক কথা যে গ্রন্থকারের নিজের মত, তিনি ভগবানের মুখ হইতে বাহির করিতে-ছেন, ইহা সম্ভব।

যাঁহারা বলিবেন, যে এই গ্রন্থ মহাভারতান্তর্গত, মহাভারত মহর্ষি ব্যাস প্রণীত, তিনি যোগ বলে সর্ব্বজ্ঞ এবং অভ্রান্ত, অতএব এরূপ সংশয় এখানে অকর্ত্তব্য, তাঁহাদিগের সঙ্গে আমাদের কোন বিচার হইতে পারে না। সে শ্রেণীর পাঠকের জন্য এই ব্যাখ্যা প্রণীত হয় নাই, ইহা আমার বলা রহিল।

(৩) সংস্কৃত সকল গ্রন্থে মধ্যে মধ্যে প্রক্ষিপ্ত শ্লোক পাওয়া যায়। শঙ্করা-চার্য্যের ভাষ্য প্রণীত হইবার পর কোন শ্লোক গীতায় প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে নাই, তাঁহার ভাষ্যের সঙ্গে এখন প্রচলিত মূলের ঐক্য আছে। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের

অন্যান সহস্র বা ততোধিক বৎসর পূর্ব্বে ও গীতা প্রচলিত ছিল। এই কাল মধ্যে যে কোন শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হয় নাই তাহা কি প্রকারে বলিব? আমরা মধ্যে মধ্যে এমন শ্লোক পাইব, যাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই বোধ হয়।

এই সকল কথা স্মরণ না রাখিলে আমরা গীতার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিব না। এ জন্য আগেই এই কয়টি কথা বলিয়া রাখিলাম। এক্ষণে দেখা যাউক, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই যুদ্ধের ধর্ম্ম্যতা বুঝাইতেছেন, সে সকল কথার সার মর্ম্ম কি?

আমরা উনবিংশ শতাব্দীর নীতিশাস্ত্রের বশবর্ত্তী হইয়া উপরে যে প্রণালীতে সংক্ষেপে এই যুদ্ধের ধর্ম্ম্যতা বুঝাইলাম, শ্রীকৃষ্ণ যে সে প্রথা অবলম্বন করেন নাই, ইহা বলা বাহুল্য। তাঁহার কথার স্থূল মর্ম্ম এই, যে সকলেরই স্বধর্ম্মপালন করা কর্ত্তব্য।

আগে আমাদিগের বুঝিয়া দেখা চাই যে স্বধর্ম্ম সামগ্রীটা কি?

শঙ্করাদি পূর্ব্বপণ্ডিতগণের পক্ষে এ তত্ত্ব বুঝান বড় সহজ হইয়াছিল। অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়, সুতরাং অর্জ্জুনের স্বধর্ম্ম ক্ষাত্রধর্ম্ম বা যুদ্ধ। তিনি যে যুদ্ধ না করিয়া বরং বলিতেছিলেন, যে "ভিক্ষাবলম্বন করিব, সেও ভাল," সেটা তাহার পরধর্ম্মাবলম্বনের ইচ্ছা—কেননা ভিক্ষা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম।*

কিন্তু আমরা এই ব্যাখ্যায় সকল বুঝিলাম কি? বর্ণাশ্রমধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুগণের স্বধর্ম্ম বর্ণবিভাগানুসারে নির্ণীত হইতে পারে, ইহা যেন বুঝিলাম। কিন্তু অহিন্দুর পক্ষে স্বধর্ম্ম কি? ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের যে সমষ্টি, তাহা পৃথিবীর লোক সংখ্যার অতি ক্ষুদ্রাংশ—অধিকাংশ মনুষ্য চতুর্ব্বর্ণের বাহির; তাহাদের স্বধর্ম্ম নাই? জগদীশ্বর কি তাহাদের কোন ধর্ম্ম বিহিত করেন নাই? কোটি কোটি মনুষ্য সৃষ্টি করিয়া কেবল ভারতবাসির জন্য ধর্ম্মবিহিত করিয়া আর সকলকেই ধর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন? ভগবদুক্ত ধর্ম্ম কি হিন্দুর জন্যই? ম্লেচ্ছেরা কি তাঁহার সন্তান নহে? ভাগবত ধর্ম্ম এমন অনুদার নহে।

---

* শোকমোহাভ্যাং হ্যভিভূতবিবেকবিজ্ঞানঃ স্বত এব ক্ষত্রধর্ম্মে যুদ্ধে প্রবৃত্তোপি তস্মাদ্‌যুদ্ধাদুপররাম পরধর্ম্মঞ্চ ভিক্ষাজীবনাদিকং কর্ত্তুং প্রববৃতে।— শাঙ্করভাষ্য।

যিনি স্বয়ং জগদীশ্বরের এইরূপ ধর্ম্মচ্যুতিতে বিশ্বাসবান্, তিনি খ্রীষ্টানের* তুল্য। আর যিনি তাহাতে বিশ্বাসবান্ নহেন, তিনি "স্বধর্ম্মের" অন্য তাৎপর্য্যের অনুসন্ধান করিবেন সন্দেহ নাই।

যাহার যে ধর্ম্ম, তাহার তাই স্বধর্ম্ম। এখন মনুষ্যের ধর্ম্ম কি? যাহা লইয়া মনুষ্যত্ব, তাহাই মনুষ্যের ধর্ম্ম। কি লইয়া মনুষ্যত্ব? মানুষের শরীর আছে, এবং মন † আছে। এই শরীরই বা কি? এবং মনই বা কি? শরীর কতকগুলি জড়পদার্থের সমবায়, তাহাতে কতকগুলি শক্তি আছে। এই শক্তিগুলি শরীর হইতে তিরোহিত হইলে, মনুষ্যত্ব থাকে না; কেন না মানুষের মৃতদেহে মনুষ্যত্ব আছে, এমন কথা বলা যায় না। তবেই জড়পদার্থকে ছাড়িয়া দিতে হইবে—সেই দৈহিকী শক্তি গুলিই মনুষ্য শরীরের প্রকৃত উপাদান। আমি স্থানান্তরে এই গুলির নাম দিয়াছি—"শারীরিকী বৃত্তি।" মনুষ্যের মনও এইরূপ শক্তি বা বৃত্তির সমষ্টি। সেই গুলির নাম দেওয়া যাউক, মানসিক বৃত্তি। এখন দেখা যাইতেছে যে এই শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি লইয়াই মানুষ, বা মানুষের মানুষত্ব।

যদি তাই হইল, তবে সেই সকল বৃত্তি গুলির বিহিত অনুশীলনই মানুষের ধর্ম্ম।

বৃত্তির সঞ্চালন দ্বারা আমরা কি করি? হয় কিছু কর্ম্ম করি, না হয় কিছু জানি। কর্ম্ম ও জ্ঞান ভিন্ন মনুষ্যের জীবনে ফল আর কিছু নাই। ‡

---

* খ্রীষ্টানদিগের বিশ্বাস যে, যে যীশুখ্রীষ্ট না ভজে জগদীশ্বর তাহাকে অনন্তকাল জন্য নরকে নিক্ষেপ করেন।

† "মন" চলিত কথা, এইজন্য "মন" শব্দ ব্যবহার করিলাম। এই চলিত কথাটি ইংরেজি "mind" শব্দের অনুবাদ মাত্র। হিন্দুদর্শন শাস্ত্রের ভাষা ব্যবহার করিতে গেলে, ইহার পরিবর্ত্তে বুদ্ধি ও মন উভয় শব্দ, এবং তৎসঙ্গে অহঙ্কার এই তিনটি শব্দই ব্যবহার করিতে হইবে। তাহার পরিবর্ত্তে "matter and mind" এই বিভাগের অনুবর্ত্তী হওয়াই ভাল।

‡ কোম্‌ৎ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ তিনভাগে চিত্তপরিণতিকে বিভক্ত করেন, "Thought, Feeling, Action," ইহা ন্যায্য। কিন্তু Feeling অবশেষে Thought কিম্বা Action প্রাপ্ত হয়। এইজন্য পরিণামের ফল জ্ঞান ও কর্ম্ম এই দ্বিবিধ বলাও ন্যায্য।

অতএব জ্ঞান ও কর্ম্ম মানুষের স্বধর্ম্ম। সকল বৃত্তি গুলি সকলেই যদি বিহিতরূপে অনুষ্ঠিত করিত, তবে জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়েই সকল মনুষ্যেরই স্বধর্ম্ম হইত। কিন্তু মনুষ্য সমাজের অপরিণতাবস্থায় তাহা সাধারণতঃ ঘটিয়া উঠে না।* কেহ কেবল জ্ঞানকেই প্রধানতঃ স্বধর্ম্মস্থানীয় করেন, কেহ কর্ম্মকে ঐরূপ প্রধানতঃ স্বধর্ম্ম স্বরূপ গ্রহণ করেন।

জ্ঞানের চরমোদ্দেশ্য ব্রহ্ম ; সমস্ত জগত ব্রহ্মে আছে। এ জন্য জ্ঞানার্জ্জন যাহাদিগের স্বধর্ম্ম তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলা যায়। ব্রাহ্মণ শব্দ ব্রহ্মণ্ শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে।

কর্ম্মকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা বুঝিতে গেলে কর্ম্মের বিষয়টা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। জগতে অন্তর্ব্বিষয় আছে, ও বহির্ব্বিষয় আছে। অন্তর্ব্বিষয় কর্ম্মের বিষয়ীভূত হইতে পারে না ; বহির্ব্বিষয়ই কর্ম্মের বিষয়। সেই বহির্ব্বিষয়ের মধ্যে কতকগুলিই হৌক, অথবা সবই হৌক, মনুষ্যের ভোগ্য। মনুষ্যের কর্ম্ম মনুষ্যের ভোগ্য বিষয়কেই আশ্রয় করে। সেই আশ্রয় ত্রিবিধ, যথা, (১) উৎপাদন (২) সংযোজন বা সংগ্রহ (৩) রক্ষা। যাহারা উৎপাদন করে তাহারা কৃষিধর্ম্মী ; (২) যাহারা সংযোজন বা সংগ্রহ করে তাহারা শিল্প বা বাণিজ্য ধর্ম্মী ; এবং যাহারা রক্ষা করে তাহারা যুদ্ধধর্ম্মী। ইহাদিগের নামান্তর ব্যুৎক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, একথা পাঠক স্বীকার করিতে পারেন কি ?

স্বীকার করিবার প্রতি একটা আপত্তি আছে। হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে এবং এই গীতার ব্যবস্থানুসারে কৃষি শূদ্রের ধর্ম্ম নহে ; বাণিজ্য এবং কৃষি উভয়ই বৈশ্যের ধর্ম্ম। অন্য তিন বর্ণের পরিচর্য্যাই শূদ্রের ধর্ম্ম। এখনকার দিনে দেখিতে পাই কৃষি প্রধানতঃ শূদ্রেরই ধর্ম্ম। কিন্তু অন্য তিন বর্ণের পরিচর্য্যাও এখনকার দিনে প্রধানতঃ শূদ্রেরই ধর্ম্ম। যখন জ্ঞানধর্ম্মী, যুদ্ধধর্ম্মী, বাণিজ্যধর্ম্মী, বা কৃষিধর্ম্মীর কর্ম্মের এত বাহুল্য হয়, যে তদ্ধর্ম্মিগণ আপনাদিগের দৈহিকাদি প্রয়োজনীয় সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারেনা, তখন কতকগুলি লোক তাহাদিগের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হয়। অতএব

* আমি ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপকেও সমাজের অপরিণতাবস্থা বলিতেছি।

(১) জ্ঞানার্জ্জন বা লোক শিক্ষা (২) যুদ্ধ বা সমাজরক্ষা, (৩) শিল্প বা বাণিজ্য (৪) উৎপাদন বা কৃষি, (৫) পরিচর্য্যা, এই পঞ্চবিধ কর্ম্ম।

ইহার অনুরূপ পাঁচটি জাতি, রূপান্তরে, সকল সমাজেই আছে। তবে অন্য সমাজের সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রভেদ এই, যে এখানে ধর্ম্ম পুরুষপরম্পরাগত। কেবল হিন্দু সমাজেই যে এরূপ তাহা নহে, হিন্দুসমাজসংলগ্ন মুসলমানদিগের মধ্যেও এইরূপ ঘটিয়াছে। দরজিরা পুরুষানুক্রমে সিলাই করে, জোলারা পুরুষানুক্রমে বস্ত্র বুনে, কলুরা পুরুষানুক্রমে তৈল বিক্রয় করে। ব্যবসা এইরূপ পুরুষপরম্পরানিবদ্ধ হইলে একটা দোষ ঘটে এই, যে যখন কোন জাতির সংখ্যা বৃদ্ধি হইল, তখন নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায় কুলান হয় না, কর্ম্মান্তর অবলম্বন না করিলে জীবিকানির্ব্বাহ হয় না। প্রাচীনকালের অপেক্ষা এ কালে শূদ্রজাতির সংখ্যা বিশেষ প্রকারে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে*। এজন্য শূদ্র এখন কেবল পরিচর্য্যা ছাড়িয়া কৃষিধর্ম্মী। পক্ষান্তরে পূর্ব্বকালে আর্য্যসমাজস্থ অধিকাংশ লোক এইরূপ সামাজিক কারণে শিল্প, বাণিজ্য, বা কৃষিধর্ম্মী ছিল। এবং তাহাদিগেরই নাম বৈশ্য।

সে যাই হৌক, মনুষ্য মাত্রে, জ্ঞান বা কর্ম্মানুসারে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বণিক, শিল্পী, কৃষক, বা পরিচারকধর্ম্মী। সামাজিক অবস্থার গতি দেখিয়া যদি বল, যে মনুষ্য মাত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র, তাহাতেও কোন আপত্তি হইতে পারে না। স্থূল কথা, এই যে এই ষড়্‌বিধ বা পঞ্চবিধ বা চতুর্ব্বিধ কর্ম্ম ভিন্ন মনুষ্যের কর্ম্মান্তর নাই। যদি থাকে, তাহা কুকর্ম্ম।† এই ষড়্‌বিধ কর্ম্মের মধ্যে যিনি যাহা গ্রহণ করেন, উপজীবিকার জন্যই হউক, আর যে কারণেই হউক, যাহার ভার আপনার উপর গ্রহণ করেন, তাহাই তাঁহার অনুষ্ঠেয়

---

* কেবল কাল সহকারে প্রজাবৃদ্ধির কথা বলিতেছি না। "বাঙ্গালির উৎপত্তি" বিষয়ে বঙ্গদর্শনে যে কয়টি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহাতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছি, যে অনার্য্য জাতিবিশেষসকল হিন্দু ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু শূদ্র জাতি বিশেষে পরিণত হইয়াছে। যথা, পুণ্ড্র নামক প্রাচীন অনার্য্য জাতি বিশেষ এখন কোন স্থানে পুঁড়া কোন স্থানে পোদে পরিণত হইয়াছে। এইরূপে কালক্রমে শূদ্রের সংখ্যা বাড়িয়াছে। বর্ণ সঙ্কর শূদ্রবৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

† যথা চৌর্য্যাদি।

কর্ম্ম, তাঁহার Duty. তাহাই তাঁহার স্বধর্ম্ম। ইহাই আমার বুদ্ধিতে গীতোক্ত স্বধর্ম্মের উদার ব্যাখ্যা। যাঁহারা ইহার কেবল প্রাচীন হিন্দুসমাজের উপযোগী অর্থ নির্দ্দেশ করেন, তাঁহারা ভগবদুক্তিকে অতি সঙ্কীর্ণার্থক বিবেচনা করেন। ভগবান্ কথনই সঙ্কীর্ণবুদ্ধি নহেন।

যাহা ভগবদুক্তি,—গীতাই হৌক, Bibleই হৌক, স্বয়ং অবতীর্ণ ভগবানের স্বমুখনির্গতই হউক, বা তাঁহার অনুগৃহীত মনুষ্যের মুখনির্গতই হউক, যখন উহা প্রচারিত হয়, উহা তখনকার ভাষায় ব্যক্ত হইয়া থাকে। এবং তখনকার সমাজের এবং লোকের শিক্ষা ও সংস্কারের অবস্থার অনুমত যে অর্থ, তাহাই তৎকালে গৃহীত হয়। কিন্তু সমাজের অবস্থা, এবং লোকের শিক্ষা ও সংস্কারসকল কালক্রমে পরিবর্ত্তিত হয়। তখন ভগবদুক্তির ব্যাখ্যার ও সম্প্রসারন আবশ্যক হয়। কেন না, ধর্ম্ম নিত্য, এবং সমাজের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধও নিত্য। ঈশ্বরোক্ত ধর্ম্ম যে কেবল একটি বিশেষ সমাজ বা বিশেষ সামাজিক অবস্থার পক্ষেই ধর্ম্ম, সমাজের অবস্থান্তরে তাহা আর খাটিবে না, এজন্য সমাজকে পূর্ব্বাবস্থাতে রাখিতে হইবে, ইহা কখন ঈশ্বরাভিপ্রায়সঙ্গত হইতে পারে না। কালক্রমে সামাজিক পরিবর্ত্তনানুসারে ঈশ্বরোক্তির সামাজিক জ্ঞানোপযোগিনী ব্যাখ্যা প্রয়োজনীয়। কৃষ্ণোক্ত স্বধর্ম্মের অর্থের ভিতর বর্ণাশ্রমধর্ম্মও আছে; আমি যাহা বুঝাইলাম তাহাও আছে, কেননা উহা বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সম্প্রসারণ মাত্র। তবে প্রাচীনকালে বর্ণাশ্রম বুঝিলেই ঈশ্বরোক্তির কালোচিত ব্যাখ্যা করা হয়; আমি যেরূপ বুঝাইলাম, এখন সেইরূপ বুঝিলেই কালোচিত ব্যাখ্যা করা হয়।

স্বধর্ম্ম কি, তাহা যদি, যা হৌক এক রকম, আমরা বুঝিয়া থাকি, তবে এক্ষণে স্বধর্ম্ম পালন কেন করিব তাহা বুঝিতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ দুই প্রকার বিচার অবলম্বন পূর্ব্বক এ তত্ত্ব অর্জ্জুনকে বুঝাইতেছেন। একটি জ্ঞান মার্গ, আর একটি কর্ম্ম মার্গ। এই অধ্যায়ে দ্বাদশ শ্লোক হইতে আটত্রিশ শ্লোক পর্য্যন্ত জ্ঞান মার্গ কীর্ত্তন, তৎপরে কর্ম্ম মার্গ।

জ্ঞানমার্গের মূল তত্ত্ব আত্মা অবিনশ্বর। পর শ্লোকে সেই কথা উঠিতেছে।

নিষ্কাম কর্ম্ম।

"এখন এসো প্রফুল্ল! একবার লোকালয়ে দাঁড়াও—আমরা তোমায় দেখি। একবার এই সমাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বল দেখি 'আমি নূতন নহি, আমি পুরাতন। আমি সেই বাক্য মাত্র, কতবার আসিয়াছি, তোমরা আমায় ভুলিয়া গিয়াছ তাই আবার আসিলাম

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশয় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।'"

গ্রন্থকার এই কটি কথা বলিয়া তাঁহার দেবীচৌধুরাণী গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন। এই দেবীচৌধুরাণী গ্রন্থ বাহির হইবার পর হইতেই একটি বাক্য আমাদের সমাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। কথাটি পুরাতন—সেই একটি কথার ভিতরে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব নিহিত রহিয়াছে—সেই একটি কথার ভিতরে সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, শাস্ত্র সমুদায় লুক্কায়িত রহিয়াছে,—ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতাগণের মধ্যে যে বিবাদ বিসম্বাদ, সমুদায় সেই একটি কথার আশ্রয়ে বিলুপ্ত হইয়া যায়, মৃত সঞ্জীবনী রস যদি কোথাও থাকে. তবে তাহা সেই কথাটির ভিতর আছে। কথাটি—নিষ্কাম কর্ম্ম।

এক একটি কথা কে জানে কেমন সময় বুঝিয়া, সমাজের সমক্ষে আসিয়া দাঁড়াইয়া, কত কি কার্য্য সমাধা করিয়া, আবার চলিয়া যায়। এক Liberty, Fraternity, Equality তিনটি কথা ফ্রান্সে কি কাণ্ড না করিয়াছে। এই সব দেখিয়া আমি ইহা বুঝি যে, এক একটি বাক্যই এক একটি দেবতা। হিন্দুরা বলেন বেদের বাক্‌শক্তিই দৈবশক্তি, এবং সেই দৈবশক্তি হইতেই জগৎ চলিতেছে; প্লেটোও ঐরূপ কথা বলিয়া গিয়াছেন। প্লেটো বলেন যে "Ideas rule this world"। মনুষ্যসমাজচক্র আলোচনা করিয়া দেখিলে ইহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, এক এক সময়ে এক একটি বাক্যই যেন সমাজের রাজা স্বরূপ হইয়া আধিপত্য করিতে থাকে। তাই বলিতেছিলাম যে এক একটি বাক্যই এক একটি দেবতা। আজকাল যে

বাক্যটি আমাদের সমাজের সমক্ষে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা হইতে কালে যে কত অমৃতময় ফল ফলিবে তাহা এখন কে বলিতে পারে? কিম্বা এমনও হইতে পারে যে, কথাটি সম্যক্ আদর না পাইয়া হয় ত অল্পদিন মধ্যেই সমাজ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। এক একটি কথা এক একটি বীজ স্বরূপ। সম্যক্ জল সেচন না করিলে বীজ প্রায়ই শুকাইয়া যায়; চিন্তা-স্রোতের জলে বাক্য-বীজ অঙ্কুরিত হয়, তাই বলি যে যখন সুন্দর, শুভফল-প্রদ বাক্য তোমাদের সাক্ষাতে দেখা দিবে, তখন তাহাকে হৃদয়ে করিয়া, মনের মধ্যে স্থান দিয়া, তাহার সম্যক্ উপাসনা করিও। সকলে মিলিয়া একটি কথা লইয়া সদাই মনোমধ্যে বিচার করিতে থাক, তবেই দেখিবে যে, অল্পদিন মধ্যেই সেই কথা কতদূর প্রভাবশালী হইয়া উঠিবে। ভয়ানক ঝড়ের পর আকাশ যে শান্তভাব ধারণ করে, পতিব্রতা রমণীর মুখের যে মাধুর্য্যময় ভাব, মদন ভস্ম করিতে উদ্যত মহাদেবের যে রৌদ্র ভাব, যে বিশ্বব্যাপী করুণ ভাবের বশে বুদ্ধদেব সন্ন্যাসী হইয়া জগৎ মাতাইয়া গিয়াছেন, সেই সকল ভাব গুলি একত্রিত হইয়া এই "নিষ্কামকর্ম্ম" কথাটির ভিতর রহিয়াছে দেখিতে পাই। এমন সুন্দর কথাটি যখন আমাদের সমক্ষে আসিয়াছে, তখন এস আমরা সকলে মিলিয়া এই কথার উপাসনা করি। এই "নিষ্কাম কর্ম্ম" কথাটির অর্থভাবনা, এবং সেই ভাবনানুযায়ী কর্ম্ম দ্বারা নিজের জীবন পরিচালিত করাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব; সুতরাং ইহারই নাম ঈশ্বরোপাসনা।

যখন কোন একটি বড় প্রয়োজনীয় কথা মনে আসিয়াও আসিতেছে না, তখন মনের ভিতর কি একটা যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। তাহার পর কিছুক্ষণ বাদে হয় ত কথাটির গোড়ার অক্ষরটি মনে আসিলে আবার সেই অক্ষরটি অবলম্বন করিয়া ভাবিতে ভাবিতে হারান কথাটি পুনরায় মনে ফিরিয়া আসিতে পারে। আমাদের হিন্দুসমাজ কি একটি বড় প্রয়োজনীয় সত্য মনে আনিয়াও মনে আনিতে পারিতেছে না। কি কতকগুলি পুরাতন কথার উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া দৃঢ়বদ্ধ সমাজ গঠিত হইয়াছিল সেই গুলি সমাজ ভুলিয়া গিয়াছে। আজ কাল জ্ঞানের চর্চ্চা আরম্ভ হওয়ায় সেই কথা গুলি মনে আনিবার ইচ্ছা হইতেছে, কিন্তু মনে আসিতেছে না—সমাজের

বড়ই যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছে। সমাজের ভিতর কেবল দলাদলি বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে। এমন সময় এই যে "নিষ্কাম কর্ম্ম" কথাটি আমাদের সমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, এইটি সেই সমস্ত হারান বাক্যের আদ্য অক্ষর স্বরূপ। এই গোড়ার কথাটি কেহ মন হইতে ছাড়িয়া দিও না, এই গোড়ার কথাটি অবলম্বনে পুরাতন কথা গুলি স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতে থাক, তাহা হইলেই যাহাদের ভুলিয়াছি তাহারা ক্রমে ক্রমে দেখা দিবে, ভারতের পূর্ব্বগৌরব আবার ফিরিয়া আসিবে।

আজি 'দেবী-চৌধুরাণী" অবলম্বন করিয়া নিষ্কাম কর্ম্ম সম্বন্ধে গুটিকত বলিতে চাহি। নিষ্কাম ধর্ম্ম কাহাকে বলে তাহারই কথঞ্চিৎ আভাস দেওয়া এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। কিরূপ ক্ষেত্রে নিষ্কাম ধর্ম্মের বীজ ফলপ্রদ হয় তাহাই এই প্রথম পরিচ্ছেদে বুঝান আছে।

প্রফুল্ল ও প্রফুল্লের মার কথোপকথন লইয়া গ্রন্থের আরম্ভ। ইহারা কাঙ্গালিনী। মা মেয়েকে ঘোষেদের বাড়ী থেকে একটা বেগুন চেয়ে আনিতে বলিল।

প্রফুল্লমুখী বলিল,—"আমি পারিব না, আমার চাইতে লজ্জা করে।"

মা। তবে খাবি কি? আজ যে ঘরে কিছু নাই।

প্র। তা শুধু ভাত খাব। রোজ রোজ চেয়ে খাব কেন গা?

কিন্তু শুধু ভাতও জোটে না—ঘরে চাল নাই। কাজেই মা ধার করিতে চলিল। কন্যা বলিল "আমরা কত লোকের চাল ধারি, শোধ দিতে পারি না আর ধার করিও না। আজ মায়ে ঝিয়ে পৈতা তুলি, কাল বিক্রয় করিয়া চাল কিনিব।" কিন্তু পৈতার পাঁজটী পর্য্যন্ত গৃহে নাই—তখন প্রফুল্লমুখী অধোবদনে রোদন করিতে লাগিল। মা আবার ধুচুনি লইয়া চাল ধার করিতে যায় দেখিয়া প্রফুল্ল বলিল—"মা আমি কেন ধার করে খাব? আমার ত সব আছে। আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে শ্বশুরের অন্ন খাইতে পাই না? শোন মা, আমি আজ'মন ঠিক করিয়াছি—শ্বশুরের অন্ন কপালে জোটে তবে খাইব, নহিলে আর খাইব না। যাহাদের উপর আমার ভরণপোষণের ভার তাহাদের কাছে অন্নের ভিক্ষা করিতে আমার অপমান নাই। আপনার ধন আপনি চাহিয়া খাইব তাহাতে লজ্জা কি?"

এই প্রথম পরিচ্ছেদ হইতে আমরা কি শিখিলাম ?

যদি মরিতে হয় সেও স্বীকার, তথাপি যে ধার শোধ দিতে পারিব না সে ধার করিতে মনে যাঁহার সদাই সঙ্কোচ উপস্থিত হয়, তাঁহার চিত্ত নিষ্কাম-ধর্ম্মবীজ বপনের উপযুক্ত ক্ষেত্র। একদিন দু মুঠা চাল ধার করিয়া সেই ধার শোধ দিতে না পারিলে যে কেহ একেবারে ধর্ম্মে পতিত হয়, এ কথা যদিও ঠিক নহে ; কিন্তু যে জনের চিত্তের গঠন এরূপ সুন্দর, যে তিনি কোন সামান্য বিষয়েও ঋণী থাকিতে ইচ্ছা করেন না, নিষ্কাম ধর্ম্ম তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। ঋণ পরিশোধ করিবার জন্যই এ জীবন ধারণ করিয়াছি, নূতন কোন ঋণে আবদ্ধ হইতে যেন না হয়, এইরূপ মনে করিয়া কার্য্য করিতে শিখাই নিষ্কাম কর্ম্মের প্রথম আরম্ভ। অপ্রতিগ্রহ নিষ্কাম ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ।

২য়। প্রফুল্লের লজ্জা। পাড়া পড়সীর নিকট হইতে একটা বেগুন চাইতে প্রফুল্লের লজ্জা করে। কিন্তু যে শ্বশুর বাড়ীতে কখনও তাহার নাম করে না সেইখানে উপযাচিকা হইয়া যাইতে প্রফুল্লের লজ্জা নাই। ইহার কারণ যাহাদের উপর ধর্ম্মতঃ তাহার ভরণ-পোষণের ভার তাহাদের কাছে অন্ন ভিক্ষা করিতে প্রফুল্লমুখী লজ্জিতা নহেন।

লজ্জা দুই প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়। এক প্রকার লজ্জা ধর্ম্মচর্চ্চার অনুকূল এবং অন্য প্রকার লজ্জা ধর্ম্মচর্চ্চার প্রতিকূল। আমি এ কাজটা কেমন করিয়া করিব, পাঁচজনে আমার নিন্দা করিবে এবং সেই ভয়ে কোন কাজ করিতে যে সঙ্কোচ হয় তাহা একপ্রকারের লজ্জা এবং যে কাজ আমার নিজের মনে অধর্ম্ম বলিয়া বুঝি তাহা করিতে যে সঙ্কোচ, তাহা অন্য প্রকা-রের লজ্জা। যাঁহাদের লজ্জা কেবল লোক নিন্দার উপর নির্ভর করে তাঁহারা গোপনে অধর্ম্মাচরণ করিতে কুণ্ঠিত নহেন, কিম্বা সমাজে যে সকল অধর্ম্ম প্রশ্রয় পাইয়াছে সেই সমস্ত অধর্ম্মাচরণে তাঁহাদের লজ্জা হয় না। কিন্তু উন্নতচেতাদের লজ্জা অন্যরূপ। যাহাতে চিত্তের সঙ্কীর্ণতা জন্মিতে পারে, এইরূপ ভাব মনে আসিলেই তাঁহাদের চিত্ত আপনা আপনি কেমন সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে এবং সেই বিষয়ে কেমন লজ্জা উপস্থিত হয়। এইরূপ লজ্জাই ধর্ম্মের সহায়। প্রফুল্ল গরিব কাঙ্গাল একটা বেগুন চাইতে গেলে পাঁচজনে

তাহাকে লজ্জা দিবে না বটে, কিন্তু ঐ ভিক্ষা করিবার নামেই তাহার প্রশস্ত মনে কেমন লজ্জা উপস্থিত হইল। "দারিদ্র্যদোষোহি গুণরাশিনাশী" এই একটি কথা প্রচলিত আছে; কথাটি অধিকাংশ স্থলেই সত্য, কিন্তু প্রফুল্লের দারিদ্র্য তাহার মানসিক তেজ নষ্ট করিতে সমর্থ হয় নাই; প্রফুল্ল পৈতা তুলিয়া খাইবে, তবু ভিক্ষা করিতে রাজি নহে। যিনি নিষ্কাম ধর্ম্ম অভ্যাস করিতে চান, তাঁহার চিত্তকে প্রথমে এইরূপ গড়িয়া লইতে হইবে যেন গুণরাশিনাশী দারিদ্র্যদশা উপস্থিত হইলেও তাঁহার চিত্তের প্রশস্ততা না কমে।

প্রফুল্লের লজ্জার কথা বলিতেছিলাম। প্রফুল্ল যখন উপযাচিকা হইয়া শ্বশুর বাড়ী যাইবে, তখন তাহারা কত কি কথা কহিবে, পাঁচ জনে কত নিন্দা করিবে, তাহাকে কত লোকে বেহায়া বলিবে, এ সব কথা মনে আসিলে প্রফুল্লের উন্নত চিত্তের কোন সংকোচ জন্মাইতে পারে নাই; কেন না, ধর্ম্মতঃ তাঁহার যাহাতে অধিকার আছে, তাহা পাইবার চেষ্টা করায় তাঁহার চিত্তে কোনরূপ সঙ্কীর্ণতা জন্মিতে পারে না, ইহা তাঁহার অন্তরের দেবতা তাঁহার মনকে বুঝাইয়াছিল।

নিষ্কাম ধর্ম্ম শিখিতে গেলে প্রথমতঃ অন্যায় লোকলজ্জা ত্যাগ করিতে শিখিতে হইবে। সামান্য লোকলজ্জা ভয়ে ধর্ম্মকর্ম্মে যেন কুণ্ঠিত হইতে না হয়। মান অপমান বোধটি দুরস্ত করিয়া লইতে হইবে। পাঁচজনের কাছে ছোট হইয়া দাঁড়াইতে হইলে আমাদের অপমান বোধ হয়—কিন্তু উন্নত-চেতা কেবল নিজের অন্তরের সাক্ষী দেবতার নিকট সঙ্কীর্ণ মন লইয়া দাঁড়াইতে লজ্জা ও অপমান বোধ করেন।

৩য়। শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় বলিয়া গিয়াছেন

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।"

এই স্বধর্ম্ম প্রতিপালনই নিষ্কাম ধর্ম্মের সার কথা।

এই ধর্ম্মপ্রতিপালন কথাটি চিত্রিত করাই দেবীচৌধুরাণীগ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং এই প্রথম পরিচ্ছেদেই আমরা দেখিতে পাই যে, এই গ্রন্থের নায়িকা অশিক্ষিতা অবস্থাতেও স্বতঃই স্বধর্ম্ম প্রতিপালনে তৎপরা। বিবাহিতা স্ত্রীর ভরণপোষণের ভার স্বামীর উপর। স্বামীর অন্নে স্ত্রী সেই দেহ পোষণ

করিয়া স্বামী সেবায় সেই দেহ পাত করিবে, ইহাই বিবাহিতা স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম। আপনা হইতেই প্রফুল্লর মনে এই কথা উদয় হইয়াছে যে, আপনার ধন আপনি চাহিয়া খাইতে লজ্জা করা অকর্ত্তব্য।

ভিক্ষা করিও না, যে ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে না সেরূপ ঋণে বদ্ধ হইও না, এবং আপনাব ধন যদি পরের নিকট থাকে তবে সেই ধন চাহিয়া লইয়া ভোগ করিতে লজ্জিত হইও না—নিষ্কাম কর্ম্ম যিনি অভ্যাস করিতে চান তাঁহাকে এই কয়টি কথানুসারে কার্য্য করিতে প্রথম শিখিতে হইবে। এই কয়টি কথার ভিতরেই নিষ্কাম ধর্ম্মের সমস্ত রহস্য লুক্কায়িত রহিয়াছে। নিজের ধন অর্থাৎ নিজের কর্ম্মফল ভোগ করিতে কখনও সঙ্কুচিত হইও না, কেন না কর্ম্মফল ভোগ করিয়া কর্ম্ম ক্ষয় করাই নিষ্কামধর্ম্মের উদ্দেশ্য। পবের ধন অর্থাৎ পরের কর্ম্মের ফল উপভোগ করিতে যেন কখনও প্রবৃত্তি না হয়, কেন না তাহা হইলে তোমাকে নূতন ঋণে বদ্ধ হইতে হইবে এবং যত দিন সেই ঋণ-মুক্ত না হও তত দিন তোমার মুক্তি হইবে না।

এই সংসারটা একটা ভারি বাজার। আমরা সকলেই এক এক জন ব্যাপারী। পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে দেনা পাওনার ব্যাপারে জড়াইয়া রহিয়াছি। এ বাজারে ব্যবসা ক'রে লাভটা যে কি তাত কিছুই খুঁজে পেলাম না, তাই এক এক দিন দোকান পাঠ বন্ধ ক'রে পালাবার মতলব হয়। কিন্তু পালাবার যো নাই। দেনা পাওনা না চুকাইয়া যাইবার যো নাই। যিনি এই সংসারের বাজারের দেনা পাওনার খাতা পত্র লইয়া হিসাব রোকসোদ করিবার মতলব করিয়াছেন, তাঁহার ধর্ম্মকেই নিষ্কাম ধর্ম্ম বলা যায়। বাজার দেনার জ্বালায় এক এক সময় বড়ই অস্থির হইতে হয়; তোমরা কেউ বাজার দেনা রাখিও না। যেখানে একটু ময়লা একদিন জমে তাহা যদি তখনই পরিষ্কার না কর, তবে পরদিন আর একটু ময়লা জমিবে। বাজার দেনাও সেই রকম। সেই জন্য আমি এক পরামর্শ বলি তোমরা শুন, যখন কিছু খরিদ করিতে হইবে তখন উহা নগদমূল্যে খরিদ করিয়া আনিয়া খরচ করিও। এক এক জনের এমনি স্বভাব আছে যে তাঁহারা ধারে হাতি কিনিতে পারেন—এরূপ লোক

শেষ দশায় বড়ই কষ্ট পান। যিনি নগদ মূল্যে খরিদ করিয়া খরচ করেন তাঁহাকে দেনা পাওনার হিসাবের গোলমালে পড়িতে হইবে না। কর্ম্মের খাতায় যা লেখা আছে তাহা আবার এমনি মুহুরীর লেখা, যে বোঝে কার সাধ্য। এই লেখা পড়িতে শিখার নাম জ্ঞানচর্চ্চা। এসব কথা সময়ান্তরে তুলিব।

এই বারে দেবীচৌধুরাণীর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রফুল্লমুখীর কি গুণের পরিচয় আছে তাহা দেখা যাউক। প্রফুল্লমুখী মাকে সঙ্গে লইয়া শ্বশুর বাড়ীতে পহুঁছিল। প্রফুল্লের মার এক মিথ্যা অপবাদ প্রচার হওয়া অবধি প্রফুল্লর শ্বশুর তাহাদের সহিত অনেক দিন হইতে সম্পর্ক উঠাইয়া দিয়াছিলেন। এক্ষণে প্রফুল্ল তাঁহার মাকে সঙ্গে লইয়া উপযাচিকা হইয়া শ্বশুরবাড়ীতে আসিয়াছে দেখিয়া গৃহিণী বড়ই অসন্তুষ্ট হইলেন। গৃহিণীর সহিত দু চারি কথা হওয়ার পরই মা বাড়ী হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। প্রফুল্ল গেল না, যেমন ঘোমটা দেওয়া ছিল তেমনই ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শাশুড়ী বলিল "তোমার মা গেল তুমিও যাও। নড় না যে? কি জ্বালা আবার কি তোমার সঙ্গে লোক দিতে হবে না কি?"

নিরভিমানিনী প্রফুল্লমুখী এখন মুখের ঘোমটা খুলিল, চাঁদপানা মুখ, চক্ষে দর দর ধারা বহিতেছে। শাশুড়ী মনে মনে ভাবিলেন, "আহা! এমন চাঁদপানা বৌ নিয়ে ঘর করিতে পেলেম না।" মন একটু নরম হইল।

প্রফুল্ল অতি অস্ফুটস্বরে বলিল "আমি যাইব বলিয়া আসি নাই"।

গিন্নি। তা কি করিব মা—আমার কি অসাধ যে তোমায় নিয়ে ঘর করি? লোকে পাঁচ কথা বলে—একঘরে করবে বলে, কাজেই তোমায় ত্যাগ করতে হয়েছে।

প্রফুল্ল। মা একঘরে হবার ভয়ে কোথায় সন্তান ত্যাগ করেছে? আমি কি তোমার সন্তান নই?

শাশুড়ীর মন আরও নরম হইল। বলিলেন, "কি জান মা, জেতের ভয়।"

প্রফুল্ল পূর্ব্ববৎ অস্ফুটস্বরে বলিল "হলেম যেন আমি অজাতি—কত

সুর তোমার ঘরে দাসীপনা করিতেছে—আমি তোমার ঘরে দাসীপনা করিতে দোষ কি?"

গিন্নি আর যুঝিতে পারিলেন না। বলিলেন "তা মেয়েটি লক্ষ্মী, রূপেও বটে, কথায়ও বটে। তা যাই দেখি কর্ত্তার কাছে তিনি কি বলেন। তুমি এখানে বসো মা বসো।" প্রফুল্ল তখন চাপিয়া বসিল।

এই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আমরা ইহা দেখিতে পাই যে, যে ব্যক্তি দারুণ কঠোর ভাব ধারণ করিয়া প্রফুল্লকে বাড়ী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার জন্য ব্যস্ত, তিনি প্রফুল্লের দুটি গুণে একেবারে নরম হইয়া তাহার পক্ষ অবলম্বন করিলেন। গুণ দুটি এই—প্রফুল্লর মুখশ্রী বড় সুন্দর এবং কথা বড় মিষ্ট। যদি কেহ তোমরা নিষ্কাম ধর্ম্মব্রতাবলম্বী হইয়া সমাজে আদর্শ স্বরূপ দাঁড়াইতে অভিলাষ করিয়া থাক, তবে প্রফুল্লের ন্যায় মুখশ্রী সুন্দর করিতে শিখ এবং মিষ্ট কথায় (তা বলিয়া যেন কথা মিথ্যা না হয়) লোককে তোমার পক্ষাবলম্বী করিতে শিখ। মুখের শ্রীর এবং মুখের কথার সৌন্দর্য্যরজ্জুতে সমাজকে বাঁধিয়া ধর্ম্মের দিকে টানিতে শিখিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধদেব, যীশু, চৈতন্য সকলেই মুখশ্রী এবং বাক্যের মধুরভাব মোহিনীশক্তির সহিত ধর্ম্মের পবিত্রতা মিশাইয়া জগৎ মাতাইয়া গিয়াছেন।

মুখশ্রী সুন্দর করিতে শিখ—এই কথা বলায় অনেকে হয়ত বলিবেন যে, ওটা কি নিজের হাত, যে নিজের চেষ্টায় মানুষ মুখের শ্রী সুন্দর করিতে পারিবে? যে যেমন মুখ লইয়া জন্মিয়াছে সে মুখ কি সে বদল করিতে পারিবে? আমি এইরূপ কথার উত্তরে এই কথা বলিতে চাই যে আমার যা কিছু সবই আমার কর্ম্মের ফল, আমাতে যা কিছু কুৎসিৎ তাহাকে সুন্দর করিয়া আনা ও আমার চেষ্টার উপর নির্ভর করে। আমি যদি এ জন্মে কুৎসিৎ মুখ লইয়া জন্মিয়া থাকি তাহা আমার পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মের ফল, এ জন্মে আবার উপযুক্ত কর্ম্ম ও অভ্যাস দ্বারা পরজন্মে সুন্দর মুখ লইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ হইব। যিনি পরজন্ম পূর্ব্বজন্ম মানিতে চান না তাঁহাকে এই কথা বলিতে পারি যে যাহাকে মুখশ্রী বলা যায় এই জন্মেই তাহার পরিবর্ত্তন করা মনুষ্যের নিজের আয়ত্তাধীন। একই মুখের শ্রী ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখিয়াছ কি? হাসিভরা আশা মাখা যে মুখের শ্রী

একদিন বড় সুন্দর দেখিয়াছি সেই মুখে যখন অসন্তোষব্যঞ্জক ভাব প্রকাশ পায় এবং মুখ হাসি শূন্য হইয়া গোম্‌ড়া পানা হইয়া থাকে তখন সেই মুখই আবার কুৎসিৎ বলিয়া বোধ হয়। মনের ভাব যে আকারে মুখে প্রকাশ পায় তাহাকে মুখের শ্রী বলিতে পারা যায়। ক্রমাগত সুন্দর ভাব মনোমধ্যে আনিতে অভ্যাস করিতে করিতে মুখের শ্রীও ক্রমে ক্রমে সুন্দর হইতে থাকে। মনে আনন্দ ভাব উদয় হইলে মুখ যেন হাসি হাসি হয়। কিন্তু অসন্তোষ ভাব মনে আসিলে মুখের ভাব অন্য রূপ হইয়া যায়। আনন্দ ভাবের উদয়ের সঙ্গে মুখের পেশী সকলে এক প্রকার টান পড়ে। কিন্তু অসন্তোষ ভাবের উদয়ে মাংস পেশী সকলে অন্যরূপ টান পড়ে, পেশী গুলি যেন ভ্রূর গোড়ায় কুঁচকায় এবং ঠোঁট দুখানিকে যেন একটু বেশী চাপিয়া দেয়। এখন দেখ যিনি ক্রমাগত চিত্তে আনন্দ, আশা, সন্তোষ এই সকল সুন্দর ভাব আনিতে চেষ্টা করেন তাঁহার মুখের মাংসপেশী সকল ক্রমাগত সুন্দর ভাবে টান পাইতে থাকে, এবং সুন্দর ভাবব্যঞ্জক মুখের শ্রীটুকু মুখ মণ্ডলে স্থায়ী হইয়া দাঁড়ায়। মনের অসন্তোষে আবার কত সুন্দর মুখ শ্রীভ্রষ্ট হইয়া যায় ইহা অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন; সুন্দর মুখ যখন শ্রীভ্রষ্ট হইতে পারে তখন যাহা সুন্দর নয় তাহা ও চেষ্টা ও অভ্যাসে সুন্দর হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি?

মনে সুন্দর ভাব উদিত করিয়া সেই ভাব বাহিরে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিবে এবং এই অভ্যাস দ্বারা মুখশ্রী সুন্দর হইবে। নিষ্কাম ধর্ম্ম শিখিতে গেলে ভিতর ও বাহির দুই সুন্দর করিতে হইবে। এই খানে একটি কথা বলিয়া রাখি—মুখে পাউডার মাখিলে মুখশ্রী সুন্দর হয় না।

এইবারে মিষ্ট কথা সম্বন্ধে গুটিকত কথা বলিব। যযাতি পুরুকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া যে উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন তাহার ভিতর এই কটি কথা আছে

"যে কথায় অন্যে উদ্বিগ্ন হয় এমত কথা উচ্চারণ করা অনুচিত। যে ব্যক্তি লোকের মর্ম্মপীড়ক, পরুষ-ভাষী ও বাক্যরূপ কণ্টক দ্বারা অন্যের হৃদয় বিদ্ধ করে, তাহাকে অলক্ষীক বলে! তাহার মুখে অলক্ষীর চিহ্ন সকল সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। অসন্তেরা আপন মুখ হইতে নির্গত বাক্য রূপ স্বায়ক

দ্বারা অন্যকে আহত করে। আহত ব্যক্তি ঐ সুতীক্ষ্ণ শরাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া অহর্নিশ যন্ত্রণা ভোগ করে। অতএব পণ্ডিতেরা তাহা কস্মিন কালেও অন্যের উপর নিক্ষেপ করেন না। জীবের প্রতি দয়া, মৈত্রী, দান, ও মধুর বাক্য প্রয়োজন, ইহা অপেক্ষা ধর্ম্ম আর লক্ষ্য হয় না। অতএব সর্ব্বদা সান্ত্ব-বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কদাচ কঠোর বাক্য উচ্চারণ করিও না।"—মহাভারত কালীসিংহের অনুবাদ।

মিষ্ট কথা উন্নত চিত্তের পরিচায়ক। কিন্তু মিষ্টকথা কহিবার জন্য কেহ যেন মিথ্যাবাদী না হন। মিথ্যার ন্যায় অধর্ম্ম আর নাই।

অন্তরে ভালবাসার ভাব যত বাড়িবে মুখের কথাও সেই অনুযায়ী সুমিষ্ট হইতে থাকিবে। অন্তরের প্রেম, দয়া, এবং মৈত্রী ভাব বাহিরে মিষ্ট কথায় প্রকাশ পায়। যদি অন্তরে ভালবাসা, দয়া, ও মৈত্রীভাব না থাকে তবে কেবল মিষ্ট কথা কহা কপটাচার। প্রফুল্লমুখীর হৃদয় ভালবাসা, দয়া, ও মৈত্রীভাবে পূর্ণ; তাই তিনি মিষ্টভাষী হইয়া মিষ্ট কথায় শাশুড়ীর মন নরম করিতে পারিয়াছিলেন। প্রফুল্লমুখীর প্রফুল্ল অন্তঃকরণে দয়া, মৈত্রী ভাব, ও ভালবাসা যে কত স্রোতবাহী তাহা পরে প্রকাশ পাইয়াছে।

ক্রমশঃ

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

অলস জোছনাময়ী নিথর যামিনী।

১

অলস জোছনাময়ী নিথর যামিনী;
মৃদুল মধুর বায়,
ধীরে নদী ব'হে যায়,
মধু ভরে ঝরে পড়ে বকুল কামিনী।
অলস জোছনাময়ী নিথর যামিনী।—

২

প'ড়ে আছি নদী-কূলে শ্যাম দুর্ব্বাদলে;
—কি যেন মদিরা পানে,
কি যেন প্রেমের গানে,
কি যেন নারীর রূপে ছেয়েছে সকলে!
প'ড়ে আছি নদী-কূলে শ্যাম দুর্ব্বাদলে।

৩

অবশ পরাণ যেন গেছে ভেঙ্গে চূরে!
কতটা যেন কি স্রোতে
ভেসে গেছে ধরা হ'তে!
অবশিষ্ট ল'য়ে আমি ব'সে আছি দূরে!—
অবশ পরাণ যেন গেছে ভেঙ্গে চূরে!

৪

—ধীরে ধীরে আসে স্মৃতি, যেন কার্ কথা!
না জানায়ে আসে যায়,
হাসি অশ্রু নাই তায়!
—দিয়ে মৃদু অনুভব, মৃদু অলসতা,
ধীরে ধীরে আসে স্মৃতি, যেন কার্ কথা!

৫

প'ড়েছি গাথায় কোন, যেন কোন নারী,
এমনি মধুর রাতে,
তরু-তলে, ধীর বাতে,
অঞ্চলে মুছিয়া গেছে নয়নের বারি!
—প'ড়েছি গাথায় কোন্, যেন কোন নারী!

৬

শুকায়ে গিয়াছে কোথা কার্ ফুল-হার!
খেলিতে নদীর কূলে,
কি ফেলিয়া গেছে ভুলে!
—বাঁধিতে পারেনি ফিরে ঘরে মন তার!
শুকায়ে গিয়াছে কোথা কার্ ফুল-হার!

৭

শুনেছি বাঁশীতে কার্ কোথাকার সুরে!
কে নাহি দেখিলে চাই'—
এ জগতে কিছু নাই!
—ভাঙিতে গড়িতে শুধু নিজে ভেঙে-চুরে,
শুনেছি বাঁশীতে কার্ কোথাকার সুরে!

৮

দেখেছি হাসিতে যেন অশ্রুজল কার্!
—দেখা হ'লে নত আঁখি,
ছুটি শ্বাস থাকি থাকি,
আকুল পরাণ-পাখী—ছাড়িতে সংসার!
—দেখেছি হাসিতে যেন অশ্রুজল কার্।

৯

দেখেছি অশ্রুতে যেন কার্ মৃদু হাসি!
—দীপ নিভ-নিভ-প্রায়,
চারিদিকে হায় হায়;
—নিস্পন্দ নয়নে চেয়ে ভাল বাসাবাসি!
দেখেছি অশ্রুতে যেন কার্ মৃদু হাসি।

১০

—সত্য যেন উপকথা, দূর স্বপ্ন-জাল!
জানিতে হয় না সাধ,—
গত দুখে সুখ-স্বাদ!
পরের ঘটনা ল'য়ে কাটে যেন কাল!
সত্য যেন উপকথা, দূর স্বপ্ন-জাল!

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্॥ ১২॥

অনুবাদ।

আমি কদাচিৎ ছিলাম না, এমন নহে। তুমি বা এই রাজগণ ছিলেন না, এমন নহে। ইহার পরে আমরা সকলে যে থাকিব না, এমন নহে। ১২।

টীকা।

যুদ্ধে স্বজন-নিধন সম্ভাবনা দেখিয়া অর্জ্জুন অনুতাপ করিলেন। তাহাতে কৃষ্ণ ইহার পূর্ব্ব শ্লোকে বলিয়াছেন, "যাহার জন্য শোক করিতে নাই, তাহার জন্য তুমি শোক করিতেছ।" যে মরিবে, তাহার জন্য শোক করা উচিত নহে কেন, তাহা এই শ্লোকে বুঝাইতেছেন। ভাবার্থ এই, যে "দেখ, কেহ মরে না। দেখ আমি, তুমি, আর এই রাজগণ অর্থাৎ সকলেই চিরস্থায়ী; পূর্ব্বে ও সকলেই ছিলাম, এ জীবন ধ্বংসের পর সবাই থাকিবে। যদি থাকিবে, মরিবে না, তবে তাহাদের জন্য শোক করিবে কেন?"

ইহাই হিন্দুধর্ম্মের স্থূল কথা—হিন্দু ধর্ম্মান্তর্গত প্রধান তত্ত্ব। কেবল হিন্দু-ধর্ম্মের নহে, খ্রীষ্ট ধর্ম্মের, বৌদ্ধ ধর্ম্মের, ইস্লাম ধর্ম্মের, সকল ধর্ম্মের মধ্যে ইহাই প্রধান তত্ত্ব। সে তত্ত্ব এই যে দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্মা আছে, এবং সেই আত্মা অবিনাশী। শরীরের ধ্বংস হইলেও আত্মা পরকালে বিদ্যমান থাকে। পরকালে আত্মার কি অবস্থা হয়, তদ্বিষয়ে নানা মত ভেদ আছে ও হইতে পারে, কিন্তু দেহাতিরিক্ত অথচ দেহস্থিত আত্মা আছেন, এবং তিনি বিনাশ শূন্য, অমর, ইহা হিন্দু, খ্রীষ্টিয়ান, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম, মুসলমান, প্রভৃতি সকলের সম্মত। এই সকল ধর্ম্মের ইহাই মূলভিত্তি।

এই তত্ত্বের প্রধান প্রতিবাদী বৈজ্ঞানিকেরা। তাঁহারা বলেন, শরীরাতি-রিক্ত আর কিছু নাই। শরীরাতিরিক্ত আর একটা যে আত্মা আছে, তদ্বিষয়ে কোন প্রমান নাই।

আজ কাল বৈজ্ঞানিকেরাই বড় বলবান্। পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্ম এক-দিকে, তাঁহারা আর একদিকে। তাঁহাদের প্রচণ্ড প্রতাপে পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্ম হটিয়া যাইতেছে। অথচ বিজ্ঞানের * অপেক্ষা ধর্ম্ম বড়। পক্ষান্তরে ধর্ম্ম বড় বলিয়া আমরা বিজ্ঞানকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। ধর্ম্ম ও সত্য, বিজ্ঞানও সত্য। অতএব এস্থলে আমাদের বিচার করিয়া দেখা যাউক, কতটুকু সত্য কোন দিকে আছে। বিশেষতঃ শিক্ষিত বাঙ্গালী, বিজ্ঞান জানুন, বা না জানুন, বিজ্ঞানের প্রতি অচলভক্তিবিশিষ্ট। বিজ্ঞানে রেলওয়ে টেলিগ্রাফ হয়, জাহাজ চলে, কল চলে, কাপড় হয়, নানা রকমে টাকা আসে, অতএব বিজ্ঞানই তাঁহাদের কাছে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ। যখন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য এই টীকা লেখা যাইতেছে, তখন আত্মবাদের বিজ্ঞান যে প্রতিবাদ করেন, তাহা বিচার করিয়া দেখা উচিত।

এ বিচারে আগে বুঝা কর্ত্তব্য যে আত্মা কাহাকে বলা যাইতেছে, এবং হিন্দুরা আত্মাকে কি রূপ বুঝে।

হিন্দু দার্শনিকেরা আত্মাকে বলেন, "অহম্প্রত্যয়বিষয়াহম্পদপ্রত্যয় লক্ষিতার্থঃ"—অর্থাৎ "আমি" বলিলে যাহা বুঝিব, সেই আত্মা। সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বে যাহা লিখিয়াছি, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা এই বাক্যের সম্প্রসারণ মাত্র।

"আমি দুঃখ ভোগ করি—কিন্তু আমি কে? বাহ্য-প্রকৃতি ভিন্ন আর কিছু তোমাদের ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে। তুমি বলিতেছ আমি বড় দুঃখ পাইতেছি—আমি বড় সুখী। কিন্তু একটী মনুষ্য দেহ ভিন্ন "তুমি" বলিব এমন কোন সামগ্রী দেখিতে পাই না। তোমার দেহ এবং দৈহিক প্রক্রিয়া ইহাই কেবল আমার জ্ঞানগোচর। তবে কি তোমার দেহেরই এই সুখ দুঃখ ভোগ বলিব?

তোমার মৃত্যু হইলে তোমার সেই দেহ পড়িয়া থাকিবে, কিন্তু তৎকালে তাহার সুখ দুঃখ ভোগের কোন লক্ষণ দেখা যাইবে না। আবার মনে কর

---

* পাঠকের স্মরণ রাখা উচিত যে প্রচলিত প্রথানুসারে Science কেই বিজ্ঞান বলিতেছি ও বলিব।

কেহ তোমাকে অপমান করিয়াছে, তাহাতে দেহের কোন বিকার নাই, তথাপি তুমি দুঃখী। তবে তোমার দেহ দুঃখভোগ করে না। যে দুঃখ-ভোগ করে সে স্বতন্ত্র। সেই তুমি। তোমার দেহ তুমি নহে।

এইরূপ সকল জীবের। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই জগতের কিয়দংশ ইন্দ্রিয়-গোচর, কিয়দংশ অনুমেয় মাত্র, ইন্দ্রিয়-গোচর নহে, এবং সুখ দুঃখাদির ভোগ কর্ত্তা। যে সুখ দুঃখাদির ভোগ কর্ত্তা সেই আত্মা।"

আত্মতত্ত্ব বিষয়ক, এই স্থূল কথাটা খ্রীষ্টীয়াদি সকল ধর্ম্মেই আছে। কিন্তু তাহার উপর আর একটা অতি সূক্ষ্ম. অতি চমৎকার কথা, কেবল হিন্দু ধর্ম্মেই আছে। সেই তত্ত্ব অতি উন্নত, উদার, বিশুদ্ধ, বিশ্বাসমাত্রে মনুষ্য জন্ম সার্থক হয়। হিন্দু ভিন্ন আর কোন জাতিই সেই অতি মহত্তত্ত্ব অনুভূত করিতে পারে নাই। যে সকল কারণে, হিন্দু ধর্ম্ম অন্য সকল ধর্ম্মের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা তাহার মধ্যে একটি অতি গুরুতর কারণ। সেই তত্ত্ব এখন বুঝাইতেছি।

আত্মা সকলেরই আছে। তুমি যখন আমা হইতে ভিন্ন, তখন তোমার আত্মা আমা হইতে কাজেই ভিন্ন। কিন্তু ভিন্ন হইয়াও প্রকৃত রূপে ভিন্ন নহে। মনে কর বহু সংখ্যক শূন্য পাত্র আছে। তাহার সকলগুলির ভিতর আকাশ আছে। এক পাত্রাভ্যন্তরস্থ আকাশ পাত্রান্তরস্থ আকাশ হইতে ভিন্ন। কিন্তু পৃথক্ হইলেও সকল পাত্রস্থ আকাশ জাগতিক আকাশের অংশ। পাত্রগুলি ভগ্ন করিলেই আর কিছুমাত্র পার্থক্য থাকে না। সকল পাত্রস্থ আকাশ সেই জাগতিক আকাশ হইতে অভিন্ন হয়। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন জীবগত আত্মা পরস্পর পৃথক্ হইলেও জাগতিক আত্মার অংশ; দেহ বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইলে সেই জাগতিক আত্মায় বিলীন হয়। এই জগদাত্মাকে হিন্দু-দার্শনিকেরা পরমাত্মা বলেন। জীব দেহস্থায়ী আত্মা যতদিন সেই পরমাত্মায় বিলীন না হয় ততদিন তাহাকে জীবাত্মা বলেন।

এখন এই জীবাত্মা কি নশ্বর? দেহের ধ্বংস হইলেই কি তাহার ধ্বংস হইল? ইহার সহজ উত্তর এই যে, যাহা অবিনশ্বরের অংশ, তাহা কখন

* প্রবন্ধ পুস্তক।

নশ্বর হইতে পারে না। যদি জাগতিক আকাশ অবিনশ্বর হয়, তবে তাহার আকাশও অবিনশ্বর। যদি পরমাত্মা অবিনশ্বর হয়েন, তবে তদংশ জীবাত্মাও অবিনশ্বর।

এই হইল হিন্দু ধর্ম্মের কথা। অন্য কোন ধর্ম্ম এই অত্যুন্নত তত্ত্বের নিকটেও আসিতে পারেন নাই। আমরা পরে দেখাইব যে, ইহার অপেক্ষা উন্নত তত্ত্ব মনুষ্যজ্ঞাত তত্ত্বের ভিতর আর নাই বলিলেও হয়। প্রাচীন ঋষিরা বলিতে পারেন, "আমরা যদি আর কিছু না করিতাম, কেবল এই কথাটা পৃথিবীতে প্রচার করিয়া যাইতাম, তাহা হইলেও আমরা সকল মনুষ্যের উপরে আসন পাইবার যোগ্য হইতাম।" * বাস্তবিক এই সকল তত্ত্বের আলোচনা করিলে তাঁহাদিগকে মনুষ্য মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে না; দেবতা বলিতেই ইচ্ছা করে।

এখন দেখা যাউক, বৈজ্ঞানিকেরা এ সম্বন্ধে কি বলেন। তাঁহারা বলেন, আদৌ আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ নাই। প্রমাণাভাবে কোন কথাই স্বীকার কর্ত্তব্য নহে। যখন আত্মার অস্তিত্বই স্বীকার করা যাইতে পারে না, তখন তাহার অবিনাশিতা, জীবাত্মা, পরমাত্মা, এ সকল উপন্যাসমধ্যে গণনা করিতে হয়। এই শ্রেণীর একজন জগদ্বিখ্যাত লেখক, আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার পক্ষে যে আপত্তি তাহা বিশদ রূপে বুঝাইয়াছেন।

"Thought and consciousness, though mentally distinguishable from the body, may not be a substance separable from it, but a result of it, standing in relation to it, like that of a tune to the musical instrument on which it is played; and that the arguments used to prove that the soul does not die with the body, would equally prove that the tune not does die with the instrument but survives its destruction and continues to exist apart. In fact those moderns who dispute the evidences of the immortality of the soul, do not in general believe the soul to be a substance *per se*, but regard it as a bundle of attributes, the attributes of feeling, thinking, reasoning, believing, willing and these attributes they regard as a consequence of the bodily organization which therefore, they urge, it is as unreasonable to suppose surviving when that organization is dispersed, as to suppose

* যে তত্ত্বটা বুঝাইলাম, তাহা যে বিলাতী Pantheism নয়, একথা বোধ হয় বলিবার প্রয়োজন নাই।

the color or odour of a rose surviving when the rose itself has perished. Those, therefore, who would deduce the immortality of the soul from its own nature have first to prove that the attributes in question are not attributes of the body, but of a separate substance." *

এইখানে পাঠক একটু সূক্ষ্ম বুঝিয়া দেখুন। এই বিচারের তাৎপর্য্য এই যে আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণাভাব, সুতরাং আত্মার অস্তিত্ব অসিদ্ধ। তদ্ভিন্ন ইহার দ্বারা আত্মার অনস্তিত্ব প্রমাণ হইতেছে না। আত্মা নাই, এমন কথা মিল কি কেহই বলিতে পারেন না। উক্ত বিচারে যে আত্মার অনস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে না, তাহা মিল নিজেই বুঝাইতেছেন।

"In the first place, it does not prove, experimentally, that any mode of organization has the power of producing feeling or thought. To make that proof good, it would be necessary, that we should be able to produce an organism, and try whether it would feel, which we cannot do."

পুনশ্চ—

"There are thinkers who regard it as a truth of reasou that miracles are impossible ; and in like manner there are others who, because the phenomena of life and consciousness are associated in their minds by undeviating experience with the action of material organs, think it an absurdity *per se* to imagine it possible those phenomena can exist under any other conditions. But they should remember that the uniform co-existence of one fact with another does not make the one fact a part of the other or the same with it. The relation of thought to a material brain is no metaphysical necessity ; but simply a constant co-existence within the limits of observation. And when analysed to the bottom on the principles of the associative Psychology, just as much as the mental functions, is, like matter itself, merely a set of human sensations either actual or

---

* Three Essays on Religion, p. 197. শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য এই টীকা লেখা যাইতেছে, সুতরাং ইংরেজির তরজমা দেওয়া যাইবে না।

inferribe as possible.........Experience furnishes us with no example of any series of states of consciousness without this group of contingent sensations attached to it; but it is as easy to imagine such a series of states without, as with, this accompaniment, and, we know of no reason in the nature of things against the possibility of its being thus disjoined. We may suppose that the same thoughts, emotions, volition and even sensations which we have here, may persist or recommence somewhere else under other conditions, just as we may suppose that other thoughts and sensations may exist under other conditions in other parts of the universe. And in entertaining this supposition we need not be embarrassed by any metaphysical difficulty about a thinking substance. Substance is but a general name for the perdurability of attributes; wherever there is a series of thoughts connected together by memories, that constitutes a thinking substance."

জড়বাদীর আপত্তি এই বিচারে ভাসিয়া গেল, তাহার চিহ্নমাত্র রহিল না। তথাপি ইহাতেই আত্মবাদী জয়ী হইতেছেন না। পৃথক্ আত্মা নাই, অথবা তাহা নশ্বর, এ কথা বলিবার কাহারও অধিকার নাই, ইহাতে প্রমানীকৃত হইল। কিন্তু আত্মা যে একটি স্বতন্ত্র পদার্থ, এবং তাহা অবিনাশী ইহা প্রমানীকৃত হইল না। তুমি বলিতেছ স্বতন্ত্র আত্মা আছে, এবং তাহা অবিনাশী, এ কথার প্রমান কি?

অনেক সহস্র বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর সকল সভ্য জাতির মধ্যে এই প্রমাণ সংগৃহীত হইয়া আসিয়াছে। বৈজ্ঞানিকেরা তাহা অপ্রচুর বলিয়া উড়াইয়া দেন। বৈজ্ঞানিকেরা সত্যবাদী এবং প্রমাণ সম্বন্ধে তাঁহারা সুবিচারক। অতএব তাঁহারা এ কথা কেন বলেন, সেটাও বুঝিয়া রাখা চাই।

বুঝিতে গেলে, আগে বুঝিতে হইবে প্রমাণ কি? যাহার দ্বারা কোন বিষয়ের জ্ঞান জন্মে, তাহাই তাহার প্রমাণ। আমি এই পুষ্পটি দেখিতে পাইতেছি বলিয়াই, জানিতে পারিতেছি যে পুষ্পটি আছে। প্রত্যক্ষ দৃষ্টিই এখানে পুষ্পের অস্তিত্বের প্রমাণ। আমি গৃহ মধ্যে শয়ন করিয়া মেঘগর্জ্জন শুনিলাম, ইহাতে জানিলাম যে আকাশে মেঘ আছে। এখানে মেঘ আমার

প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। কিন্তু মেঘের ধ্বনি আমার প্রত্যক্ষের* বিষয়। প্রত্যক্ষাভাবেও মেঘবিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার কারণ পূর্ব্বকৃত প্রত্যক্ষ হইতে অনুমান। যখনই যখনই এই রূপ গর্জ্জন ধ্বনি শুনিয়া আকাশ প্রতি দৃষ্টি পাত করা গিয়াছে, তখনই তখনই আকাশে মেঘ দেখা গিয়াছে।

অতএব আমরা দ্বিবিধ প্রমাণের দেখা পাইতেছি (১) প্রত্যক্ষ (২) অনুমান। ভারতবর্ষীয়েরা অন্যবিধ প্রমাণও স্বীকার করেন, তাহার কথা পরে বলিতেছি। বৈজ্ঞানিক বা জড়বাদীগণ অন্য কোন প্রকার প্রমাণ স্বীকার করেন না। তাঁহারা অনুমান সম্বন্ধে ইহাও বলেন, যে যে অনুমান প্রত্যক্ষ মূলক নহে, সে অনুমান অসিদ্ধ; অথবা এরূপ অনুমান হইতেই পারে না। এই তত্ত্বের মীমাংসা জন্য ইউরোপীয়েরা এক অতি বিচিত্র এবং মনোহর দর্শন শাস্ত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার সবিশেষ পরিচয় দিবার স্থান নাই।

এখন, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে আত্মা কখন কাহারও প্রত্যক্ষের বিষয় হয় নাই। শরীর প্রত্যক্ষ কিন্তু শরীরস্থ আত্মার প্রত্যক্ষ নাই। শরীর বিমুক্ত আত্মার ও কেহ কখন প্রত্যক্ষ করে নাই। যাহা প্রত্যক্ষের বিষয় নহে, তৎসম্বন্ধে প্রত্যক্ষমূলক কোন অনুমানও হইতে পারে না। কেবল ইহাই নহে। আত্মা ভিন্ন এমন অন্য কোন পদার্থ সম্বন্ধে মনুষ্যের কোন প্রকার প্রত্যক্ষজাত কোন প্রকার জ্ঞান নাই, যে তাহা হইতে আত্মার অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। এরূপ যে সকল প্রমাণ এদেশে বা ইউরোপে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা বিচারে টিকে না। অতএব আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই।†

---

* যাহা ইন্দ্রিয়গোচর তাহাই প্রত্যক্ষের বিষয়। পুষ্পের চক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইল মেঘের ধ্বনির শ্রাবণ প্রত্যক্ষ হইল।

† তবে সর্ব্ব দেশে সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে মৃতব্যক্তির দেহবিমুক্ত আত্মা কখন কখন মনুষ্যের ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ হয়। দেহ বিমুক্তাত্মা এই রূপে মনুষ্যের ইন্দ্রিয় গোচর হইলে অবস্থা বিশেষে ভূত প্রেত নাম প্রাপ্ত হয়। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, এ সকল চিত্তের ভ্রমমাত্র, রজ্জুতে সর্পজ্ঞানবৎ ভ্রম জ্ঞান মাত্র, আর ঈদৃশ ভ্রমজ্ঞানই আত্মার স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসের কারণ। কিন্তু একণে ইউরোপ ও আমেরিকায় Spiritualism তত্ত্বের প্রাদুর্ভাবে, এই প্রেত

তাই বিজ্ঞান, আত্মাকে খুঁজিয়া পায় না। বিজ্ঞান সত্যবাদী। বিজ্ঞানের যতদূর সাধ্য, বিজ্ঞান ততদূর সন্ধান করিল, কিন্তু যথার্থ সত্যানুসন্ধিৎসু হইয়াও, সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া ও বিজ্ঞান আত্মাকে পাইল না। পাইল না কেন, না বিজ্ঞানের ততদূর গতিশক্তি নাই। যাহার যত দৌড়, তাহার বেশী সে যাইতে পারে না। ডুবুরী কোমরে দড়ি বাঁধিয়া সাগরে নামে, যতটুকু দড়ি ততদূর যাইতে পারে, তার বেশী যাইতে পারে না, সাগরে সমস্ত রত্ন কুড়াইবার তার সাধ্য নাই। প্রমাণের দড়ি বিজ্ঞানের কোমরে বাঁধা, বিজ্ঞান প্রমাণের অপ্রাপ্য আত্মতত্ত্ব পাইবে কোথা? যেখানে বিজ্ঞান পৌঁছে না, সেখানে বিজ্ঞানের অধিকার নাই, যে উচ্চ ধামের নিম্ন সোপানে বসিয়া বিজ্ঞান জন্ম সার্থক করে, সেখানে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অনুসন্ধান করাই ভ্রম। "Our victorious Science fails to sound one fathom's depth on any side, since it does not explain the parentage of *mind.* For mind was in truth before all science, and remains for ever, the seer, judge, interpreter, even father of all its systems, facts, and laws. Our faculties are none the less truly above our heads because we no longer wonder like children at processes we do not understand. Spite of category and formula of Kant and Hegel, we are abashed before our own untraceable thought. The star of heaven, the grass of the field, the very dust that shall be man, foil our curiosity as much as ever, and none the less for yielding to the lens, the prison and the polariscope of

---

তত্ত্বই বিজ্ঞানের একটি শাখা হইয়া দাঁড়াইয়াছে; এবং Crookes, Wallace প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকেরা এতদ্বিষয়ক প্রমাণ সকল এমন উত্তম রূপে পরীক্ষিত ও শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন, যে প্রতিপক্ষেরা কিছু গোলযোগে পড়িয়াছেন। ইহার নানা প্রকার বাদ প্রতিবাদ চলিতেছে। তবে ইহা বলা যাইতে পারে, যে প্রেতপ্রত্যক্ষের যাথার্থ্য এখনও বৈজ্ঞানিকেরা সাধারণতঃ স্বীকার করেন না। সুতরাং উহা আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণের মধ্যে আমি গণনা করিতে পারিলাম না। আর ঈদৃশ প্রমাণের উপর ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করা বাঞ্ছনীয় বিবেচনা করি না। ধর্ম্ম বিজ্ঞান নহে; তাহার ভিত্তি আরও দৃঢ়সংস্থাপিত।

* আত্মা।

science ever now triumphs for our pride and delight *" যখন বিজ্ঞান একটি ধুলি-কণার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারে না, † তখন আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করিবে কি প্রকারে? যে হৃদয়ে ঈশ্বরকে না পায়, সে বিজ্ঞানে পায় না। যে হৃদয়ে ঈশ্বরকে পাইয়াছে, তাহার কাছে আত্মবাদ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের কোন প্রয়োজন নাই।

এখন, বৈজ্ঞানিক উত্তর করিবেন, যে বিচার বড় অন্যায় হইতেছে। যখন বলিতেছ, জ্ঞান মাত্রের উপায় প্রমাণ, তখন অবশ্য স্বীকার করিতেছ যে প্রমাণাতিরিক্ত জ্ঞেয় কিছুই নাই। আত্মতত্ত্ব যখন প্রমাণের অতীত, আত্মার অস্তিত্বের যখন প্রমাণ নাই, তখন আত্মসম্বন্ধে মনুষ্যের কোন জ্ঞান নাই, ও হইতে পারে না। অতএব আত্মা আছে কি না জানি না, ইহা ভিন্ন আর কিছু আমাদের বলিবার উপায় নাই।

এ কথার দুইটি উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। একটি প্রাচীন হিন্দু দার্শনিকদিগের উত্তর, একটি আধুনিক জর্ম্মাণদিগের উত্তর। দর্শন শাস্ত্রে এই দুইটি জাতিই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ। এই দুই জাতিই দেখিয়াছেন, যে প্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষমূলক যে অনুমান তাহার গতিশক্তি অতি সঙ্কীর্ণ, তাহা কখনই মনুষ্য জ্ঞানের সীমা নহে। এই জন্য হিন্দু দার্শনিকেরা অন্যবিধ প্রমাণ স্বীকার করেন। নৈয়ায়িকেরা বলেন, আর দ্বিবিধ প্রমাণ আছে, উপমান এবং শব্দ। সাংখ্যেরা উপমান স্বীকার করেন না, কিন্তু শব্দকে তৃতীয় প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন।

উপমান (Analogy) যে একটি পৃথক প্রমাণ, ইহা আমরা পাঠকদিগকে স্বীকার করিতে বলিতে পারি না। অনেকস্থলে উহার দ্বারা প্রমাণজ্ঞান জন্মে না, ভ্রম জ্ঞান জন্মে। যেখানে উপমান প্রমাণের কার্য্য করে, সেখানে উহা পৃথগ্‌বিধ প্রমাণ নহে, অনুমান বিশেষ মাত্র। এক্ষণে "শব্দ" কি তাহা বুঝাইতেছি।

---

* Oriental Religions, India, P. 447.

† কতকগুলি ইউরোপীয় দার্শনিকদিগের মতে বহির্জ্জগতের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই।

আপ্তোপদেশই শব্দ, অর্থাৎ ভ্রমপ্রমাদাদিশূন্য যে বাক্য তাহাই তৃতীয় প্রমাণ। যদি বেদাদিকে ভ্রমপ্রমাদাদিশূন্য বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে পারি, তবে তাহা প্রমাণ। যদি বেদাদিকে আমরা ভ্রমপ্রমাদাদিশূন্য বাক্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি, তবে আত্মার অস্তিত্ব ও অবিনাশিতা বেদে উক্ত হইয়াছে বলিয়া, উহা অনায়াসে স্বীকার করা যাইতে পারে। পরন্তু বেদাদি যদি মনুষ্যোক্তি হয়, তবে উহা ভ্রমপ্রমাদাদিশূন্য বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না, কেন না মনুষ্যমাত্রেই ভ্রমপ্রমাদাদির অধীন। স্থূল কথা, এক ঈশ্বরই ভ্রমপ্রমাদাদিশূন্য পুরুষ। যদি কোন উক্তিকে ঈশ্বরোক্তি বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে পারি, তবে তাহাই প্রকৃত শব্দরূপ প্রমাণ। খ্রীষ্টিয়ানেরাও ইহাকে উৎকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন—ইংরাজি নাম Revelation. বস্তুতঃ যদি কোন উক্তিকে ঈশ্বরোক্তি বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে তাহা প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট প্রমাণ। কেন না প্রত্যক্ষ ও অনুমানও ভ্রান্ত হইতে পারে, ঈশ্বর কখনই ভ্রান্ত হইতে পারেন না। যদি এই গীতাকে কাহারও ঈশ্বরোক্তি বলিয়া বিশ্বাস হয়, তবে আত্মার অস্তিত্ব ও অবিনাশিতা সম্বন্ধে তাঁহার অন্য প্রমাণ খুঁজিবার প্রয়োজন নাই; এই গীতাই অখণ্ডনীয় প্রমাণ। তবে নিরীশ্বর বৈজ্ঞানিক, গীতাদিকে ঈশ্বরোক্তি বলিয়া স্বীকার করিবেন না। আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে তিনি কি বাধ্য নহেন?

তাঁহাদিগের জন্য জর্ম্মাণ দার্শনিকদিগের উত্তর আছে। কাণ্টের বিচিত্র দর্শনশাস্ত্র পাঠককে বুঝাইবার স্থান এখানে নাই। কিন্তু কাণ্ট এবং তাঁহার পরবর্ত্তী কতগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ দার্শনিকদিগের মত এই যে প্রত্যক্ষ এবং প্রত্যক্ষমূলক অনুমান ভিন্ন জ্ঞানের অন্য কারণ আছে। তাঁহারা বলেন কতকগুলি তত্ত্ব মনুষ্যচিত্তে স্বতঃসিদ্ধ। তাঁহারা কেবল "বলেন," ইহাই নয়, কাণ্ট এই তত্ত্বের যে প্রকার প্রমাণ করিয়াছেন, তাহা মনুষ্য বুদ্ধির আশ্চর্য্য পরিচয় স্থল। কাণ্ট ইহাও বলেন যে যাহাকে আমরা বুদ্ধি বলি, অর্থাৎ যে শক্তির দ্বারা আমরা প্রত্যক্ষাদি হইতে প্রাপ্তজ্ঞান লইয়া বিচার করি, তাহার অপেক্ষা উচ্চতর আমাদের আর এক শক্তি আছে। যাহা বিচারে অপ্রাপ্য, সেই শক্তির প্রভাবে আমরা তাহা জানিতে পারি। ঈশ্বর, আত্মা, এবং জগতের

একত্ব সম্বন্ধীয় জ্ঞান আমরা সেই মহতী শক্তি হইতে পাই। এই "Transcendental Philosophy," সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। অতএব এমন লোক অনেক আছেন যে আত্মার অস্তিত্ব ও অবিনাশিতায় বিশ্বাস তাঁহাদের পক্ষে দুর্লভ। তবে যাহা, আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য, তাহা আমি এখানে বলিতে বাধ্য। আমার নিজের বিশ্বাস এই যে চিত্তবৃত্তি সকল সমুচিত মার্জ্জিত হইলে, আত্মসম্বন্ধীয় এই জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ হয়। *

ভক্তের এ সকল কচকচিতে কোন প্রয়োজন নাই। ঈশ্বরভক্ত, কেবল ক্ষুদ্র দর্শনশাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া আত্মার স্বাতন্ত্র্য বা অবিনাশিতা স্বীকার করেন না। ভক্তের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট যে ঈশ্বর আছেন, এবং তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন যে তিনিই পরমাত্মা, এবং স্বয়ংই সর্ব্বভূতে অবস্থান করিতেছেন। তবে যে এই দীর্ঘ বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম, তাহার কারণ এই যে অনেকে অসম্পূর্ণ বিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আত্মতত্ত্বকে উপহসিত করেন। তাঁহাদের জানা উচিত যে আত্মতত্ত্ব পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দুষ্প্রাপনীয় হউক, বিজ্ঞানবিরুদ্ধ নহে।

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥১৩।

অনুবাদ।

দেহীর যেমন এই দেহে কৌমার ও যৌবন ও বার্দ্ধক্য, তেমনি দেহান্তর-প্রাপ্তি। পণ্ডিত তাহাতে মুগ্ধ হন না॥ ১৩॥

টীকা।

গীতোক্ত প্রথম প্রধান তত্ত্ব, আত্মার অবিনাশিতা। এই শ্লোকে দ্বিতীয় প্রধান তত্ত্ব কথিত হইতেছে—জন্মান্তরবাদ। যেমন এই দেহেতেই আমাদিগকে ক্রমশঃ কৌমার, যৌবন, জরা ইত্যাদি অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতে হয়, তেমনি দেহান্তে দেহান্তর-প্রাপ্তি অবস্থান্তরপ্রাপ্তি মাত্র। অর্থাৎ মৃত্যু

---

* অনেকে বলিবেন, তবে কি Huxley, Tyndall প্রভৃতির মত লোকের চিত্তবৃত্তি সকল সমুচিত মার্জ্জিত হয় নাই? উত্তর—না। সকলগুলি হয় নাই।

কেবল অবস্থান্তর মাত্র, যেমন কৌমার গেলে যৌবন উপস্থিত হয়, যৌবন গেলে জরা উপস্থিত হয়, তেমনি এ দেহ যায়, আর এক দেহ আসে ;— যেমন কৌমার গিয়া যৌবন আসিলে কেহ শোক করে না, যৌবন গিয়া জরা আসিলে কেহ শোক করে না, তেমনি এ দেহ গেলে দেহান্তর-প্রাপ্তির বেলাই বা কেন শোক করিব ?

এই কথায়, মানিয়া লওয়া হইল যে মরিলেই আবার জন্ম আছে। আত্মার অবিনাশিতা যেমন হিন্দুধর্ম্মের প্রথম তত্ত্ব, জন্মান্তরবাদ তেমনি দ্বিতীয় তত্ত্ব। কিন্তু আত্মার অবিনাশিতা যেমন খ্রীষ্টিয়াদি অন্যান্য প্রধান ধর্ম্মে স্বীকৃত, জন্মান্তরবাদ সেরূপ নহে। পক্ষান্তরে জন্মান্তরবাদ যে কেবল হিন্দুধর্ম্মেই আছে, এমনও নহে। বৌদ্ধধর্ম্মেরও ইহা প্রধান তত্ত্ব, এবং অন্যান্য ধর্ম্মেও ছিল বা আছে। তবে ইউরোপে এ মত অগ্রাহ্য এবং ইহার কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই। এজন্য শিক্ষিত বাঙ্গালি এ মত গ্রাহ্য করেন না।

বাস্তবিক আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যেমন কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই, তেমনি জন্মান্তর সম্বন্ধেও তদ্রূপ কোন প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে যেমন আত্মার অস্তিত্ব অপ্রমাণ করা যায় না, জন্মান্তরও অপ্রমাণ করা যায় না। তা না থাক্, যাহার প্রমাণাভাব তাহা মানিতে কেহ বাধ্য নহে। এই তত্ত্বে বিশ্বাস যে চিত্তবৃত্তি সকলের সমুচিত অনুশীলনে স্বতঃসিদ্ধ হয়, এমন কথাও আমি বলিতে পারি না। তবে যিনি স্বর্গ নরকাদি মানেন, জন্মান্তরবাদির অপেক্ষা তাঁহার বেশী জোর কিছুই নাই। যেমন জন্মান্তরবাদের আপ্তোপদেশ ভিন্ন অন্য প্রমাণ নাই, স্বর্গ নরকাদিরও তেমনি অন্য প্রমাণ নাই। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এ দেশে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি ইউরোপীয়দিগের দেখাদেখি প্রমাণাভাবেও স্বর্গনরকে বিশ্বাসবান—অর্থাৎ সুখ দুঃখযুক্ত পারলৌকিক অবস্থাবিশেষে বিশ্বাসবান্, কিন্তু জন্মান্তরে কোন মতেই বিশ্বাসবান্ নহেন।

কথাটা একটু সবিস্তারে সমালোচনা করিবার আমাদের একটু প্রয়োজন আছে। যিনি আত্মার অস্তিত্ব মানেন না, তাঁহার সঙ্গে ত আমাদের কথাই নাই, কেন না তিনি কাজেই জন্মান্তর মানিবেন না। কিন্তু যিনি

আত্মার অস্তিত্ব ও অবিনাশিতা মানেন, তাঁহার সম্মুখে একটা বড় গুরুতর প্রশ্ন আপনা হইতেই উপস্থাপিত হয়।

জীবাত্মা যদি অবিনশ্বর হইল, তবে দেহান্তে তাহার কি গতি হয়?

এ বিষয়ে জগতে অনেকগুলি মত প্রচলিত আছে।

১। ভূতযোনি প্রাপ্ত হয়। ইহা সচরাচর অসভ্য জাতিদিগের বিশ্বাস।

২। স্বর্গাদি লোকান্তর প্রাপ্ত হয়। খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমানদিগের এই মত।

৩। জন্মান্তর প্রাপ্ত হয়। বৌদ্ধদিগের এই মত।

৪। পরব্রহ্মে লীন হয়, বা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়।

হিন্দুধর্ম্মে শেষোক্ত এই তিনটি মতই প্রচলিত আছে। এই তিনটি মতের সামঞ্জস্য কি প্রকার হইয়াছে তাহা বুঝাইতেছি। হিন্দুরা বলেন, যে দেহান্তে জীবাত্মা মুক্ত হয় না; আপনার কৃত কর্ম্মানুসারে পুনর্ব্বার দেহান্তর প্রাপ্ত হয়, তাহার আবার জন্মান্তর হয়। যখন জীবাত্মা এমন অবস্থা প্রাপ্ত হয়, যে ঈশ্বরে লীন হইবার যোগ্য হইয়াছে, তখন আর জন্ম হয় না, ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয় বা নির্ব্বাণ প্রাপ্তি হয়। ইহাকেই সচরাচর মুক্তি বা মোক্ষ বলে। কিসে জীবাত্মা এই অবস্থাপন্ন হইতে পারে, ইহাই সাংখ্যাদি দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। হিন্দুরা ইহাও বলেন, যে যখন জীবাত্মা মুক্ত হইবার অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই, অথচ এমন কোন সুকৃত করিয়াছে যে স্বর্গাদি উপভোগের যোগ্য, তখন জীবাত্মা কৃত পুণ্যের পরিমাণানুযায়ী কাল, স্বর্গাদি উপভোগ করে, পরে জন্মান্তর প্রাপ্ত হয়।

আপাততঃ শুনিলে এ সকল কথা পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রাপ্ত অনেকের নিকট অশ্রদ্ধেয় বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু একটু বিচার করিলে আর এক রকম বোধ হইবে।

এই জন্মান্তরবাদ, হিন্দুধর্ম্মে অতিশয় প্রবল। উপনিষদুক্ত হিন্দুধর্ম্ম, গীতোক্ত হিন্দুধর্ম্ম, পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম বা দার্শনিক হিন্দুধর্ম্ম, সকল প্রকার হিন্দুধর্ম্ম ইহার উপর স্থাপিত। যেমন সূত্রে মণি গ্রথিত থাকে, হিন্দুধর্ম্মের সকল তত্ত্বগুলিই তেমনি এই সূত্রে গ্রথিত আছে। অতএব এই তত্ত্বটি

আমাদিগকে বড় যত্নপূর্ব্বক বুঝিতে হইবে। কথাটাও বড় গুরুতর,—অতি দুরূহ। আমরা বাল্যকাল হইতে কথাটা শুনিয়া আসিতেছি, ইহা আমাদের বাল্য সংস্কারের মধ্যে, সুতরাং আমরা সচরাচর ইহার গৌরব অনুভব করি না। কিন্তু বিদেশীয় এবং অন্য ধর্ম্মাবলম্বী চিন্তাশীল পণ্ডিতেরা কুসংস্কার বর্জ্জিত হইয়া ইহার আলোচনা কালে বিস্ময়াবিষ্ট হয়েন! গীতার অনুবাদকার টমসন সাহেব এতৎসম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "Undoubtedly it is the most novel and startling idea ever started in any age or country:" টেলর সাহেব ইহাকে "one of the most remarkable developments of ethical speculation" বলিয়া প্রশংসিত করিয়াছেন।*

কথাটা যদি এমনই গুরুতর, তবে ইহা আর একটু ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

বলা হইয়াছে, জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ, ইহা হিন্দুশাস্ত্রের উক্তি। পরমাত্মা বা পরব্রহ্মের অংশ তাঁহা হইতে পার্থক্য লাভ করিল কি প্রকারে? তাহার দেহবদ্ধাবস্থা বা কেন? হিন্দুশাস্ত্রে ইহার যে উত্তর আছে তাহা বুঝাইতেছি। ঈশ্বরের অশেষ প্রকার শক্তি আছে। একটা শক্তির নাম মায়া। এই মায়া কি তাহা স্থানান্তরে বুঝাইব। এই মায়ার দ্বারা তিনি আপনার সত্ত্বাকে জগতে পরিণত করিয়াছেন। তিনি চৈতন্যময়; তাঁহা ভিন্ন আর চৈতন্য নাই; অতএব জগতে যে চৈতন্য দেখি ইহা তাঁহারই অংশ; তাঁহার সিসৃক্ষাক্রমে এই অংশ মায়ার বশীভূত হইয়া পৃথক ও দেহবদ্ধ হইয়াছে। যদি সেই পৃথগভূত চৈতন্য বা জীবাত্মা কোন প্রকারে মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে, তবে আর তাহার পার্থক্য থাকিবে কেন? পার্থক্য ঘুচিয়া যাইবে, জীবাত্মা আবার পরমাত্মায় বিলীন হইবে।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে জীবাত্মা এই মায়াকে অতিক্রম করিবে কি প্রকারে? যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা বা নিয়োগ ক্রমেই বদ্ধ হইয়া থাকে, তবে আবার বিমুক্ত হইবার সাধ্য কি? ইহার উত্তর এই যে ঈশ্বরের নিয়োগ এরূপ নহে, যে জীবাত্মা চিরকালই মায়াবদ্ধ থাকিবে। তিনি যে সকল নিয়ম করিয়াছেন, মায়ার অতিক্রমের উপায়ও তাহার ভিতরে

* Primitive Culture, Vol. I p 12.

রাখিয়াছেন। সে উপায় কি, তদ্বিষয়ে মত ভেদ আছে। কেহ বলেন জ্ঞানেই সেই মায়াকে অতিক্রম করা যায়; কেহ বলেন কর্ম্মে, কেহ বলেন ভক্তিতে। এই সকল মতের মধ্যে কোনটি সত্য, বা কোনটি অসত্য তাহার বিচার পশ্চাৎ করা যাইবে। এখন সকল গুলিই সত্য, ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া যাউক। এখন, এই গুলিই যদি ঈশ্বরে বিলীন হইবার উপায় হয়, তবে যে ব্যক্তি ইহজীবনে জ্ঞান, কর্ম্ম, বা ভক্তির সমুচিত অনুষ্ঠান করে নাই, সে ঈশ্বরে লয় বা মুক্তি লাভ করিবে না। তবে সে ব্যক্তির আত্মা, মৃত্যুর পর কোথায় যাইবে? আত্মা অবিনশ্বর; সুতরাং দেহভ্রষ্ট আত্মাকে কোথাও না কোথাও যাইতে হইবে।

ইহার এক উত্তর এই হইতে পারে, যে দেহভ্রষ্ট আত্মা কর্ম্মানুসারে স্বর্গে বা নরকে যাইবে। স্বর্গ বা নরক প্রভৃতি লোকান্তরের অস্তিত্বের প্রমাণাভাব। কিন্তু প্রমাণের কথা এখন থাক। স্বীকার করা যাউক কর্ম্মফলানুসারে আত্মা স্বর্গে বা নরকে যায়। এখন জিজ্ঞাস্য, যে জীবাত্মা স্বর্গে বা নরকে কিয়ৎ কালের জন্য যায়, না অনন্তকালের জন্য যায়?

যদি বল কিয়ৎকালের জন্য যায়, তবে সেখান হইতে ফিরিয়া আবার কোথায় যাইবে? জন্মান্তর স্বীকার না করিলে, এ প্রশ্নের উত্তর নাই। হয় বল যে জীব কর্ম্মফলের উপযোগী কাল স্বর্গ বা নরক ভোগ করিয়া, পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিবে, নয় বল যে অনন্ত কাল সে স্বর্গ বা নরক ভোগ করিবে।

খ্রীষ্টিয়ানেরা তাই বলেন। তাঁহারা বলেন যে ঈশ্বর বিচার করিয়া পাপীকে অনন্ত নরকে এবং পুন্যবান্কে অনন্ত স্বর্গে প্রেরণ করেন।

এ কথায় বড় গোলযোগে পড়িতে হয়। মনুষ্য লোকে এমন কেহই নাই যে কোন সৎকর্ম্ম কখন করে নাই বা কোন অসৎ কর্ম্ম কখন করে নাই। সকলেই কিছু পাপ, কিছু পুণ্য করে। এখন জিজ্ঞাস্য যে, যে কিছু পাপ করিয়াছে, কিছু পুণ্য করিয়াছে সে অনন্ত স্বর্গে যাইবে, না অনন্ত নরকে যাইবে? যদি সে অনন্ত স্বর্গে যায়, তবে জিজ্ঞাসা করি, তাহার পাপের দণ্ড হইল না কেন? যদি বল অনন্ত নরকে যাইবে, তবে জিজ্ঞাসা করি, তাহার পুণ্যের পুরস্কার হইল না কেন?

যদি বল যাহার পাপের ভাগ বেশী সে অনন্ত নরকে, যাহার পুণ্যের

ভাগ বেশী. সে অনন্ত স্বর্গে যাইবে, তাহা হইলও ঈশ্বরে অবিচার আরোপ করা হইল। কেন না তাহা হইলে, এক পক্ষে পুণ্যের কিছুই পুরস্কার হইল না, আর এক পক্ষে পাপের কিছুই দণ্ড হইল না।

কেবল ঈশ্বরের প্রতি অবিচার আরোপ করা হয় এমত নহে। ঘোরতর নিষ্ঠুরতা আরোপ করাও হয়। যাঁহাকে দয়াময় বলি, তিনি যে এই অল্পকাল পরিমিত মনুষ্যজীবনে কৃত পাপের জন্য অনন্তকালস্থায়ী দণ্ড বিধান করিবেন, ইহার অপেক্ষা অবিচার ও নিষ্ঠুরতা আর কি আছে? ঈদৃশ নিষ্ঠু-রতা ইহলোকের পামরগণের মধ্যেও পাওয়া যায় না।

যদি বল, যাহার পাপের ভাগ বেশী, পুণ্যের ভাগ কম, সে পুণ্যানুরূপ কাল স্বর্গ ভোগ করিয়া অনন্ত কাল জন্য নরকে যাইবে, এবং তদ্বিপরীতে বিপরীত ফল হইবে; তাহাতেও ঐ সকল আপত্তির নিরাস হইল না। কেন না, পরিমিত কাল, কোটি কোটি যুগ হইলেও, অনন্ত কালের তুলনায় কিছুই নহে। অবিচার ও নিষ্ঠুরতার লাঘব হইল, এমন হইতে পারে, অভাব হইল না। অতএব তুমি যদি স্বর্গ নরক স্বীকার কর, তবে তোমাকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যে অনন্ত কালের জন্য স্বর্গ নরক ভোগ বিহিত হইতে পারে না। তুমি উক্ত ইহাই বলিতে পার যে পাপ পুণ্যের পরিমাণানুযায়ী পরিমিত কাল জীব স্বর্গ বা নরক, বা পৌর্ব্বাপর্য্যের সহিত উভয় লোক ভোগ করিবে। তাহা হইলে সেই সাবেক প্রশ্নটীর উত্তর বাকি থাকে। সেই পরিমিত কালের অবসানে জীবাত্মা কোথায় যাইবে? পরব্রহ্মে লীন হইতে পারে না, কেননা, জ্ঞান কর্ম্মাদিই যদি মুক্তির উপায়, তবে স্বর্গ নরকে সে উপায়ের সাধনাভাবে মুক্তি অপ্রাপ্য। কেন না স্বর্গ নরক ভোগ মাত্র—কর্ম্ম ক্ষেত্র নহে, এবং দেহশূন্য আত্মার জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অভাবে, স্বর্গ নরকে জ্ঞান কর্ম্মের অভাব। অতএব এখনও জিজ্ঞাস্য, সেই পরিমিত কালের অবসানে জীবাত্মা কোথায় যায়?

হিন্দুশাস্ত্র এ প্রশ্নের উত্তরে বলে,—জীবাত্মা তখন জীবলোকে প্রত্যাগমন করিয়া দেহান্তর ধারণ করে। হিন্দুধর্ম্মের বিশেষতঃ এই গীতোক্ত ধর্ম্মের এই অভিপ্রায়, যে জীবাত্মা সচরাচর দেহধ্বংশের পর দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করে। সেই দেহান্তর-প্রাপ্তিতে কর্ম্মফলানুসারে

এবং পাপ পুণ্যের তারতম্যানুসারে সদসৎ যোনি প্রাপ্ত হয়। সচরাচর কর্ম্মফল ভোগ জন্মান্তরেই হইয়া থাকে, কিন্তু কতকগুলি কর্ম্ম এমন আছে যে তাহার ফলে স্বর্গপ্রাপ্তি হইতে পারে, আর কতকগুলি কর্ম্ম এমন আছে যে তাহার ফলে নরক ভোগ করিতে হয়। যে সেরূপ কর্ম্ম করিয়াছে তাহাকে স্বর্গে বা নরকে যাইতে হইবে। কর্ম্মের ফলের পরিমাণানুযায়ী কালই স্বর্গ বা নরক ভোগ করিবে, তাহার পর আবার জীবলোকে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিবে।

কিন্তু যে ব্যক্তি জন্মান্তর মানে না, তাহার সকল আপত্তির এখনও নিরাস হয় নাই। সে বলিবে, "যাহা বলিলে, এটা সাফ আন্দাজি কথা। অনন্ত স্বর্গ নরক ভোগ অসঙ্গত কথা স্বীকার করি। স্বর্গ ও নরক আমি আদৌ মানিতেছি না। কেন না তাহার প্রমাণাভাব। কিন্তু স্বর্গ নরক না মানিলেই জন্মান্তর মানিব কেন? মানিলাম যে আত্মা অবিনাশী। তুমি বলিতেছ, যে অবিনাশী আত্মা, যদি দেহান্তরে না যায়, তবে কোথায় যাইবে? আমি উত্তরে বলিব, কোথায় যায় তাহা জানি না। পরকালের কথা কিছুই জানি না। যাহা জানি না, যাহার প্রমাণাভাব, তাহা মানিব না। জন্মান্তরের প্রমাণ দাও, তবে মানিব। গত্যন্তরের প্রমাণাভাব, জন্মান্তরের প্রমাণ নয়। তুমি যে রামও নও, শ্যামও নয়, তাহাতে প্রমাণ হইতেছে না যে যে তুমি যাদব কি মাধব। জন্মান্তর যে হইয়া থাকে, তাহার প্রমাণ কি?"

কথা বড় শক্ত। জন্মান্তরবাদীরা এ বিষয়ে যে সকল প্রমাণ দিয়া থাকেন, বা ইচ্ছা করিলে দিতে পারেন, তাহা আমি যথাসাধ্য নিম্নে সংগ্রহ করিলাম।

১। এ দেশে সচরাচর, লোকের অদৃষ্ট তারতম্য দেখাইয়া এই মত সমর্থন করা হয়। কেহ বিনা দোষে দুঃখী; কেহ সহস্র দোষ করিয়াও সুখী, এ দেশীয়গণ জন্মান্তরের সুকৃত দুষ্কৃত ভিন্ন এরূপ বৈষম্যের কিছু কারণ দেখেন না। লোকান্তরে অর্থাৎ স্বর্গ নরকে সুকৃতের পুরস্কার ও দুষ্কৃতের দণ্ড হইবে, এ কথা বলিলে ইহলোকের অদৃষ্ট-বৈষম্য সম্পূর্ণ রূপে বুঝা যায় না। কেহ আজন্ম দুঃখী, অন্নহীনের ঘরে জন্মিয়াছে;

কেহ আজন্ম সুখী, রাজার এক মাত্র পুত্র ;—জন্ম কালেই এ অদৃষ্ট তারতম্য কেন ? যদি ইহা জীবের কর্ম্মফল হয়, তবে ইহজন্মের কর্ম্মফল নহে, কেন না সদ্যঃপ্রসূত শিশুর ত কিছুই ইহজন্মকৃত কর্ম্ম নাই। কাজেই তাঁহারা এখানে পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মফল বিবেচনা করিয়া থাকেন।

আপত্তিকারক এ বিচারে সন্তুষ্ট হইবেন না। মনে কর, তিনি বলিবেন "সকলই কি কর্ম্মফল ? যদি তাই হয়, তবে মৃত্যুকেও কর্ম্মফল বলিতে হইবে। কিন্তু কখনও কোন জীব, মৃত্যু হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। অতএব ইহাই সিদ্ধ যে এমন কোন কর্ম্ম বা অকর্ম্ম নাই, যদ্দ্বারা মৃত্যু হইতে রক্ষা হইতে পারে। অতএব মৃত্যু কর্ম্মফল হইতে পারে না। যদি মৃত্যু কর্ম্মফল না হইল, তবে জন্মই বা কর্ম্মফল বলিব কেন ? যাহা কর্ম্মফল আর যাহা কর্ম্মফল নহে সকলই ঈশ্বরের নিয়মে ঘটে। ইহাও তাই। দম্পতী-সংসর্গে অবস্থা বিশেষে পুত্র জন্মে, রাজার ঘরেও জন্মে ; মুটের ঘরেও জন্মে। ইহাও তাই ঘটিয়াছে। এমন স্থলে জাতব্যক্তির কর্ম্মফল খুঁজিব কেন ?"

এখানেও বিচার শেষ হয় না। পূর্ব্বজন্মবাদী প্রত্যুত্তরে বলিতে পারেন, "ঈশ্বরের নিয়মের ফলে সকলই ঘটে, ইহা আমিও স্বীকার করি। তবে বলিতেছি, যে এ বিষয়ে ঈশ্বরের নিয়ম এই যে পূর্ব্বজন্মকৃত ফলানুসারে এই সকল বৈষম্য ঘটে। তুমি যে নিয়ম বলিতেছ, আমি তাহা অস্বীকার করিতেছি—জন্মের কারণ উপস্থিত হইলেই জন্ম ঘটিবে—তা রাজ্ঞীর গর্ভেই কি, আর দরিদ্রের গর্ভেই কি ? কিন্তু এ নিয়মে কি জন্ম তত্ত্ব সকলই বুঝাইতে পার ? কেহ রূপ, কান্তি, বুদ্ধি, সদ্গুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে—কেহ কুরূপ, নির্ব্বোধ ও গুণহীন হইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে। তুমি যদি বল, যে এইরূপ প্রভেদ অনেক স্থলে জন্মের পরবর্ত্তী শিক্ষার ফল, তাহাতে আমার উত্তর এই যে শিক্ষার প্রভেদে কতক তারতম্য ঘটে বটে, কিন্তু সমস্ত তারতম্য টুকু শিক্ষাধীন বলিয়া বুঝা যায় না। কেন না অনেক স্থলেই দেখা যায় যে এক প্রকার শিক্ষায় পাত্র ভেদে ফলের বিশেষ তারতম্য ঘটে। এমন কি শিক্ষা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে দেহ ও বুদ্ধির তারতম্য দেখা যায়। ছয় মাসের শিশুদিগের মধ্যেও এ প্রভেদ লক্ষিত হয়। জানি, তুমি বলিবে, যে, যে টুকু শিক্ষার অধীন বলিয়া বুঝা

যায় না. সে তারতম্য টুকু, বৈজিক, অর্থাৎ পিতা মাতা বা পূর্ব্বপুরুষগণের প্রকৃতির ফল। আমি ইহাও মানি, যে মাতা পিতা বা তৎপূর্ব্বগামী পূর্ব্ব-পুরুষগণের প্রকৃতি এমন কি সংস্কার পর্য্যন্ত আমাদিগকে পাইতে হয়, এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। কিন্তু মনুষ্য মধ্যে যে তারতম্যের কথা বলিতেছি, তাহা তোমার বৈজিক তত্ত্বে নিঃশেষে বুঝা যায় না। দেখ, এক মাতার গর্ভে এক পিতার ঔরসে অনেকগুলি ভ্রাতা জন্মে; তাহাদের মাতা পিতা বা পূর্ব্বপুরুষ সম্বন্ধে কোনই প্রভেদ নাই; অথচ ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিশেষ তারতম্য দেখা যায়। ইহার উত্তরে তুমি বলিতে পার বটে, যে গর্ভাধান কালে মাতা পিতার দৈহিক অবস্থা এবং যতদিন শিশু গর্ভে থাকে, ততদিন মাতার দৈহিক ও মানসিক অবস্থা ও তৎকালীন ঘটনা সকল এই তারতম্যের কারণ। না হয় ইহাও মানিলাম—কিন্তু যমজেও এরূপ তারতম্য দেখা যায়—সে তারতম্যের কিছু কারণ নির্দ্দেশ করিতে পার কি ?"

ইহারও বৈজ্ঞানিক উত্তর দিতে পারেন। তিনি বলিতে পারেন, যে এই সকল তারতম্য এতদূর মনুষ্য-পরিজ্ঞাত নৈসর্গিক নিয়মাধীন বলিয়া বুঝা গেল, তবে বাকি টুকু মনুষ্যের অজ্ঞাত নিয়মের অধীন বলিয়া বিবেচনা করা উচিত—পূর্ব্বজন্ম কল্পনা করা অনাবশ্যক। এখনও বিজ্ঞান এতদূর যায় নাই, যে এই তারতম্যের কারণ সর্ব্বত্র নির্দ্দেশ করা যায়; কিন্তু একদিন যাইবে ভরসা করা যায়।

এ দিকে জন্মান্তরবাদীও বলিতে পারেন যে, এ তোমার আন্দাজি কথা। যাহা বিজ্ঞান এখন বুঝাইতে পারিতেছে না, তাহা যে বিজ্ঞান বুঝাইতে পারে, এবং ভবিষ্যতে বুঝাইতে পারিবে, এটা আন্দাজি কথা। ইহা আমি মানি না।

এরূপ বিচারের অন্ত নাই। কোন পক্ষের জয় পরাজয় নাই। এখানে বৈজ্ঞানিক, জন্মান্তরবাদীকে নিরস্ত করিতে পারেন না, বা জন্মান্তরবাদী বৈজ্ঞানিককে নিরস্ত করিতে পারেন না। উভয়ের দশা তুল্য হইয়া পড়ে। যাহা অজ্ঞাত, উভয়কেই তাহার আশ্রয় লইতে হয়। তবে জন্মান্তর-বাদীকেই বিশেষ প্রকারে অজ্ঞাত ও অপ্রামাণিকের আশ্রয় লইতে হয়।

এ বিচারে জন্মান্তর প্রমাণীকৃত হইতেছে এমন আমরা স্বীকার করিতে পারি না।

২। যাহাতে মনুষ্য সাধারণের বিশ্বাস, তাহা সত্য বলিয়া বিবেচনা করিতে হয়, এমন কথা অনেকে বলেন। খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমানেরা যাই বলুন, অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী মনুষ্যেরা সাধারণতঃ জন্মান্তরে বিশ্বাস করে। পৃথিবী অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, নানা দেশে নানা জাতিই জন্মান্তরে বিশ্বাসবান।*

বলাবাহুল্য যে এ প্রমাণও অনেক লোকের প্রতীতিকর হইবে না। যাহা জনসাধারণের বিশ্বাস, তাহাও সকল সময়ে সত্য হয় না, ইহা প্রসিদ্ধ। যথা, পৃথিবী সূর্য্যাদির সম্বর্ত্তনকেন্দ্র।

৩। যত দিন না আত্মা বহুজন্মার্জ্জিত জ্ঞান কর্ম্মাদির দ্বারা বিধূতপাপ হয়, তত দিন ব্রহ্মপ্রাপ্তির যোগ্য হয় না। এক জন্মে সকলে তদুপযোগী চিত্তশুদ্ধি লাভ করে না। এ কথাটা আমাদের দেশী, কিন্তু গ্রীক দার্শনিকেরাও এই যুক্তির দ্বারা জন্মান্তরবাদের সত্যতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যাঁহারা তাহা সবিস্তারে পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা Phœdon নামক বিখ্যাত গ্রন্থে সোক্রেতিসের উক্তি অধ্যয়ন করিবেন। বৈজ্ঞানিক বলিবেন, এ কথারও প্রমাণাভাব।

---

* It has been accepted, in some form, by disciples of every Great religion in the world. It is common to Greek philosophers, Egyptian priests, Jewish Rabbins, and several early Christian sects It appears in the speculations of the Neo-Platonists, of later European mystics, even of socialists like Fourier, who elaborates a fanciful system of successive lines mutually connected by numerical relation. It reaches from the Eleusinian mysteries down to the religions of many rude tribes of north America and the Pacific isles. Not a few noble dreams of the cultivated imagination are subtly associated with it, as in Plato, Giordano Primo, Herder, Sir Thomas Browne, and specially notable is Lessing's conception of gradual improvement of the human type through metamorphosis in a series of future lives." Oriental Religions ; India p 517.

যিনি এ সকল কথার বিস্তারিত প্রথম সংগ্রহ দেখিতে চান, তিনি টৈলর প্রণীত "Primitive culture" নামক গ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায় অধ্যয়ন করিবেন।

৪। অনেকের বিশ্বাস যে যোগসিদ্ধ পুরুষেরা আপনাদিগের পূর্ব্ব জন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ করিতে পারেন। কিন্তু কোন সিদ্ধ পুরুষের যে এরূপ পূর্ব্বজন্মস্মৃতি উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার. বিশ্বাসজনক কিছু প্রমাণ নাই। পুরাণেতিহাসের সকল কথা যে বিশ্বাসযোগ্য নহে ইহা বলা বাহুল্য। * আর যদি কোন সিদ্ধ পুরুষ যথার্থই বলিয়া থাকেন, যে তাঁহার পূর্ব্বজন্মস্মৃতি উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা হইলেও প্রমাণ সম্পূর্ণ হইল না। কেননা দুইটি সন্দেহের কারণ বিদ্যমান থাকে (১) তিনি সত্য কথা বলিতেছেন কি না, (২) যদিও ইচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যা না বলুন, তাঁহার সেই বিস্মৃতি কোন পীড়াজনিত মস্তিষ্কের বিক্রিয়া মাত্র কি না?

৫। যোগীদিগের পূর্ব্বজন্ম-স্মৃতিতে বিশ্বাসবান না হইলেও, আর এক প্রকার পূর্ব্বজন্মস্মৃতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। অনেকেরই এমন ঘটে যে কোন নূতন স্থানে আসিলে মনে হয়, যে পূর্ব্বে যেন কখনও এস্থানে আসিয়াছি—কোন একটা নুতন ঘটনা হইলে মনে হয়, যেন এ ঘটনা পূর্ব্বে কখন ঘটিয়াছিল। অথচ ইহাও নিশ্চিত স্মরণ হয়, যে এজন্মে কখন সে স্থানে আসি নাই বা সে ঘটনা ঘটে নাই। অনেকে এমন স্থলে বিবেচনা করেন, যে পূর্ব্বজন্মে সেই স্থানে গিয়াছিলাম, অথবা সেই ঘটনা ঘটিয়াছিল—নহিলে এরূপ স্মৃতি কোথা হইতে উদয় হয়?

---

*কিন্তু ইহা আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে ভিন্ন দেশীয় লেখকেও এরূপ পূর্ব্বজন্মস্মৃতির কথা বলেন।

"Pythagoras is made to illustrate in his own person his doctrine of metempsychosis, by recognizing where it hung in Here's temple the shield he had carried in a former birth, when he was that Euphorbas whom Menelaus slew at the seige of Troy. Afterwards he was Hermo tunos, the Klazomenian prophet, whose funeral rites were so pre-maturely celebrated while his soul was out, and after that, as Lucian tells the story, his prophetic soul entered the body of a cock. Mikyllos asks the cock to tell him of the siege of Troy—were things there really as Homer has said? But the cock replies;—"How should Homer have konwn, O Mikyllos, when the Trojan war was going on, he was a camel in Bactria"—*Tylor's Primitive Culture, Vol II*, p 13.

বলা বাহুল্য ইহা সব খোস গল্প মাত্র।

এরূপ স্মৃতির উদয় যে হইয়া থাকে, তাহা সত্য। অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি সত্য। অনেক পাঠকই বলিতে পারিবেন, যে তাঁহাদের মনে কখন না কখন এমন স্মৃতির উদয় হইয়াছিল। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানশাস্ত্রও ইহার সত্যতা স্বীকার করে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, যে এ সকল "Fallacies of Memory" অথবা মস্তিষ্কের Double action. কিরূপে এরূপ স্মৃতির উদয় হয়, তাহা কার্পেণ্টর সাহেবের Mental Physiology নামক গ্রন্থ হইতে দুইটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইব।

"Several years ago the Rev. S. Hansard, now Rector of Bethnal Green, was doing clerical duty for a time at Hurstmonceaux in Sussex and while there, he one day went over with a party of friends to Pevensey Castle, which he did not remember to have previously visited. As he approached the gateway he became conscious of a very vivid impression of having seen it before and he "seemed to himself to see" not only the gateway itself but donkeys beneath the arch and people on the top of it. His conviction that he *must* have visited the castle on some former occasion—although he had neither the slightest remembrance of such a visit, nor any knowledge of having ever been in the neighbourhood previously to his residence at Hurstmonceaux—made him enquire from his mother if she could throw any light on the matter. She at once informed him that being in that part of the country when he was about *eighteen months* old, she had gone over with a large party and had taken him in the pannier of a donkey, that the elders of the party having brought lunch with them, had eaten it on the roof of the gateway, where they would have been seen from below, whilst he had been left with the attendants and donkeys.—This case is remarkable for the vividness of the sensorial impression (it may be worth mentioning that Mr. Hansard has a decidedly artistic temperament) and for the reproduction of details which were not likely to have been brought up in conversation, even if he had happened to hear the visit itself mentioned as an event of his childhood, and of such mention he has no remembrance whatever."

যদি এই ব্যক্তির মা না বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে এ স্মৃতি কোথা হইতে আসিল, তাহার কিছুই নিশ্চয়তা হইত না। পূর্ব্বজন্মবাদিগণ ইহা পূর্ব্বজন্মস্মৃতি বলিয়া ধরিতেন সন্দেহ নাই। এইরূপ অনেক স্মৃতি আছে, যাহার

আমরা কোন কারণ দেখি না, অনুসন্ধান করিলে ইহজন্মেই তাহার কারণ পাওয়া যায়। এইরূপ সফল অনুসন্ধানের আর একটি উদাহরণ কার্পেণ্টর সাহেবের ঐ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

In a Roman Catholic town in Germany a young woman who could neither read nor write, was seized with a fever and was said by the priests, to be possessed of a devil, because she was heard talking Latin, Greek and Hebrew. Whole sheets of her ravings were written out and found to consist of sentences intelligible in themselves, but having slight connection with each other. Of her Hebrew sayings only a few *could be traced to the Bible and most seemed to be in Rabbinical dia*-lect. All trick was out of the question ; the woman was a simple creature ; there was no doubt as to the fever. It was long before any explanation, save that of demoniacal possession, could be obtained. At last the mystery was unveiled by a physician who determined to trace back the girl's history and who after much trouble discovered that at the age of nine she had been charitably taken by an old Protestant pastor, a great Hebrew scholar, in whose house she lived till his death. On further inquiry it appeared to have been the old man's custom for years to walk up and down a passage in his house into which the kitchen opened, and to read to himself with a loud voice out of his books. The books were ransacked and among them were found several of the Greek and Latin Fathers together with a collection of Rabbinical writings. In these works so many of the passages taken down at the young woman's bedside were identified that there could be no reasonable doubt as to their source."

এ দেশে হইলে ইহার আর কোন অনুসন্ধান হইত না, গ্রীক, লাটিন ও হিব্রু এই স্ত্রীলোকের "পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতা বিদ্যার" মধ্যে গণিত ও স্থিরীকৃত হইত।

পক্ষান্তরে ইহাও বলিতে পারা যায় না, যে এরূপ সকল স্মৃতিই, অনুসন্ধান করিলে, এই বর্ত্তমান জীবনমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। বেশী অনুসন্ধান না হইলে এ কথা স্থির করিয়া বলা যায় না। তেমন বেশী অনুসন্ধান আজিও হয় নাই। যতদিন না হয়, ততদিন এ প্রমাণ কতদূর গ্রাহ্য তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না।

অনুসন্ধানের ফল যাহা হউক, আর একটা তর্ক উঠিতে পারে। স্মৃতি মস্তিষ্কের ক্রিয়া, না আত্মার ক্রিয়া? যদি বল আত্মার ক্রিয়া, তবে পূর্ব্বজন্মের সবিশেষ স্মৃতি আমাদের মনে উদয় হয় না কেন? কেবল এক্ আধটুকু অস্পষ্ট স্মৃতি কখন কদাচিৎ মনে আসার কথা বল কেন? আত্মা ত সেই আছে, তবে তাহার স্মৃতি কোথায় গেল? আর যদি বল স্মৃতি মস্তিষ্কের ক্রিয়া, তবে এই এক আধটুকু অস্পষ্ট স্মৃতিই বা উদিত হইতে পারে কি প্রকারে? কেন না যে মস্তিষ্কে পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি ছিল, সে মস্তিষ্ক ত দেহের সঙ্গে ধ্বংস পাইয়াছে—আর নাই।

এ আপত্তির সুমীমাংসা করা যায়। কিন্তু প্রয়োজন নাই। কেন না এই সকল স্মৃতি যে পূর্ব্বজন্মস্মৃতি ইহাই সিদ্ধ হইতেছে না।

শেষ কথা এই যে যাঁহারা জীবাত্মার নিত্যতা স্বীকার করেন, তাঁহাদের জন্মান্তর স্বীকার ভিন্ন গতি নাই। আত্মা যদি নিত্য হয়, তবে অবশ্য পূর্ব্বে ছিল। কোথায় ছিল? পরমাত্মায় লীন ছিল, এ কথা বলা যায় না। কেন না পরমাত্মায় যাহা লীন তাহা জীবাত্মা নহে, তাহার পৃথক অস্তিত্ব নাই। আর যদি বল, লোকান্তরে ছিল, তাহা হইলে ইহলোকে তাহার জন্ম, জন্মান্তর বলিতেই হইবে। লোকান্তরে ছিল, যদি এমন না বল, তবে অবশ্য বলিতে হইবে, যে ইহ লোকেই দেহান্তরে ছিল।

এমন কেহ থাকিতে পারেন, যে আত্মার অবিনাশিতা স্বীকার করিবেন, কিন্তু নিত্যতা স্বীকার করিবেন না। অর্থাৎ বলিবেন যে দেহের সহিত আত্মার জন্ম হয়, জন্ম হইলে আর ধ্বংস নাই; কিন্তু জন্মের পূর্ব্বে যে আত্মা ছিল, এমন না হইতে পারে। যাঁহারা এমন বলেন, তাঁহারা প্রত্যেক জীব-জন্মে একটি নূতন সৃষ্টির কল্পনা করেন। এরূপ কল্পনা বিজ্ঞানবিরুদ্ধ। কেন না বিজ্ঞান শাস্ত্রের মূল সূত্র এই, যে জাগতিক নিয়ম সকল নিত্য, তাহার কখন বিপর্য্যয় ঘটে না। এখন জাগতিক নিয়মের মধ্যে বিশেষ প্রকারে প্রমাণী-কৃত একটি নিয়ম এই যে জগতে নূতন সৃষ্টি নাই। জগতে কিছু নূতন সৃষ্টি হয় না,—নিত্য নিয়মাবলীর প্রভাবে বস্তুর রূপান্তর হয় মাত্র *। এই যে জীব-শরীর, ইহা জন্মিলে বা গর্ভে সঞ্চারিত হইলে কোন নূতন সৃষ্টি হইল, এমন কথা

* নাবস্তুনাবস্তু-সিদ্ধিঃ *Ex nihilo nihil fit.*

বলা যায় না; পূর্ব্ব* হইতে বিদ্যমান্ জড় পদার্থ সমূহের নূতন সমবায় হইল মাত্র। অন্য বস্তুর রূপান্তর হইল মাত্র। আত্মা যাহা শরীরের সহিত জন্ম গ্রহণ করিল, তাহা কিছুরই রূপান্তর বলা যায় না। কেন না আত্মা জড় পদার্থ নহে, সুতরাং জড়ের বিকার নহে। পূর্ব্বপ্রাপ্ত আত্মা সকল ও অবিনাশী, সুতরাং তাহার ও রূপান্তর নহে। কাজেই নূতন সৃষ্টি বলিতে হইবে। কিন্তু নূতন সৃষ্টি জাগতিক নিয়মবিরুদ্ধ। অতএব আত্মাকে অবিনাশী বলিলে নিত্য ও অনাদি কাজেই বলিতে হয়। নিত্য ও অনাদি বলিলে জন্মান্তর কাজেই স্বীকার করিতে হয়।

আর যাঁহারা আত্মার স্বাতন্ত্র্য বা অবিনাশিতা স্বীকার করেন না, তাঁহারা অবশ্য জন্মান্তর ও স্বীকার করিবেন না। তাঁহাদিগের প্রতি আমার বক্তব্য এই যে জন্মান্তরবাদ অপ্রামাণ্য হইলেও ইহা তাঁহাদিগের কাছে অশ্রদ্ধেয় হইতে পারে না। তাঁহাদিগেরই সম্প্রদায় ভুক্ত ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা কি বলেন শুনা যাউক।

বৌদ্ধতত্ত্ববেত্তা Rhys Davids লেখেন,

"The doctrine of Transmigration in either the Brahmanical or the Buddhist form, is not capable of disproof; while it affords an explanation, quite complete to those who can believe in it, of the apparent anomalies and wrongs in the distribution of happiness or woe. † The explanation can always be exact, for it is scarcely more than a repetition of the facts to be explained; it may always fit the facts, for it is derived from them; and it cannot be disproved ‡, for it lies in a sphere beyond the reach of human enquiry."

---

* অনেকগুলি আধুনিক ইউরোপীয় লেখক জন্মান্তর বাদ সমর্থন করিয়াছেন। Herder ও Lessing তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তদ্ভিন্ন Fourier, Soame Jenyns, Figuier, Dupont de Nemours, Pezzani প্রভৃতি অনেক ইতর লেখকের নাম করা যাইতে পারে।

† Buddhisim—p. 100.

‡ যদি বল, প্রেততত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা প্রমাণ করিতেছেন যে দেহমুক্ত মনুষ্যাত্মা কখন কখন মনুষ্যের ইন্দ্রিয়গোচর হইয়া থাকে, তাঁহাতেও জন্মান্তর বাদের নিরাস হয় না। জন্মান্তরবাদিরা এমন বলেন না, যে সকল সময়েই মৃত্যু হইবা মাত্র আত্মা দেহান্তরে প্রবেশ করে। যদি এমন হয় যে কখন কখন দেহান্তর প্রাপন পক্ষে কালবিলম্ব ঘটে, তাহা হইলে জন্মান্তর অপ্রমাণিত হইল না।

টৈলর সাহেব লিখিতেছেন—

"The Buddhist Theory of "Karma," or "Action," which controls the destiny of all sentient beings, not by judicial rewards and punishment, but by the inexhorable result of cause into effect, where the present is ever determined by the past in an unbroken line of causation is indeed one of the world's most remarkable developments of ethical speculation." *Primitive Culture—Vol II.* p. 12.

কথাটার ভিতর একটু নিগূঢ়ার্থ আছে। খৃষ্টানেরা জন্মান্তর বিশ্বাস করেন না; তাঁহারা বলেন স্বর্গে বসিয়া ঈশ্বর পাপ পুণ্যের বিচার করিয়া দোষীর দণ্ড ও পুণ্যাত্মার পুরস্কার বিহিত করেন। টৈলর সাহেবের এ কথাটার তাৎপর্য্য এই যে ঈশ্বর যে হাকিমের মত বেঞ্চে বসিয়া ডিক্রী ডিস-মিস করেন, তাহার অপেক্ষা এই কার্য্যকারণ সম্বন্ধে নিবদ্ধ জীবাদৃষ্ট অধিকতর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বটে। কথাটা একটু ভাল করিয়া বুঝা উচিত। জগতের শাসন প্রণালী এই যে, কতকগুলি জাগতিক নিয়ম আছে। তাহা নিত্য, কখন বিপর্য্যস্ত হয় না। সেই গুলির প্রভাবে সমস্ত জাগতিক ক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়; জগদীশ্বরকে কখন ও হস্তক্ষেপ করিয়া নিজে কোন কাজ করিতে হয় না। ইহাও সত্য সকল কাজ তিনি নিজেই করেন, কিন্তু সে নিয়মের আড়ালে থাকিয়া। কিন্তু যদি বলি যে তিনি বিচার কার্য্যে ব্রতী হইয়া জীবের মৃত্যুর পর, তাহার অদৃষ্ট সম্বন্ধে ডিক্রী ডিসমিস করিয়া কাহাকে স্বর্গে বা কাহাকে নরকে পাঠাইতেছেন, তবে যাহা জগতের বিরুদ্ধ তাহা কল্পনা করা হইল। এখানে নিয়মের দ্বারা কোন কার্য্য সিদ্ধ হইতেছে না স্বয়ং জগদীশ্বরকে কার্য্য করিতে হইতেছে। প্রত্যেক জীবের দণ্ড পুরস্কার বিধান, এক একটি ঈশ্বরের অনিয়মসিদ্ধ কার্য্য—অর্থাৎ miracle. কিন্তু জন্মান্তরবাদে এ আপত্তি ঘটে না। ঈশ্বরের নিয়ম এই যে এইরূপ পাপাচারী এইরূপ যোনি প্রাপ্ত হইবে। কর্ম্ম কারণ, যোনি বিশেষ তাহার কার্য্য। এইরূপ কার্য্য কারণ সম্বন্ধ নিবদ্ধ কর্ম্ম-ফলের দ্বারাই জন্মান্তর সম্পাদিত হয়—"miracle" প্রয়োজন হয় না।

শ্লেগেল বড় গোঁড়া খ্রীষ্টিয়ান, কিন্তু তিনি ইউরোপের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক ও পণ্ডিত। তিনি এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহার ইংরেজি অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি।

"In this doctrine, there was a noble element of truth—the feeling that man, since he has gone astray, and wandered so far from his God, must needs exert many efforts, and undergo a long and painful pilgrimage before he can regain the source of all perfection ;—the firm conviction and positive certainty that nothing defective, impure, or defiled with earthly stains can enter the pure region of perfect spirits, or be eternally united to God ; and that thus before it can attain to this blissful end, the immortal soul must pass through long trials and many purifications. It may now well be conceived, (and indeed the experience of this life would prove it) that suffering, which deeply pierces the soul, anguish that convulses all the members of existence, may contribute, or may even be necessary, to the deliverance of the soul from all alloy, and pollution, or to borrow a comparison from natural objects, the generous metal is melted down in fire and purged from its dross. It is certainly true that the greater the degeneracy and the degradation of man, the nearer is his approximation to the brute ; and when the transmigration of the immortal soul through the bodies of various animals is merely considered as the punishment of its former transgressions, we can very well understand the opinion which supposes that man who by his crimes and the abuse of his reason, had descended to the level of the brute should at last be transformed into the brute itself '

পরিশেষে আমেরিকা নিবাসী সামুয়েল জনসন সাহেবের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। ইহার মত বিজ্ঞ লেখক দুর্লভ।

"The Transmigration faith was so widely spread in the elder world, because it had its roots in natural and profound aspirations. It combined the two fold intuition of immortality and moral sequence with that mystic sense of the unity of being which is a germ of the highest religious truth.†"

এক্ষণে যাহা বলা হইল, তাহার স্থূল মর্ম্ম বলিতেছি।

১। জন্মান্তরবাদ অপ্রমাণ করা যায় না।

---

* Philosophy of History—translated by Robertson—Bohn's Edition—p. 157-8.

† Oriental Religions, India p 529.

২। ইহার পক্ষে কোন রকম কিছু প্রমাণও আছে।

৩। যাঁহারা আত্মার অবিনাশিতা স্বীকার করেন, তাঁহাদিগের নিকট ইহার প্রামাণ্যতা অখণ্ডনীয়।

। যাঁহারা আত্মার অবিনাশিতা স্বীকার করেন না, এই তত্ত্ব তাঁহাদিগের নিকটও অশ্রদ্ধেয় হইতে পারে না, কেন না জাগতিক নিত্য নিয়মাবলীর সঙ্গে সঙ্গতিযুক্ত পরলোকবাদ আর কিছুই প্রচলিত নাই।

যিনি ভক্ত তাঁহার পক্ষে এ সকল বিচারের কোন প্রয়োজন নাই। যদি এই শ্লোকটিতে ঈশ্বরোক্তির মর্ম্ম থাকে তবে তাহাই তাঁহার বিশ্বাসের যথেষ্ঠ কারন। তাঁহার বিচার্য্য বিষয় এই যে, জন্মান্তরবাদ যাহা গীতায় আছে তাহা যথার্থ ঈশ্বরোক্তি, না গ্রন্থকারের বিশ্বাস মাত্র—তিনি আপনার বিশ্বাস ঈশ্বরবাক্য মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন?

যদি কাহারও এমন সংশয় উপস্থিত হয়, যে ইহা ভগবদুক্তি কি না, এবং উপরে যে সকল প্রমাণের উপরে সমালোচনা করা গেল, তাহাতে যদি জন্মান্তরে বিশ্বাসবান্ না হয়েন, তবে তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন জন্মান্তরে বিশ্বাস না করিলেও, এই গীতোক্ত ধর্ম্ম গ্রহণ করা যায় কি না?

ইহার উত্তর বড় সোজা। এই গীতোক্ত ধর্ম্ম সমস্ত মনুষ্যের জন্য। জন্মান্তরে যে বিশ্বাস করে, তাহার পক্ষে ইহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; যে না করে তাহার পক্ষেও ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। যে শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করে, তাহার পক্ষে ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; যে ভক্তি না করে, তাহার পক্ষেও ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, তাহার পক্ষে ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; যে ঈশ্বরে বিশ্বাস নাও করে তাহার পক্ষেও ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; কেন না চিত্তশুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সংযম অনীশ্বরবাদীর পক্ষেও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; সেই চিত্তশুদ্ধি এই গীতার উদ্দেশ্য। এরূপ বিশ্বলৌকিক ও সর্ব্বব্যাপক ধর্ম্ম আর কখন পৃথিবীতে প্রচারিত হয় নাই। যাঁহার যতটুকুতে অধিকার তিনি ততটুকু গ্রহণ করিবেন। যেখানে যাহার বিশ্বাস নাই, সেখানে সে অনধিকারী। যাঁহার যাহাতে অধিকার, তিনি তাহা ইহাতে পাইবেন।

বঙ্গে দশভুজা।

(বিজয়া দশমীর ছড়া।)

হরি হরি একি রঙ্গ বঙ্গের ভিতরে?—
সিংহের উপরে বামা রণবেশ ধ'রে,
মুক্তকেশী ত্রিনয়না—সর্প বাম করে—
দলিছে দনুজ-তনু চরণের ভরে!
হরি হরি একি রঙ্গ বঙ্গের ভিতরে?
বঙ্কিম গ্রীবার ভঙ্গি, নয়নে ভ্রূকুটি,
দশভুজা—ভয়ঙ্করা—হাতে শূলমুঠি;
বাঙালির ঘরে একি—নারী রণবেশ?
একি রঙ্গ বাঙ্গালায়—একি হ'ল দেশ?
রাঙা পায়ে জবাফুল—মাথায় কিরীট,
অসুরের কাঁধ তাহে শোভে যেন পীঠ;
দশভুজা প্রতিমায় বাঙ্গালা উজ্জ্বল!—
হরি হরি একি ভক্তি—বাঙালি কি হ'ল?
একি হেরি তব ঘরে—ও বাঙালি ভায়া?
জন্ম জন্ম সুখভোগ পেলে পদছায়া—
দাসবৃত্তি—রাজসেবা—যার হ'লে দয়া,
এ বামার পদতলে সে অসুর-কায়া?
একি রঙ্গ তব ঘরে—ও বাঙালি ভায়া?
ঘরে আছে ছেলে. মেয়ে, পিতা মাতা জরা,
গৃহলক্ষ্মী — 'পরিবার' — সর্ব্ব দুঃখ হরা!
ভাই, বন্ধু, শালী, শালা, ভগিনা, জামাই;
তাদের মমতা তবে ভুলিলে কি ভাই?
বাঙালির বীজমন্ত্র—'কভু অকস্মাৎ

রণবার্ত্তা শুনো যদি কাণে দিবে হাত'—
সে মন্ত্র তবে কি আজ কাণে নাহি ধরে?
দশভুজা পূজা কর গাঢ় ভক্তি ভরে?
হরি হরি একি রঙ্গ বঙ্গের ভিতরে?
ঘোটক দেখিলে যার পরাণে তরাস!
বাগান্ন পুরুষ যার রণে অনভ্যাস!
তার ঘরে রণরূপা মূর্ত্তি পরকাশ?
একি রঙ্গ বাঙ্গালায়—একি পরিহাস?
সিংহের উপরে বামা দর্পভরে হেলে,
চরণে অসুর-কায়া — সর্প বাঁধা গলে,
পদভরে সে অসুরে দলে জটা ধ'রে;—
হরি হরি একি রঙ্গ বঙ্গের ভিতরে?
কে তুমি গা—কোথা থেকে—কি ভেবে এখানে?
এ বেশে দিয়েছ দেখা—এ বঙ্গ-ভুবনে?
রহস্য দেখাতে দেশ পেলে না কি আর,
বঙ্গে এলে খুঁজে খুঁজে নিতে ভক্তিহার?—
মহামায়া তব মায়া বুঝে উঠা ভার!
হায় হায় চিরকাল বাঙালি বেচারা—
খায়, পরে, শোয়, দেয় 'অন্দরে' পাহারা!
ভাল মন্দ—যে যখন—দুটো খেতে দেয়,
তখনি গোলাম তার—পদধূলি নেয়!
সে কেন ও রাঙা পায়ে গন্ধপুষ্প দেয়?
হেথা, মা, তোর সিংহচড়া ভঙ্গি ছেড়ে দে;
এরা যদি ভজে তোমায়— মুটে হবে কে?
কে পিষিবে কালি কলম—কে দেবে জাঙাল?
ভুলাতে পারিবি না, মা,—শিক্ষা চিরকাল!
বাঙালির চির দিনই গোলামের হাল!
বুঝ না ভণ্ডামি, মা গো, হায় হায় হায়!

বঙ্গে দশভুজা।

অন্তরেতে পূজা এরা করে কি তোমায়?
হাড়ে হাড়ে চিরকাল ভক্তি যারে অতি,
তব কাছে সেই অসুরের হেন গতি!
ও পদে কভু কি হয় বাঙালির মতি?
অই শোনো দেশ যুড়ে উঠে কি উচ্ছ্বাস,
শোনো শোনো কলরব ফাটায় আকাশ—
'ত্বংহি মাতা, ত্বংহি পিতা, তব রাজ্যে বাস,
বরং দেহি—বরং দেহি—আমি অন্নদাস!'
হেথা, মা, তোর সিংহচড়া ভঙ্গি ছেড়ে দে;
এরা যদি পূজে তোমায়—দাস হবে কে?
কে পিষিবে কালি কলম—কে দেবে জাঙাল?
ভুলাতে পারিবি না, মা,—শিক্ষা চিরকাল!
বাঙালির চির দিনই গোলামের হাল!
'নমস্তস্যৈ,' নমস্তস্যৈ'—ওকি পুরোহিত?
জাননা কি যুগধর্ম্মে কিসে হিতাহিত?
কারে ব'ল 'নমস্তস্যৈ' বেদ তন্ত্র খুলে?
নমস্য কলিতে কেটা সেটা গেছ ভুলে?
রেখে দেও তোমার ও পাঁজি পুঁথি তুলে!
শুন পুরোহিত দ্বিজ—ছাড় হে ও পাঠ,
সে মন্ত্র উচ্চারো যা'তে মজে ভবনাট;
রায়, রায়বাহাদুর, রাজা, মহারাজা,
যাতে সিদ্ধ এবে পড় সেই মন্ত্র তাজা;
দূর কর বেদ তন্ত্র দেব দেবী পূজা!
ছাতা পড়া কতকেলে পুথিপাটা খুলে
কি হবে এখন আর চক্ষে ধূল দিলে?
কি হবে মাটীর সঙে বুকে মেরে খোঁচা?

রণ-ইতিহাসে বঙ্গ চিরকালই মোছা!
এ বঙ্গে গৃহীর ঘরে চণ্ডী-পড়া মিছা!
তাই বলি একি হেরি বঙ্গের ভিতরে?—
সিংহের উপরে বামা গ্রীবাভঙ্গি ক'রে,
দলিছে দনুজ-তনু চরণের ভরে,
একি রঙ্গ হরি হরি বঙ্গের ভিতরে?
নামো ত, মা ক্ষেপা মেয়ে শান্তবেশ ধ'রে;
রণবেশে এ শশ্মানে কেন সিংহ প'রে?—
পূজে না কেহই তোরে! ফিরে যা মা ঘরে—
এ খেপামি আর যেন বাঙালি না করে!
বিজয়াদশমীছড়া গাও ঘরে ঘরে॥

হাজারিবাগ,
১২৯৩ সাল বিজয়াদশমী।

সতীতেজ।

১। হিন্দু রমণীগণের কাছে সাবিত্রী সুন্দরী সতীত্বের আদর্শ; এই আদর্শ সমক্ষে রাখিয়া হিন্দুগণ ইহাই বুঝিয়াছিলেন যে যোগই বল আর ধর্ম্মই বল আর কর্ম্মই বল সতীত্বই স্ত্রীলোকের সব। অন্ধকার রজনীতে উপবাসক্লান্তা সাবিত্রী সুন্দরী মৃত স্বামীকে অঙ্কে স্থাপন করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন এবং যমরাজ সেই সতীর তেজে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার মৃত স্বামীর জীবন দান করিতেছেন এই চিত্র মনে থাকিলেই অঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠে এবং মন ভক্তিরসে আপ্লুত হয়।

"লোকমাতা সতীস্ত্রীগণ এই সসাগরা পৃথিবীরে ধারণ করিতেছেন। মহাভারতে এইরূপ কথা উল্লিখিত আছে। বাস্তবিকই একটু ভাবিয়া দেখিলে এই কথাটি যে সম্পূর্ণ সত্য ইহা বেশ বুঝা যায়। সমাজের বর্ত্তমান

অবস্থা আলোচনা করিয়া দেখ, প্রাচীন সমাজের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখ, তাহা হইলে ইহাই দেখিতে পাইবে সতীর প্রণয় আশ্রয় করিয়াই পৃথিবীতে ধর্ম্ম স্থাপিত রহিয়াছে এবং সতীর ক্রোধ হইতেই অধর্ম্মের, বিনাশ সম্পাদিত হইতেছে। রামায়ণ এবং মহাভারতের ইতিহাসের ভিতর এই সত্যটি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করা আছে। পাপাত্মা দুঃশাসন কর্ত্তৃক অপমানিতা সতী দ্রৌপদীর ক্রোধাগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া পাপনিরত দুর্য্যোধনকে সবংশে ধ্বংস করিয়াছিল এই টুকু মহাভারতের ধর্ম্মালোচনার সার; মহা পরাক্রান্ত অতুল বিভবশালী লঙ্কাধিপতি, সতীর অবমাননা করিয়া সবংশে নিহত হইয়াছিল, এই টুকু রামায়ণের ভিতরকার আসল কথা, বলিয়া বুঝি। যেখানে সতীর আদর ধর্ম্ম সেইখানে প্রতিষ্ঠিত, যেখানে সতীর আদর নাই সেইখানেই নানারূপ অধর্ম্ম আশ্রয় লইয়া থাকে। সতীর অবমাননায় অধর্ম্মের মাত্রা পূর্ণ হয়।

পুরাণে শুম্ভ নিশুম্ভ বধ যেরূপ বর্ণনা আছে তাহার ভিতরে ইহাই দেখিতে পাই যে যে দিন পাপিষ্ঠরা সতীর অবমাননা করিতে উদ্যত হইল সেই দিনই তাহাদের অধর্ম্মের মাত্রা পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং অবমানিতা সতীর তেজে পাপিষ্ঠরা শীঘ্রই বিনষ্ট হইল।

প্রাচীন ইতিহাসের কথা ছাড়িয়া দিয়া নূতন ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। এই বাঙ্গালার ইতিহাস হইতে ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে দিন হইতে সিরাজউদ্দৌল সতীর উপর অত্যাচার আরম্ভ করেন সেই দিনে তাঁহার অধর্ম্ম পূর্ণ হইয়া উঠিল, এবং সেই সিরাজউদ্দৌলা হইতেই মুসলমানরাজত্ব বাঙ্গালা হইতে ক্রমে ভারতবর্ষ হইতে লোপ পাইল।

যাঁহারা সতীর আদর বুঝিয়াছেন, যাঁহারা সতীর অবমাননায় আপনাদিগকে অপমানিত জ্ঞান করেন, ধর্ম্ম তাঁহাদেরই আশ্রয় করিয়া থাকে। যাঁহারা দেশের শ্রীবৃদ্ধি খুঁজেন তাঁহারা যেন সতীর আদর করিতে শিখেন। সতীতেজ যাহাতে দেশে পুনরাবির্ভূত হয় সেই বিষয়ে সকলে যেন সচেষ্ট থাকেন; আমাদের দেশে আজ কাল আর সতীর আদর তেমন নাই তাই সতীতেজ নিস্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে। তাই আমরা আজ পরাধীন।

আমাদের দেশের রমণীগণের সতীতেজ নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে তাই হেম বাবুর উন্মাদিনী বলিয়াছে

"সুখে থাকে তারা সুখে থাকে ঘরে
পতিপদতল বক্ষঃস্থলে ধরে
বিবাহিতা নারী, সখের খেলনা
খায় দায় পরে নাহিক ভাবনা
জানে না ভাবে না প্রণয় কেমন
প্রাণের বল্লভ পতি কিবা ধন
ইহারাই সতী; বিঘত প্রমাণ
আশা ধরি স্নেহ ইহাদের প্রাণ,
নারীর মাহাত্ম্য রমণীর মন
কত যে গভীর ভাবে কতজন
প্রণয় কি ধন নারীর তরে?"

তোমরা সকলে সাবিত্রী সতীর আরাধনা করিতে শিখ তবেই সতীতেজে তোমাদের রমণীগণ উজ্জল প্রভাশালী হইয়া উঠিবে তবেই ধর্ম্ম কি পদার্থ তাহা তোমরা বুঝিতে পারিবে। সাবিত্রী সত্যবানকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। আমিও ইহাই বুঝি যে যিনি সত্যবান্ সাবিত্রী দেবী তাঁহার গৃহেই আবির্ভূতা হইয়া থাকেন। পুরুষগণ তোমরা যদি সত্যবান্ হও তবে নিশ্চয়ই তোমরা আপন আপন পার্শ্বে সতী সাবিত্রীকে দেখিতে পাইবে।

২। সাবিত্রী একটি আদর্শ। এরূপ এক একটি আদর্শ এক একটি দেবতা। আদর্শানুযায়ী মনুষ্য গড়িয়া লওয়ার নামই দেব আরাধন। আদর্শচিত্রে প্রগাঢ় ভক্তি না থাকিলে মনুষ্যের দেবারাধনারূপ কর্ম্মে একাগ্রতা থাকে না এবং কর্ম্মও সফল হয় না। সুতরাং যদি সতী দেবীর আরাধনা করিতে চাও তবে সতী নামে প্রগাঢ় ভক্তি সংস্থাপন করিতে শিখ। তাহার পর 'তৎত্বমসি' বেদের এই মহাবাক্য অবলম্বনে দেবারাধনা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও। এইরূপ পূজা পদ্ধতি অবলম্বনে কর্ম্ম আরম্ভ করিলে সাবিত্রী শক্তি তোমার ঘরে আবির্ভূতা হইবেন।

"তৎ ত্বম্ অসি" অর্থাৎ তুমিই সেই, এই কথাটি ভালবাসা শিক্ষার মূল

মন্দ বলিয়া বুঝ। কল্পনাপটে চিত্রিত যে আদর্শকে বড় সুন্দর বলিয়া বুঝিয়া, তাহাকে ভাল বাসিয়াছ, বাহিরের কোন মনুষ্যে সেই ভালবাসা ন্যস্ত করিতে শিখার নাম ভালবাসা শিক্ষা। কর্ম্মসূত্রে যাহার সহিত বদ্ধ থাকায় যাহাকে জীবনের চিরসঙ্গিনী করিবে স্থির করিয়াছ তাহাকে সাবিত্রী সদৃশী সতীতেজে তেজস্বিনী করিয়া লওয়াই তোমার প্রথম কর্ত্তব্য কর্ম্ম। "তৎত্বমসি" অর্থাৎ 'তুমিই সেই সাবিত্রী' সহধর্ম্মিণীকে এই জ্ঞান করিয়া ভক্তিভাবে, স্নেহভাবে ভালবাসিতে শিখ। যাহার সঙ্গে একত্রে থাকা যায় তাহাকে ভাল ভাবিতে ভাবিতে সে ভাল হইয়া দাঁড়ায়, তাহাকে মন্দ ভাবিতে ভাবিতে সে মন্দ হইয়া দাঁড়ায়। তোমার সহধর্ম্মিণীকে যদি তোমার আদর্শ রমণীর ন্যায় দেখিতে শিখ তবে ক্রমে ক্রমে তোমার সঙ্গিনী সেই আদর্শ রমণীর অনুরূপ হইয়া উঠিবে। যদি তাহা না হয় তবে তোমার ভালবাসার জোর নাই—বুঝিও। তোমার আদর্শ রমণী সম্মুখে থাকিলে তাহার সহিত তুমি যে অবস্থায় যেরূপ ভালবাসামাখা কথা কহিতে, যেরূপ ভালবাসামাখা আচার ব্যবহার করিতে, তোমার সঙ্গিনীর সহিত যদি ঠিক সেই সেই অবস্থায় সেইরূপ কথাবার্ত্তা সেইরূপ আচার ব্যবহার কর তবে তোমার ভালবাসার গুণে ও তোমার কথাবার্ত্তার গুণে বদ্ধ হইয়া তোমার সঙ্গিণী তোমাতে এরূপ আকৃষ্ট হইবেন যে তখন তুমি তাঁহাকে সহজেই নিজের মনের মত করিয়া গড়িয়া লইতে পারিবে।

এখন একটি কথা আছে। যাহাকে মন্দ বলিয়া বুঝিতেছি তাহাকে ভাল ভাবিয়া তাহার সহিত সেই রকম কথাবার্ত্তা কহাটা কপটাচার কি না? যেখানে সত্য সেই খানেই ধর্ম্ম; যেখানে মিথ্যা সেই খানেই অধর্ম্ম। সুতরাং মন্দকে ভাল ভাবা যদি মিথ্যা হয়, তবে সে রূপ কাজে অধর্ম্ম আছে। ইহার উত্তরে আমি এই কথা বলি যে মন্দকে ভাল ভাবা কখনই কর্ত্তব্য নহে। মন্দকে মন্দ বলিয়াই বুঝিতে হইবে; কিন্তু ইহা সকলেরই জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে আসলে মানুষ কখনও মন্দ নয়। মানুষে যখন যাহা মন্দ দেখিতে পাই তাহা ময়লা মাত্র; সেই ময়লা পরিষ্কার করিতে পারিলেই মানুষের স্বাভাবিক পবিত্রতা প্রকাশ পায়। তুমি যাহাকে মন্দ বলিয়া বুঝিতেছ বাস্তবিক সেই মনুষ্য বড় পবিত্র বড় সুন্দর, তোমার ভালবাসার জলে সেই ময়লা ধৌত

করিয়া লইলেই দেখিতে পাইবে যে ভিতরকার মানুষ বড়ই পবিত্র বড়ই সুন্দর। কাদা মাখা ঝিনুকের ভিতর মুক্তা আছে এটি যিনি জানেন তিনি কাদা মাখা ঝিনুকেরও আদর বুঝেন। মানুষের বাহিরে মলা দেখিয়াই মানুষকে ঘৃণা করিও না, পাপকে ঘৃণা করিও কিন্তু পাপীকে ঘৃণা করিও না। মহাভারতে এইরূপ কথা আছে যে স্ত্রীলোক মাত্রেই সতীদেবীর অংশ এবং পুরুষমাত্রেই অনঙ্গ-বিজয়ী ঊর্দ্ধলিঙ্গ মহাদেবের অংশ। এই কথাটির মর্ম্ম বুঝিয়া 'তত্ত্বমসি' মহা মন্ত্র সাধনা করিতে শিখ তাহা হইলেই ভালবাসার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিবে।

৩। স্ত্রীলোকের সতীত্ব এবং পুরুষের সত্যাবস্থা এক সঙ্গে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। যেখানে স্ত্রী সতী সেই খানে স্বামী সত্যবান্ হইতে থাকেন এবং যেখানে স্বামী সত্যবান্ সেই খানে স্ত্রী সতীতেজে ভূষিতা হন। সুতরাং যিনি স্ত্রীকে সতীতেজে প্রদীপ্ত করিতে ইচ্ছা করেন তিনি যেন সত্যের আদর্শানুযায়ী নিজের চরিত্র গঠন করিতে সদাই সচেষ্ট থাকেন। 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের বলে শিষ্যা স্ত্রীকে উন্নতা করিতে হইবে এবং 'সোঽহং' অর্থাৎ 'সেই আদর্শপুরুষই আমি,' এই ভাবিয়া নিজের অন্তঃকরণকে সেই আদর্শ-পুরুষের মনের ন্যায় সুন্দর করিতে হইবে।

যখন দেখিবে যে তোমার ভালবাসার আধারের কাছে তোমার অন্তরের ভাবসমূহ যথাবৎ প্রকাশ করিতে তোমার আগ্রহতা জন্মিয়াছে কোন বিষয় গোপন করিবার ইচ্ছা কখনও হয় না তখনই জানিও যে তোমার ভালবাসা পরিপক্কতা পাইয়াছে। যিনি নিজের মনের ভাব অকপটে যথাবৎ বাহিরে প্রকাশ করিয়া থাকেন তিনিই যথার্থ সত্যবান। স্বামীর প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইতেই স্ত্রীর হৃদয়ে সতীত্ব ধর্ম্ম প্রকাশ পায়; স্বামী সত্যের সাহায্যে এই বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারেন। সত্য আর সতীত্ব এই দুটির যোগই প্রধান যোগ। যেখানে এই যোগ ঘটিয়াছে ধর্ম্মভাব সকল সেই খানে হৃদয়ে আপনা আপনি ফুটিতে থাকে। অর্দ্ধনারীশ্বর মহাদেবের সহিত অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী পার্ব্বতীর মিলনই পবিত্র যোগ। একাত্মা পঞ্চপাণ্ডবের সহিত দ্রুপদ দুহিতার মিলন এই প্রকারের যোগ; এই যোগ হইতে যে সকল ধর্ম্মভাব ফুটিয়াছিল সেই সকল কথাই মহাভারতের নিষ্কাম ধর্ম্মের দৃষ্টান্তস্বরূপ।

৪। সত্য কাহাকে বলে? ভ্রান্তি সত্যের বিপরীত; ভ্রান্তির সহিত যুদ্ধ করিতে যিনি দৃঢ় সংকল্প তাঁহারই আচরণকে সত্যাচার কহে। যিনি নিজের ভ্রম দূর করিতে সতত সচেষ্ট এবং যিনি কখনও অপরকে ভ্রমে ফেলিবার ইচ্ছা করেন না তিনিই সত্যবান। 'সত্য বাক্য' কথাটির দুই প্রকার অর্থে প্রয়োগ আছে; যাহা যেমন দেখিয়াছি যেমন শুনিয়াছি বাহিরে ঠিক সেইরূপ বলার নাম সত্য বাক্য প্রয়োগ এবং যে কথা কহিব যে প্রতিজ্ঞা করিব সেই কথা, সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার নামও সত্য বাক্য প্রয়োগ। পূর্ব্বে সত্য কথাটির যে অর্থ দেওয়া হইয়াছে সেই মুখ্য অর্থ হইতেই 'সত্য' কথাটির এই দুই প্রকার অর্থ দাঁড়াইয়াছে। আমি যাহা যেরূপ দেখিয়াছি যেরূপ শুনিয়াছি অন্যকে তাহা না বলিয়া যদি অন্যরূপ বলি তবে সেই অন্য লোককে ইচ্ছা-পূর্ব্বক একটি ভ্রমে ফেলা হইল। আমি যদি এক জনকে বলি যে কাল তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব, তবে সে ব্যক্তি আমার জন্য অপেক্ষা করিবে। কেননা সে বুঝিয়াছে যে আমি তাহার সহিত কল্য সাক্ষাৎ করিব, তাহার পর আমি যদি আমার কথা মত কার্য্য না করি তবে সেই লোককে একটি ভুল বুঝাইয়া দিলাম বলিতে হইবে।

অপরকে কখনও ভ্রমে ফেলিও না; কেননা কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের নিয়ম অলঙ্ঘনীয়, তুমি যদি একজনকে ভ্রমে ফেলিয়া থাক তবে তোমাকেও এক দিন না এক দিন ভ্রমে পড়িতে হইবে। ভ্রান্তিই মনের মলা। যেখানে ভ্রান্তি দেখিতে পাইবে সেইখান হইতেই সেই মলা ঘুচাইবার চেষ্টা করিবে তবেই ক্রমশঃ সুন্দর হইতে পারিবে।

ছোট খাট রকম দুই একটা মিথ্যা কহিতে দোষ কি? আমি যদি অপর কাহাকেও দুই একটা ছোট রকমের ভ্রমে ফেলিয়া থাকি তবে আমিও না হয় দুই একবার ছোট রকমের ভ্রমে পতিত হইব তাহাতে আর বেশী ক্ষতি কি? যদি কেহ ওরূপ কথা বলেন তবে তাহার উত্তর এই। সত্য এই কথাটির উপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মানই সত্যাচারী হইবার প্রধান উপায়; চিত্তের গঠন এতদূর উন্নত করিয়া লওয়া চাই যে অসত্য ব্যবহার মনে থাকিলেই যেন মন সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে; যাঁহার অন্তর এইরূপ পবিত্র হইয়াছে তিনি ছোটখাট মিথ্যা ব্যবহারেও আপনা হইতেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়েন। সত্য মিথ্যা

বিচার করিয়া তাঁহাকে সত্যাচারে প্রবৃত্ত হইতে হয় না। তাঁহার অন্তরের মানুষ তাঁহাকে যাহা সত্য সেই কার্য্যেই উত্তেজিত করে এবং যাহা অসত্য সেই কার্য্য হইতে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করে। সুতরাং 'সত্য' এই কথাটির উপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা সংস্থাপন করিয়া যাহা সৎ তাহারই দিকে অগ্রসর হইতে শিখা কর্ত্তব্য। মনের মলা পরিষ্কার করিতে পারিলে অন্তরে যে উজ্জ্বল জ্ঞানালোক প্রকাশ পায় সেই আলোকটির নামই সৎ। এই আলোক যথাবৎ বাহিরে প্রকাশ করিবার চেষ্টার নাম সত্যাচার। সৎ পদার্থের ভাবকে সত্য বলা যায়। সৎ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ সতী নামে এই সতীর ভাবকে সতীত্ব বলে।

৫। ক্রমাভিব্যক্তি* (Evolution) এই জগতের নিয়ম। এই নিয়মের বশে যে সৌন্দর্য্য অব্যক্তভাবে আছে তাহাই ক্রমে ক্রমে ব্যক্তভাবে প্রকাশ পাইতেছে। লোহা ও ইস্পাতের সংঘর্ষণে যেমন অব্যক্ত অগ্নি ব্যক্তভাবে প্রকাশ পায় সেইরূপ স্ত্রীজাতি ও পুরুষজাতির সম্মিলনে জগতের অব্যক্ত সৌন্দর্য্য ক্রমে ক্রমে বাহিরে প্রকাশ পাইয়া থাকে। স্ত্রীচিত্ত সৌন্দর্য্যগ্রাহী; যেখানে সৌন্দর্য্যের আধিক্য স্ত্রীচিত্ত সেই দিকেই আকৃষ্ট হয়। এবং স্ত্রীজাতিকে আকর্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে অব্যক্ত সৌন্দর্য্যকে ব্যক্তভাবে প্রকাশ করিবার আগ্রহতাই পুরুষচিত্তের লক্ষণ। ক্রমাভিব্যক্তি তথ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য পণ্ডিতবর ডারউইন ইতর জীব জন্তু সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন, যে ইতর জীব জন্তুগণের মধ্যে পুরুষজাতি স্ত্রীজাতি অপেক্ষা, অধিকতর সুন্দর। কোকিলের স্বর যেমন সুন্দর, কোকিলার স্বর তেমন নয়, ময়ূরের পুচ্ছ যেরূপ সুন্দর বর্ণে চিত্রিত ময়ূরীর সেরূপ নহে, সিংহের কেশর কেমন সুন্দর কিন্তু সিংহীর কেশর নাই, কুক্কুটের ঝোটন কেমন সুশ্রী কিন্তু কুক্কুটীর ঝোটন নাই। এইরূপ হইবার কারণ কি? স্ত্রীজাতিকে আকর্ষণ করিবার জন্য সুন্দর হইবার আগ্রহতা থাকা নিবন্ধন পুরুষজাতি সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতে সচেষ্ট থাকে এবং সেই উদ্দেশে কার্য্য করিয়া থাকে। পুরুষজাতির মধ্যে যে গুলিতে অধিকতর সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায় স্ত্রীজাতি তাহাদের দ্বারাই আকৃষ্ট হয়। এই পুরুষ-

---

* শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় Evolution কথাটির এই বাঙ্গালা নাম দিয়াছেন।

গুলির সৌন্দর্য্যটুকু আবার তাহাদিগের পুরুষসন্ততিতে প্রকাশ পায়; এই পুরুষ সন্তানগণ আবার আরও অধিকতর সৌন্দর্য্য অভিব্যক্ত করিতে সচেষ্ট থাকে, এইরূপে সৌন্দর্য্য পুরুষগণেই অধিকমাত্রায় অভিব্যক্ত। কোকিলা কোকিলের স্বরের সৌন্দর্য্যগ্রাহিনী, তাই কোকিলের স্বর সুন্দর; ময়ূরী ময়ূরের পুচ্ছের শোভার সৌন্দর্য্যগ্রাহিনী তাই ময়ূরের পুচ্ছ সুন্দর।

জীবজন্তুগণের মধ্যে স্ত্রীজাতি ও পুরুষজাতির মধ্যে যেরূপ প্রভেদ বলা হইল মনুষ্য জাতির ভিতরেও স্ত্রী ও পুরুষের ভিতর ঐরূপ স্বাভাবিক বৈলক্ষণ্য আছে। ইতর জন্তুদের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষের যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তাহা বুদ্ধির অধীন নয় কিন্তু মনুষ্যে বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশ পাইয়াছে, সুতরাং মনুষ্যের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষের যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ স্বাভাবিক প্রকৃতি আছে তাহা বুদ্ধিবৃত্তির অধীন করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। স্ত্রীলোকে সৌন্দর্য্য ভালবাসে, এবং পুরুষ স্ত্রীলোকের জন্য সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতে চায়। দুজনের এই দুটি ভাবের সঙ্গে প্রকৃত সৌন্দর্য্য কি সেইটি বুঝিয়া স্ত্রী ও পুরুষে মিলিত হইতে পারিলেই ধর্ম্মচর্চ্চার পথ পরিষ্কার হইয়া পড়ে। অর্থাৎ অব্যক্ত সৌন্দর্য্য সহজে বাহিরে অভিব্যক্ত হইতে পারে।

অব্যক্ত সৌন্দর্য্য বাহিরে অভিব্যক্ত করা প্রকৃতির কাজ। প্রকৃতির এই কাজে সহায়তা করাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং তাহাই ধর্ম্ম।

স্ত্রীলোকে সৌন্দর্য্য ভালবাসে এবং যেখানে সৌন্দর্য্যের আধিক্য সেইখানেই আকৃষ্ট হইয়া থাকিতে ভালবাসে; পুরুষও স্ত্রীজাতিকে আকর্ষণ করিতে ভালবাসে এবং যাহার মন যত আকৃষ্ট হয়, যাহার মনে তাহার সৌন্দর্য্য যত দৃঢ়াঙ্কিত হয় পুরুষ তাহাতেই তত অনুরক্ত হয়। The fittest would survive অর্থাৎ কালের বশে যাহা কিছু নিকৃষ্ট সব নষ্ট হইয়া যাইবে কেবল যাহারা শ্রেষ্ঠ তাহারাই বজায় থাকিবে। স্ত্রীলোকের ও পুরুষের অন্তরে যে দুইটি ভাবের বীজ নিহিত আছে বলা হইয়াছে তাহা যখন সম্যক্ প্রস্ফুটিত হইবে তখন সুন্দর পুরুষ ব্যতীত নিকৃষ্ট পুরুষ থাকিবে না এবং যে স্ত্রীচিত্তে সৌন্দর্য্য এরূপ দৃঢ়াঙ্কিত থাকে যে সেই আঁক কিছুতেই মোছা যায় না সেইরূপ স্ত্রী ভিন্ন অপরা স্ত্রী থাকিবে না। ভবিষ্যতে যাহা থাকিবে অব্যক্ত ভাবে তাহারই বীজ বর্ত্তমান আছে—তাহাই সৎ ও সতী।

৬। লোকলজ্জা ভয়ে, সমাজের ভয়ে, অথবা ধর্ম্মের ভয়ে অথবা পরকালের ভয়ে অনেক সুন্দরী পর পুরুষের মুখ পর্য্যন্ত দেখেন না কিন্তু তাই হইলেই সতী হয় না। যে রমণী যথার্থ সৌন্দর্য্যগ্রাহী, যাঁহার মনে কোন উন্নতমনা পুরুষের মানসিক সৌন্দর্য্য এরূপ দৃঢ়াঙ্কিত যে তাহা মন হইতে কিছুতেই দূর হইবার নহে, যিনি তাঁহার সেই মনের মতন পুরুষ ভিন্ন অন্য কাহারও সহিত মিলিতা হইতে চান না সেই সৌন্দর্য্যভক্তা স্ত্রীকেই সতী বলিতে পারা যায়। এক কথায় যাঁহার ভক্তি অচলা তিনিই সতী। স্বামীর সৌন্দর্য্য যিনি বুঝেন নাই তিনি কখন স্বামীভক্ত হইতে পারিবেন না, কেন না যেখানে সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই না সেখানে কি জোর জবরদস্তি করিয়া বা সমাজের ভয়ে দৃঢ়াভক্তি থাকিতে পারে? জ্ঞানের সাহায্যে স্বামীর ভিতর যে সৌন্দর্য্য আছে তাহা বুঝিতে যিনি চেষ্টা করিবেন তিনিই দেখিতে পাইবেন যে তাঁহার স্বামীর ভিতরেই সেই সত্য শিব সুন্দরের সৌন্দর্য্য নিত্য বিরাজমান রহিয়াছে। তখনই তিনি অচলা স্বামীভক্তি কি তাহার আস্বাদন পাইবেন। পতি যদি তাঁহার স্ত্রীকে নিজের অন্তরের পবিত্র পুরুষমূর্ত্তি দেখাইতে সতত সচেষ্ট থাকেন তবেই তিনি সত্যবান্ হইয়া স্ত্রীকে সতীতেজে প্রদীপ্তা করিতে সক্ষম হইবেন।

৭। যিনি সামান্য ইন্দ্রিয় সুখভোগে মুগ্ধ, তিনি সতীত্ব বা সত্য কাহারও উপাসক হইতে সক্ষম হন না। যিনি ইন্দ্রিয়-সুখে আসক্ত তিনি মানুষের ভিতরকার স্থির সৌন্দর্য্য কিরূপ তাহা বুঝিতে সক্ষম হন না। ইন্দ্রিয় সুখভোগের ইচ্ছা থাকিলে মনে যে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় সেই চাঞ্চল্য নিবন্ধন প্রকৃত সৌন্দর্য্য কি তাহা মানুষে বুঝিতে পারে না; বাহিক অসুন্দর বিষয়ে আকৃষ্ট হয়; পতি নিজেকে চিনিতে পারে না এবং স্ত্রীও স্বামীকে চিনিতে পারে না। দম গুণ না থাকিলে কেহই সতী বা সত্যবান্ হইতে সক্ষম হন না। হরপার্ব্বতীর মিলনের পূর্ব্বে মদন ভস্মীকৃত হইয়াছিল; পার্ব্বতীর প্রতিজ্ঞা মহাদেব ব্যতীত অন্য বর চাই না, তিনি সেই কামনায় ঘোরতর তপস্যায় নিযুক্ত হইয়া তপঃপ্রভাবে মহাদেবের মন তৎপ্রবণীকৃত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

সতীত্ব ও সত্য সম্বন্ধে আমার যাহা বলিবার আছে তাহা কিছুই

বলা হইল না। সতীত্ব ও সত্য এই দুটি কথার আদর যতই বাড়িবে পৃথিবীর ততই শ্রীবৃদ্ধি এই সত্যটি এত গভীর বলিয়া বোধ হয় যে সেই গভীরতা প্রকাশ করিবার ভাষা যেন নাই। যাহা হউক উপসংহার এই একান্ত কামনা যে আমার এই কথা গুলি আমাদের সমাজে যেন একেবারে হতাহত না হয়। যদি একজনও এই কথা গুলি লইয়া একদিনও একটু স্থিরচিত্তে ভাবেন তবেই আমার এই লেখাটির সার্থকতা সিদ্ধ হইবে।

সীতারাম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

রাজার কথা শ্রী সব শুনিল, শ্রীর কথা রাজা সব শুনিলেন। যেমন করিয়া, সর্ব্বত্যাগী হইয়া সীতারাম শ্রীর জন্য পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, সীতারাম তাহা বলিলেন শ্রী আপনার কথাও কতক কতক বলিল, সকল বলিল না।

তার পর, শ্রী জিজ্ঞাসা করিল,

"এখন আমাকে কি করিতে হইবে?"

প্রশ্ন শুনিয়া সীতারামের চক্ষে জল আসিল! চিরজীবনের পর স্বামিকে পাইয়া, জিজ্ঞাসা করিল কি না, এখন আমাকে কি করিতে হইবে? সীতারামের মনে হইল, উত্তর করেন, "কড়িকাঠে দড়ি ঝুলাইয়া দিবে, আমি গলায় দিব।"

তাহা না বলিয়া সীতারাম বলিলেন, "আমি আজ পাচ বৎসর ধরিয়া আমার মহিষী খুঁজিয়া বেড়াইয়াছি। এখন তুমি আমার মহিষী হইয়া রাজপুরী আলো করিবে।"

শ্রী। মহারাজ! নন্দার প্রশংসা বিস্তর শুনিয়াছি। তোমার সৌভাগ্য যে তুমি তেমন মহিষী পাইয়াছ। অন্য মহিষীর কামনা করিও না।

সীতা। তুমি জ্যেষ্ঠা। নন্দা যেমন হোক, তোমার পদ তুমি গ্রহণ করিবে না কেন?

শ্রী। যে দিন, তোমার মহিষী হইতে পারিলে আমি বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীও হইতে চাহিতাম না, আমার সে দিন গিয়াছে।

সীতারাম। সে কি? কেন গিয়াছে! কিসে গিয়াছে?

শ্রী। আমি সন্ন্যাসিনী; সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছি।

সীতারাম। পতিযুক্তার সন্ন্যাসে অধিকার নাই। পতি সেবাই তোমার ধর্ম্ম।

শ্রী। যে সব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে, তাহার পতিসেবাও ধর্ম্ম নহে, দেবসেবা ও তাহার ধর্ম্ম নহে।

সীতা। সর্ব্ব কর্ম্ম কেহ ত্যাগ করিতে পারে না; তুমিও পার নাই। গঙ্গারামের জীবন রক্ষা করিয়া কি তুমি কর্ম্ম করিলে না? আমাকে দেখা দিয়া তুমি কি কর্ম্ম করিলে না?

শ্রী। করিয়াছি, কিন্তু তাহাতে আমার সন্ন্যাস ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইয়াছে। একবার ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছে বলিয়া এখন চিরকাল ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট হইতে বল?

সীতা। স্বামী-সহবাস স্ত্রীজাতির পক্ষে ধর্ম্মভ্রংশ এমন কুশিক্ষা তোমায় কে দিলে? সেই দিক্, ইহার উপায় আমারই হাতে আছে। আমি তোমার স্বামী, তোমার উপর আমার অধিকার আছে। সেই অধিকার বলে, আমি তোমাকে আর যাইতে দিব না।

শ্রী। তুমি স্বামী, আর তুমি রাজা। তা ছাড়া তুমি উপকারী, আমি উপকৃত। অতএব তুমি যাইতে না দিলে, আমি যাইতে পারিব না।

সীতা। আমি স্বামী, আমি রাজা আর আমি উপকারী, তাই আমি যাইতে না দিলে তুমি যাইতে পারিবে না। বলিতেছ না কেন, যে আমি তোমায় ভালবাসি, তাই আমি ছাড়িয়া না দিলে তুমি যাইতে পারিবে না? স্নেহের সোণার শিকল কাটিবে কি প্রকারে?

শ্রী। মহারাজ, সে ভ্রমটা এখন গিয়াছে। এখন বুঝিয়াছি, যে ভালবাসে, ভালবাসায় তাহার ধর্ম্ম এবং সুখ আছে। কিন্তু যে ভালবাসা পায়, তাহার তাতে কি? তুমি মাটির ঠাকুর গড়িয়া, তাহাকে পুষ্প-চন্দন দাও তাহাতে তোমার ধর্ম্ম আছে, সুখ ও আছে, কিন্তু তাহাতে মাটির পুতুলের কি?

সীতা। কি ভয়ানক কথা!

শ্রী। ভয়ানক নহে—অমৃতময় কথা। ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন। ঈশ্বরে প্রীতিই জীবের সুখ বা ধর্ম্ম। তাই সর্ব্বভূতকে ভাল বাসিবে। কিন্তু ঈশ্বর নির্ব্বিকার, তাঁর সুখ দুঃখ নাই। ঈশ্বরের অংশ স্বরূপ যে আত্মা জীবে আছেন, তাঁহারও তাই। ঈশ্বরে অর্পিত যে প্রীতি, তাহাতে তাঁহার সুখ দুঃখ নাই। তবে যে, কেহ ভালবাসিলে আমরা সুখী হই, সে কেবল মায়ার বিক্ষেপ।

সীতা। শ্রী! দেখিতেছি কোন ভণ্ড সন্ন্যাসীর হাতে পড়িয়া তুমি স্ত্রী-বুদ্ধি বশতঃ কতকগুলা বাজে কথা কণ্ঠস্থ করিয়াছ। ও সকল স্ত্রীলোকের পক্ষে ভাল নহে। ভাল যা, তা বলিতেছি, শুন। আমি তোমার স্বামী, আমার সহবাসই তোমার ধর্ম্ম; তোমার ধর্ম্মান্তর নাই। আমি রাজা, সকলেরই ধর্ম্ম রক্ষা আমার কর্ম্ম। এবং স্বামিরও কর্ত্তব্য কর্ম্ম যে স্ত্রীকে ধর্ম্মানুবর্ত্তিনী করে। অতএব তোমার ধর্ম্মে আমি তোমাকে প্রবৃত্ত করিব। তোমাকে যাইতে দিব না।

শ্রী। তা বলিয়াছি, তুমি স্বামী, তুমি রাজা, তুমি উপকারী। তোমার আজ্ঞা শিরোধার্য্য। কেবল আমার এই টুকু বলিয়া রাখা, যে আমা হইতে তুমি সুখী হইবে না।

সী। তোমাকে দেখিলেই আমি সুখী হইব।

শ্রী। আর এক ভিক্ষা এই, যদি আমাকে গৃহে থাকিতে হইল, তবে আমাকে এই রাজপুরী মধ্যে স্থান না দিয়া, আমাকে একটু পৃথক কুটীর তৈয়ার করিয়া দিবেন। আমি সন্ন্যাসিনী, রাজপুরীর ভিতর আসিও সুখী হইব না, লোকে আপনাকে উপহাস করিবে।

সী। আর কুটীরে রাজমহিষীকে রাখিলে লোকে উপহাস করিবে না কি?

শ্রী। রাজমহিষী বলিয়া কেহ নাই জানিল।

সী। আমার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হইবে না কি?

শ্রী। সে আপনার অভিরুচি।

সী। তোমার সঙ্গে আমি দেখা শুনা করিব, অথচ তুমি রাজমহিষী নও; লোকে তোমাকে কি বলিবে জান?

শ্রী। জানি বৈকি? লোকে আমাকে রাজার উপপত্নী বিবেচনা করিবে। মহারাজ! আমি সন্ন্যাসিনী,—আমার মান অপমান কিছুই নাই। বলে বলুক না। আমার মান অপমান আপনারই হাতে।

সী। সে কি রকম?

শ্রী। আমি তোমার সহধর্ম্মিণী—আমার সঙ্গে ধর্ম্মাচরণ ভিন্ন অধর্ম্মাচরণ করিও না। ধর্ম্মার্থে ভিন্ন যে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি তাহা অধর্ম্ম ইন্দ্রিয় তৃপ্তি পশুবৃত্তি। পশুবৃত্তির জন্য বিবাহের ব্যবস্থা দেবতা করেন নাই। পশু দিগের বিবাহ নাই। কেবল ধর্ম্মার্থেই বিবাহ। রাজর্ষিগণ কখন বিশুদ্ধ চিত্ত না হইয়া সহধর্ম্মিণীর সহবাস করিতেন না। ইন্দ্রিয়বশ্যতা মাত্রই পাপ। আপনি যখন নিষ্পাপ হইয়া, শুদ্ধচিত্তে আমার সঙ্গে আলাপ করিতে পারিবেন, তখন আমি এই গৈরিক বস্ত্র ছাড়িব। যতদিন আমি এ গেরুয়া না ছাড়িব, ততদিন মহারাজ! তোমাকে পৃথক আসনে বসিতে হইবে।

সী। আমি তোমার প্রভু, আমার কথাই চলিবে।

শ্রী। একবার চলিতে পারে, কেন না তুমি বলবান্। কিন্তু আমারও এক বল আছে। আমি বনবাসিনী, বনে আমরা অনেক প্রকার বিপদে পড়ি। এমন বিপদ ঘটিতে পারে যে তাহা হইতে উদ্ধার নাই। সে সময়ে আপনার রক্ষার জন্য আমরা সঙ্গে একটু বিষ রাখি। আমার নিকট বিষ আছে—আবশ্যক হইলে খাইব।

হায়! এ শ্রী ত সীতারামের শ্রী নয়।

নবম পরিচ্ছেদ।

সীতারাম তাহা বুঝিয়াও বুঝিলেন না। মন কিছুতেই বুঝিল না। যাহার ভালবাসার জিনিষ মরিয়া যায়, সেও মৃত দেহের কাছে বসিয়া থাকে, কিছুক্ষণ বিশ্বাস করে না যে আর নিশ্বাস নাই। পাগল লিয়রের মত দর্পণ খুঁজিয়া বেড়ায়, দর্পণে নিশ্বাসের দাগ ধরে কি না। সীতারাম এত বৎসর ধরিয়া, মনোমধ্যে একটা শ্রীমূর্ত্তি

গড়িয়া, তাহার আরাধনা করিয়াছিল। বাহিরের শ্রী যাই হৌক, ভিতরের শ্রী তেমনিই আছে। বাহিরের শ্রীকেই ত সীতারাম হৃদয়ে বসাইয়া রাখিয়াছিলেন, সেই বাহিরের শ্রী ত বাহিরেই আছে, তবে সে হৃদয়ের শ্রী হইতে ভিন্ন কিসে? ভিন্ন বলিয়া সীতারাম বারেক মাত্রও ভাবিতে পারিলেন না। লোকের বিশ্বাস আর সব যাই হৌক, মানুষ যা তাই থাকে। মানুষ যে কতবার মরে, তাহা আমরা বুঝি না। এক দেহেই কতবার যে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করে, তাহা মনেও করি না। সীতারাম বুঝিল না, যে সে শ্রী মরিয়াছে, আর একটা শ্রী সেই দেহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। মনে করিল যে আমার শ্রী আমার শ্রীই আছে। তাই শ্রীর চড়া চড়া কথা গুলা কাণে তুলিল না। তুলিবারও বড় শক্তি ছিল না। শ্রীকে ছাড়িলে সব ছাড়িতে হয়।

তা, শ্রী কিছুতেই রাজপুরী মধ্যে থাকিতে রাজি হইল না। তখন সীতারাম "চিত্তবিশ্রাম" নামে ক্ষুদ্র অথচ মনোরম প্রমোদ ভবন শ্রীর নিবাসার্থ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। শ্রী তাহাতে বাঘছাল পাতিয়া বসিল। রাজা প্রত্যহ তাহার সাক্ষাৎ জন্য যাইতেন। পৃথক আসনে বসিয়া তাহার সঙ্গে আলাপ করিয়া ফিরিয়া আসিতেন। ইহাতে রাজার পক্ষে বড় বিষময় ফল ফলিল।

আলাপটা কি রকম হইত মনে কর? রাজা বলিতেন, ভালবাসার কথা, শ্রীর জন্য তিনি এতদিন যে দুঃখ পাইয়াছেন তাহার কথা, শ্রীভিন্ন জীবনে তাঁহার আর কিছুই নাই, সেই কথা। কত দেশে কত লোক পাঠাইয়াছেন, কত দেশে নিজে কত খুঁজিয়াছেন, সেই কথা। শ্রী বলিত, কত পর্ব্বতের কথা, কত অরণ্যের কথা, কত বন্য পশু পক্ষী ফল মূলের কথা, কত যতি পরমহংস ব্রহ্মচারির কথা, কত ধর্ম্ম অধর্ম্ম, কর্ম্ম অকর্ম্মের কথা, কত পৌরাণিক উপন্যাসের কথা, কত দেশবিদেশী রাজার কথা, কত দেশাচার লোকাচারের কথা।

শুনিতে শুনিতে, সেই পৃথক আসনে বসিয়াও রাজার বড় বিপদ হইল। কথাগুলি বড় মনোমোহিনী। যে বলে সে আরও মনোমোহিনী। আগুন ত জ্বলিয়াই ছিল, এবার ঘর পুড়িল। শ্রী ত চিরকালই

মনোমোহিনী। যে শ্রী, বৃক্ষ বিটপে দাঁড়াইয়া আঁচল হেলাইয়া রণ জয় করিয়াছিল, রূপে এ শ্রী তাহার অপেক্ষা অনেক গুণে রূপসী। শরীরের স্বাস্থ্য, এবং মনের বিশুদ্ধি হইতেই রূপের বৃদ্ধি জন্মে;—শ্রীর শরীরের স্বাস্থ্য এবং মনের বিশুদ্ধি শতগুণে বাড়িয়াছিল; তাই রূপও শতগুণে বাড়িয়াছিল। সদ্যপ্রস্ফুটিত প্রাতঃপুষ্পের যেমন পূর্ণ স্বাস্থ্য—কোথাও অপুষ্ট নয়, কোথাও অঙ্গহীন নয়, কোথাও বিবর্ণ নয়, কোথাও বিশুষ্ক নয়,—সর্ব্বত্র মসৃণ, সম্পূর্ণ, শীতল, সুবর্ণ;—শ্রীর তেমনই স্বাস্থ্য;—শরীর সম্পূর্ণ, সেইজন্য শ্রী প্রকৃতির সৌন্দর্য্য মূর্ত্তিমতী। তারপর চিত্ত প্রশান্ত, ইন্দ্রিয়ক্ষোভশূন্য, চিন্তাশূন্য, বাসনাশূন্য, ভক্তিময়, প্রীতিময়, দয়াময়,—কাজেই সেই সৌন্দর্য্যের বিকার নাই, কোথাও একটা দুঃখের রেখা নাই, একটু মাত্র ইন্দ্রিয়ভোগের ছায়া নাই, কোথাও চিন্তার চিহ্ন নাই, সর্ব্বত্র সুমধুর, সহাস্য, সুখময়—এ ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তির কাছে সে সিংহবাহিনী মূর্ত্তি কোথায় দাঁড়ায়! তাহার পর সেই মনোমোহিনী কথা—নানা দেশের, নানা বিষয়ের, নানাবিধ অশ্রুতপূর্ব্ব কথা, কখন কৌতূহলের উদ্দীপক, কখন মনোরঞ্জন, কখন জ্ঞানগর্ভ—এই দুই মোহ একত্রে মিশিলে কোন্ অসিদ্ধ ব্যক্তির রক্ষা আছে? সীতারামের অনেক দিন ত আগুণ জ্বলিয়াছিল, এখন ঘর পুড়িতে লাগিল।

প্রথমে সীতারাম প্রত্যহ সায়াহ্নকালে চিত্তবিশ্রামে আসিতেন, প্রহরেক কথাবার্ত্তা কহিয়া চলিয়া যাইতেন। তারপর ক্রমশঃ রাত্রি বেশী হইতে লাগিল। পৃথক আসন হউক, রাজা ক্ষুধা ও নিদ্রায় পীড়িত না হইলে সেখান হইতে ফিরিতেন না। ইহাতে কিছু কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। সুতরাং সীতারাম, চিত্তবিশ্রামেই নিজের সায়াহ্ন আহার, এবং রাত্রে শয়নের ব্যবস্থা করিলেন। সে আহার বা শয়ন পৃথক গৃহে; শ্রীর বাঘছালের নিকটে ঘেঁষিতে পাইতেন না। ইহাতেও সাধ মিটিল না; প্রাতে রাজবাড়ী ফিরিয়া যাইতে দিন দিন বেলা হইতে লাগিল। শ্রীর সঙ্গে ক্ষণেক প্রাতেও কথাবার্ত্তা না কহিয়া যাইতে পারিতেন না! যখন বড় বেলা হইতে লাগিল, তখন আবার মাধ্যাহ্নিক আহারটাও চিত্তবিশ্রামেই হইতে লাগিল। রাজা আহারান্তে একটু নিদ্রা দিয়া, বৈকালে একবার রাজকার্য্যের জন্য রাজবাড়ী যাইতেন। তার পর

কোন দিন যাইতেন, কোন দিন বা কথায় কথায় যাওয়া ঘটিয়া উঠিত না। শেষ এমন হইয়া উঠিল যে যখন যাইতেন, তখনই একটু ঘুরিয়া ফিরিয়াই চলিয়া আসিতেন, চিত্তবিশ্রাম ছাড়িয়া তিষ্ঠিতেন না। চিত্তবিশ্রামেই রাজা বাস করিতে লাগিলেন, কখন কখন রাজভবনে বেড়াইতে যাইতেন।

এ দিকে চিত্তবিশ্রামে কাহারও কোন কার্য্যের জন্য আসিবার হুকুম ছিল না। চিত্তবিশ্রামের অন্তঃপুরে কীটপতঙ্গও প্রবেশ করিতে পারিত না। কাজেই রাজকার্য্যের সঙ্গে রাজার সম্বন্ধ প্রায় ঘুচিয়া উঠিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ, দুইজন নিরীহ গৃহস্থ লোক, মহম্মদপুরে বাস করে। রামচাঁদের চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া, প্রদোষকালে, নিভৃতে তামাকুর সাহায্যে দুইজনে কথোপকথন হইতেছিল। কিয়দংশ পাঠককে শুনিতে হইবে।

রামচাঁদ। ভাল, ভায়া, বলিতে পার চিত্তবিশ্রামের আসল ব্যাপারটা কি?

শ্যামচাঁদ। কি জান, দাদা, ও সব রাজা রাজড়ার হয়েই থাকে। আমাদের গৃহস্থ ঘরে কারই বা ছাড়া—তার আর রাজা রাজড়ার কথায় কাজ কি? তবে আমাদের মহারাজাকে ভাল বল্‌তে হবে—মাত্রার বড় কম। মোটে এই একটি।

রাম। হাঁ তাত বটেই! তবে কি জান, আমাদের মহারাজা না কি সে রকম নয়, পরম ধার্ম্মিক, তাই কথাটা জিজ্ঞাসা করি। বলি এত কালত এ সব ছিল না।

শ্যাম। রাজাও আর সে রকম নাই, লোকে ত বলে। কি জান, মানুষ চিরকাল এক রকম থাকে না। ঐশ্বর্য্য সম্পদ বাড়িলে, মনটাও কিছু এ দিক ওদিক হয়। আগে আমরা রাম রাজ্যে বাস করিতাম—ভূষণা দখল হ'য়ে অবধি কি আর তাই আছে?

রাম। তা বটে। তা আমার যেন বোধ হয়, যে চিত্তবিশ্রামের কাণ্ডটা

হ'য়ে অবধিই যেন বাড়াবাড়ি ঘটেছে। তা, মহারাজকে এমন বশ করাও সহজ ব্যাপার নয়। মাগীও ত সামান্যা নয়—কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসিল?

শ্যাম। শুনেছি সেটা না কি একটা ভৈরবী। কেউ কেউ বলে, সেটা ডাকিনী। ডাকিনীরা নানা মায়া জানে, মায়াতে ভৈরবী বেশ ধ'রে বেড়ায় আবার কেউ বলে তার একটা জোড়া আছে, সেটা উড়ে উড়ে বেড়ায়, তাকে বড় দেখতে পায় না।

রাম। তবে ত বড় সর্ব্বনাশ! রাজ্য পড়িল ডাকিনীর হাতে! এ রাজ্যের কি আর মঙ্গল আছে?

শ্যাম। গতিকে ত বোধ হয় না। রাজা ত আর কাজ কর্ম্ম দেখেন না। যা করেন তর্কালঙ্কার ঠাকুর। তা তিনি লড়াই ঝকড়ার কি জানেন। এ দিকে না কি নবাবি ফৌজ শীঘ্র আসিবে।

রাম। আসে মেনাহাতী আছে।

শ্যাম। তুমিও যেমন দাদা! পরেব কি কাজ। যার কর্ম্ম তার সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে। এইত দেখ্‌লে গঙ্গারাম রায় কি কর্‌লে? আবার কে জানে মেনাহাতীই বা কি করে? সে যদি নেড়ের সঙ্গে মিশে যায়, তবে আমরা দাঁড়াই কোথা? গোষ্ঠি শুদ্ধ জবাই হব দেখতে পাচ্চি।

রাম। তা বটে। তাই একে একে সব সরিতে আরম্ভ করেছে বটে। সে দিন তিলক ঘোষেরা উঠে যশোর গেল, তখন বুঝিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম যে কেন যাও? বলে এখানে জিনিস পত্র মাগ্যি। এখনই ত আরও কয় ঘর আমাদের পাড়া হইতে উঠিয়া গিয়াছে।

শ্যাম। তা দাদা তোমার কাছে বলচি প্রকাশ করিও না, আমিও শিগ্‌গির সরবো।

রামচাঁদ। বটে! ত আমিই পড়ে জবাই হই কেন? তবে কি জান, এই সব বাড়ী ঘর দ্বার খরচ পত্র করে করা গেছে, এখন ফেলে ফেলে যাওয়া গরিব মানুষের বড় দায়।

শ্যাম। তা কি করবে প্রাণটা আগে, না বাড়ী ঘর আগে। ভাল, রাজ্য বজায় থাকে, আবার আসা যাবে। ঘর দ্বার ত পালাবে না।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

শ্রী। মহারাজ! তুমি ত সর্ব্বদাই চিত্ত বিশ্রামে। রাজ্য করে কে?

সীতা। তুমিই আমার রাজ্য। তোমাতে যত সুখ, রাজ্যে কি তত সুখ!

শ্রী। ছি! ছি! মহারাজ এই জন্য কি হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে! আমার কাছে হিন্দু সাম্রাজ্য খাটো হইয়া গেল, ধর্ম্ম গেল, আমিই সব হইলাম! এই কি রাজা সীতারাম রায়?

সীতা। রাজ্য ত সংস্থাপিত হইয়াছে।

শ্রী। টিকিবে কি?

সীতা। ভাঙ্গে কার সাধ্য?

শ্রী। তুমিই ভাঙ্গিতেছ। রাজার রাজ্য, আর বিধবার ব্রহ্মচর্য্য সমান। যত্নে রক্ষা না করিলে থাকে না।

সীতা। কৈ, অরক্ষাও ত হইতেছে না।

শ্রী। তুমি কি রাজ্য রক্ষা কর? তোমাকে ত আমার কাছেই দেখি।

শ্রী। আমি রাজকর্ম্ম না দেখি, তা নয়। প্রায় প্রত্যহই রাজপুরীতে গিয়া থাকি। আমি একদণ্ড দেখিলে যা হইবে, অন্যের সমস্ত দিনে তত হইবে না। তা ছাড়া, তর্কালঙ্কার ঠাকুর আছেন, মৃন্ময় আছে, তাঁহারা সকল কর্ম্মে পটু। তাঁহারা থাকিতে কিছু না দেখিলেও চলে।

শ্রী। একবার ত তাঁহারা থাকিতেও রাজ্য যাইতেছিল। দৈবাৎ তুমি সে রাত্রে না পৌঁছিলে, রাজ্য থাকিত না। আবার কেন কেবল তাঁহাদের উপর নির্ভর করিতেছে?

সীতা। আমি ত আছি। কোথাও যাই নাই। আবার বিপদ পড়ে, আবার রক্ষা করিব।

শ্রী। যতক্ষণ এই বিশ্বাস থাকিবে, ততক্ষণ তুমি কোন যত্নই করিবে না, যত্ন ভিন্ন কোন কাজই সফল হয় না।

সী। যত্নের ক্রটি কি দেখিলে?

শ্রী। আমি স্ত্রী জাতি, সন্ন্যাসিনী, আমি রাজকার্য্য কি বুঝি যে, সে কথার

উত্তর দিতে পারি। তবে একটা বিষয়ে মনে বড় শঙ্কা হয়। মুরশিদাবাদের সম্বাদ পাইতেছেন কি? তোরাব খাঁ গেল, ভূষণা গেল, বারো ভূঁইয়া গেল, নবাব কি চুপ করিয়া আছে?

সী। সে ভাবনা করিও না। মুরশীদ কুলি যতক্ষণ মাল খাজানা ঠিক কিস্তী কিস্তী পাইবে, ততক্ষণ কিছু বলিবে না।

শ্রী। পাইতেছে কি?

সী। হাঁ পাঠাইবার বন্দোবস্ত আছে বটে—তবে এবার দেওয়া যায় নাই, অনেক খরচ পত্র হইয়াছে।

শ্রী। তবে সে চুপ করিয়া আছে কি?

সীতারাম মাথা হেঁট করিয়া কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। পরে বলিলেন—

"সে কি করিবে, কি করিতেছে? তাহার কিছু সম্বাদ পাই নাই।"

শ্রী। মহারাজ! চিত্তবিশ্রামে থাক বলিয়া কি সম্বাদ পাইতে ভুলিয়া গিয়াছ?"

সীতারাম চিন্তামগ্ন হইয়া বলিলেন, "বোধ হয় তাই। শ্রি! তোমার মুখ দেখিলে আমি সব ভুলিয়া যাই।

শ্রী। তবে, আমার এক ভিক্ষা আছে। এ পোড়ার মুখ, আবার লুকাইতে হইবে। নহিলে সীতারাম রায়ের নামে কলঙ্ক হইবে; ধর্ম্ম রাজ্য ছারে খারে যাইবে। আমায় হুকুম দাও, আমি বনে যাই।

সীতা। যা হয় হোক, আমিও ভাবিয়া দেখিতেছি। হয় তোমায় ছাড়িতে হইবে, নয় রাজ্য ছাড়িতে হইবে। আমি রাজ্য ছাড়িব তোমায় ছাড়িব না।

শ্রী। তবে তাহাই করুন। রাজ্য কোন উপযুক্ত লোকের হাতে দিন। তার পর সন্ন্যাস গ্রহন করিয়া আমার সঙ্গে বনে চলুন।

সীতারাম চিন্তামগ্ন হইয়া রহিলেন। রাজার তখন ভোগ লালসা অত্যন্ত প্রবলা। আগে হইলে সীতারাম রাজ্য ত্যাগ করিতে পারিতেন এখন সে সীতারাম নাই; রাজ্য ভোগে সীতারামের চিত্ত সমল হইয়াছে। সীতারাম রাজ্য ত্যাগ করিতে পারিলেন না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সেই যে সভাতলে, রমা মূর্চ্ছা পাইয়া পড়িয়া গিয়াছিল, সখীরা ধরাধরি করিয়া আনিয়া শুয়াইল, সেই অবধি রমা আর উঠে নাই। প্রাণ পণ করিয়া আপনার সতী নাম রক্ষা করিয়াছিল। নাম রক্ষা হইল, কিন্তু প্রাণ বুঝি গেল।

এখন রোগ পুরাতন হইয়াছে। কিন্তু গোড়া থেকে বলি। রাজার রাণী, চিকিৎসার অভাব হয় নাই। প্রথম হইতেই কবিরাজ যাতায়াত করিতে লাগিল। অনেকগুলা কবিরাজ রাজ বাড়ীতে চাকরি করে, তত কর্ম্ম নাই, সচরাচর ভৃত্যবর্গকে মশলা খাওয়াইয়া, এবং পরিচারিকাকে পোষ্টাই দিয়া, কালাতিপাত করে; এক্ষণে ছোট রাণীকে রোগী পাইয়া কবিরাজ মহাশয়েরা হঠাৎ বড় লোক হইয়া বসিলেন। তখন রোগ নির্ণয় লইয়া মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। মূর্চ্ছা, বায়ু অম্লপিত্ত, হৃদ্রোগ, ইত্যাদি নানা-বিধ রোগের লক্ষণ শুনিতে শুনিতে রাজপুরুষেরা জ্বালাতন হইয়া উঠিল। কেহ নিদানের দোহাই দেন, কেহ বাভটের; কেহ চরক সংহিতার বচন আওড়ান, কেহ সুশ্রুতের টীকা ঝাড়েন। রোগ অনির্ণীত রহিল।

কবিরাজ মহাশয়েরা, কেবল বচন ঝাড়িয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন, এমন নিন্দা আমরা করি না। তাঁহারা নানা প্রকার ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। কেহ বটিকা, কেহ গুঁড়া, কেহ ঘৃত, কেহ তৈল; কেহ বলিলেন, ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইবে, কেহ বলেন, আমার কাছে যাহা প্রস্তুত আছে, তেমন আর হইবে না। যাই হউক, রাজার বাড়ী, রাণীর রোগ, ঔষধের প্রয়োজন থাক না থাক, নূতন প্রস্তুত হইবে না, এমন হইতে পারে না। হইলে দশজনে দুটাকা চুসিকা উপার্জ্জন করিতে পাবে, অতএব ঔষধ প্রস্তুতের ধূম পড়িয়া গেল। কোথাও হামানদিস্তায় মূল পিষ্ট হইতেছে, কোথাও ঢেঁকিতে ছাল কুটিতেছে; কোথাও হাঁড়িতে কিছু সিদ্ধ হইতেছে, কোথাও খুলিতে তৈলে মূর্চ্ছনা পড়িতেছে। রাজ বাড়ীর একজন পরিচারিকা এক দিন দেখিয়া দেখিয়া বলিল, "রাণী হইয়া রোগ হয়, সেও ভাল।"

যার জন্য ঔষধের এত ধূম, তার সঙ্গে ঔষধের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বড় অল্প।

কবিরাজ মহাশয়েরা ঔষধ যোগাইতেন না, তা নয়। সে গুণে তাঁহাদের কিছু মাত্র ত্রুটি ছিল না। তবে রমার দোষে সে যত্ন বৃথা হইল—রমা ঔষধ খাইত না। মুরলার বদলে, যমুনা নাম্নী এক জন পরিচারিকা, রাণীর প্রধানা দাসী হইয়াছিল। যমুনাকে একটু প্রাচীন দেখিয়া নন্দা তাহাকে এই পদে অভিষিক্তা করিয়াছিলেন। আমরা এমন বলিতে পারি না যে যমুনা আপনাকে প্রাচীন বলিয়া স্বীকার করিত; শুনিয়াছি কোন রাজভৃত্য বিশেষের এ বিষয়ে সম্পূর্ণ মতান্তর ছিল; তথাপি স্থূল কথা এই যে যমুনা একটু প্রাচীন চালে চলিত, রমাকে বিলক্ষণ যত্ন করিত; রোগিনীর সেবার কোন প্রকার ত্রুটি না হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগিনী ছিল। রমার জন্য কবিরাজেরা যে ঔষধ দিয়া যাইত, তাহা তাহারই হাতে পড়িত; সেবন করাইবার ভার তাহার উপর। কিন্তু সেবন করান তাহার সাধ্যাতীত; রমা কিছুতেই ঔষধ খাইত না।

এদিকে রোগের কোন উপশম নাই, ক্রমেই বৃদ্ধি, রমা আর মাথা তুলিতে পারে না। দেখিয়া শুনিয়া যমুনা স্থির করিল, যে, সে সকল কথা বড় রাণীকে গিয়া জানাইবে। অতএব রমাকে বলিল, "আমি বড় মহারাণীর কাছে চলিলাম; ঔষধ তিনি নিজে আসিয়া খাওয়াইবেন।"

রমা বলিল, "বাছা! মৃত্যুকালে আর কেন জ্বালাতন করিস! বরং তোর সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করি।"

যমুনা জিজ্ঞাসা করিল, "কি বন্দোবস্ত মা?"

রমা। তোমার এই ঔষধগুলি আমারে বেচিবে? আমি এক এক টাকা দিয়া এক একটা বড়ি কিনিতে রাজি আছি।

যমুনা। সে আবার কি মা! তোমার ঔষধ, তোমায় আবার বেচিব কি?

রমা। টাকা নিয়া তুমি যদি আমায় বড়িগুলি বেচ, তা হ'লে তোমার আর তাতে কোন অধিকার থাকিবে না। চাই আমি খাই, চাই না খাই, তুমি আর কথা কহিতে পাবে না।

যমুনা কিছুক্ষণ ভাবিল। সে বুদ্ধিমতী, মনে মনে বিচার করিল, যে এ ত মরিবেই, তবে আমি টাকা গুলা ছাড়ি কেন? প্রকাশ্যে বলিল।

"তা মা তুমি যদি খাও, ত টাকা দিয়াই নাও, আর অমনিই নাও, নাও না কেন! আর যদি না খাও, ত আমার কাছে ওষুধ পড়ে থেকেই কি ফল?"

অতএব চুক্তি ঠিক হইল। যমুনা টাকা লইয়া, ঔষধ রমাকে বেচিল। রমা ঔষধের কতকগুলা পিকদানিতে ফেলিয়া দিল, কতক বালিশের নীচে গুঁজিল। উঠিতে পারে না, যে অন্যত্র রাখিবে।

এদিগে, ক্রমশঃ শরীর ধ্বংসের লক্ষণ সকল দেখা দিতে লাগিল। নন্দা প্রত্যহ রমাকে দেখিতে আসে, দুই একদণ্ড বসিয়া কথা বার্ত্তা কহিয়া যায়। নন্দা দেখিল, যে মৃত্যুর ছায়া পড়িয়াছে; যাহার ছায়া, সে নিকটেই। নন্দা ভাবিল, 'হায়! রাজবাড়ীর কবিরাজ গুলোকেও কি ডাকিনীতে পেয়েছে?" নন্দা একেবারে কবিরাজের দলকে ডাকাইয়া পাঠাইল। সকলে আসিলে, নন্দা অন্তরালে থাকিয়া তাহাদিগকে উত্তম মধ্যম রকম ভর্ৎসনা করিল। বলিল "যদি রোগ ভাল করিতে পার না, তবে মাসিক লও কেন?"

একজন প্রাচীন কবিরাজ বলিল, "মা! কবিরাজে ঔষধ দিতে পারে, পরমায়ু দিতে পারে না।"

নন্দা বলিল, "তবে আমাদের ঔষধে ও কাজ নাই, কবিরাজে ও কাজ নাই! তোমরা আপনার আপনার দেশে যাও।"

কবিরাজ মণ্ডলী বড় ক্ষুণ্ণ হইল। প্রাচীন কবিরাজটি বড় বিজ্ঞ। তিনি বলিলেন, "মা! আমাদের অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ, তাই এমন ঘটিয়াছে। নহিলে, আমি যে ঔষধ দিয়াছি, তাহা সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি। আমি এখনও আপনার নিকট স্বীকার করিতেছি, যে তিন দিনের মধ্যে আরাম করিব, যদি একটা বিষয়ে আপনি অভয় দেন।

নন্দা জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাই?"

কবিরাজ বলিল, "আমি নিজে বসিয়া থাকিয়া ঔষধ খাওয়াইয়া আসিব।" বুড়ার বিশ্বাস, যে "বেটি ঔষধ খায় না; আমার ঔষধ খাইলে কি রোগী মরে'!"

নন্দা স্বীকৃত হইয়া কবিরাজদিগকে বিদায় দিল। পরে রমার কাছে আসিয়া সব বলিল। রমা অল্প হাসিল, বেশী হাসিবার শক্তিও নাই, মুখে স্থান ও নাই; মুখ বড় ছোট হইয়া গিয়াছে।

নন্দা জিজ্ঞাসা করিল—"হাসিলি যে ?"

রমা আবার তেমনি হাসি হাসিয়া বলিল "ঔষধ খাব না।"

নন্দা। ছি দিদি! যদি এত ওষুধ খেলে, ত আর তিনটা দিন খেতে কি ?

রমা। আমি ওষুধ খাই নাই। নন্দা চমকিয়া উঠিল,—বলিল,

"সে কি ? মোটে না ?"

রমা। সব বালিশের নীচে আছে।

নন্দা বালিশ উল্টাইয়া দেখিল, সব আছে বটে। তখন নন্দা বলিল, "কেন বহিন্,—এখন আর আত্মঘাতিনী হইবে কেন ? পাপ ত মিটিয়াছে।"

রমা। তা নয়—ঔষধ খাব।

নন্দা। আর কবে খাবি ?

রমা। যবে রাজা আমাকে দেখিতে আসিবেন।

ঝর ঝর করিয়া রমার চোক দিয়া জল পড়িতে লাগিল। নন্দার ও চক্ষে জল আসিল। আর এখন সীতারাম রমাকে দেখিতে আসে না। সীতারাম চিত্তবিশ্রামে থাকে। নন্দা চোখের জল মুছিয়া বলিল, "এবার এলেই তোমাকে দেখিতে আসিবেন।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

"এবার এলেই তোমাকে দেখিতে আসিবেন," এই কথা বলিয়া নন্দা রমাকে আশ্বাস দিয়া আসিয়াছিল। সেই আশ্বাসে রমা কোন রকমে বাঁচিয়াছিল—কিন্তু আর বুঝি বাঁচে না। নন্দা তাহাকে যে আশ্বাস বাক্য দিয়া আসিয়াছে, নন্দাও তাহা জপমালা করিয়াছিল, কিন্তু রাজাকে ধরিতে পারিতেছিল না, যদি কখন ধরে, তবে "আজ না কাল" করিয়া রাজা প্রস্থান করেন। নন্দা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, যে কিছুতেই সে সীতারামের উপর রাগ করিবে না। ভাবিল, 'রাজাকে ত ডাকিনীতে পেয়েছে সত্য, কিন্তু তাই ব'লে আমায় যেন ভুতে না পায়। আমার ঘাড়ে রাগ ভুত

চড়িলে—এ সংসার এখন আর রাখিবে কে?" তাই নন্দা সীতারামের উপর রাগ করিল না—আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম প্রাণপাত করিয়া করিতে লাগিল। কিন্তু ডাকিনীটার উপর রাগ বড় বেশী। ডাকিনী যে শ্রী, তাহা নন্দা জানিত না; সীতারাম ভিন্ন কেহই জানিত না। নন্দা অনেকবার সন্ধান জানিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিল, কিন্তু সীতারামের আজ্ঞা ভিন্ন চিত্ত বিশ্রামে মক্ষিকা প্রবেশ করিতে পারিত না, সুতরাং কিছু হইল না। তবে জনপ্রবাদ এই যে, ডাকিনীটা দিবসে পরম সুন্দরী মানবী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গৃহধর্ম্ম করে, রাত্রে শৃগালী রূপ ধারণ করিয়া শ্মশানে শ্মশানে বিচরণ পূর্ব্বক নরমাংস ভক্ষণ করে। অতিশয় ভীতা হইয়া নন্দা চন্দ্রচূড় ঠাকুরকে সবিশেষ নিবেদন করিল। চন্দ্রচূড় উত্তম তন্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণ সংগ্রহ করিয়া রাজার উদ্ধারার্থ তান্ত্রিক যজ্ঞ সকল সম্পাদন করাইলেন, কিন্তু কিছুতেই ডাকিনীর ধ্বংস হইল না। পরিশেষে একজন সুদক্ষ তান্ত্রিক বলিলেন, "মনুষ্য হইতে ইহার কিছু উপায় হইবে না। ইনি সামান্যা নহেন। ইনি কৈলাসনিবাসিনী, সাক্ষাৎ ভবানীর সহচরী, ইঁহার নাম বিশালাক্ষী। ইনি রুদ্রের শাপে কিছু কালের জন্য মর্ত্তলোকে মনুষ্য সহবাসার্থ আসিয়াছেন। শাপান্ত হইলে আপনিই যাইবেন।" শুনিয়া চন্দ্রচূড় ও নন্দা নিরস্ত ও চিন্তামগ্ন হইয়া রহিলেন। তবু নন্দা মনে মনে ভাবিত, ভবানীর সহচরী হউক, আর যেই হউক, আমি একবার তাকে পাইলে নখে মাথা চিরি।"

তাই, নন্দার সীতারামের উপর কোন রাগ নাই। সীতারামও রাজধানীতে আসিলে নন্দার সঙ্গে কখন কখন সাক্ষাৎ করিতেন। এই সকল সময়ে, নন্দা রমার কথা সীতারামকে জানাইত—বলিত, "সে বড় 'কাতর'—তুমি গিয়া একবার দেখিয়া এসো।" সীতারাম যাচ্চি যাব করিয়া, যান নাই। নন্দা জোর করিয়া ধরিয়া বসিল—বলিল, "আজ দেখিতে যাও—নহিলে এ জন্মে আর দেখা হবে না।"

কাজেই সীতারাম রমাকে দেখিতে গেলেন। সীতারামকে দেখিয়া রমা বড় কাঁদিল। সীতারামকে কোন তিরস্কার করিল না। কিছুই বলিতে পারিল না। সীতারামের মনে কিছু অনুতাপ জন্মিল কি না জানি না। সীতারাম স্নেহসূচক সম্বোধন করিয়া রোগমুক্তির ভরসা দিতে লাগিলেন।

ক্রমে রমা প্রফুল্ল হইল, মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। কিন্তু কি হাসি! হাসি দেখিয়া সীতারামের শঙ্কা হইল যে আর অধিক বিলম্ব নাই।

সীতারাম পালঙ্কের উপর উঠিয়া বসিয়াছিলেন। সেইখানে রমার পুত্র আসিল। আবার রমার চক্ষে জল আসিল—কিছুক্ষণ অবাধে জল, শুষ্ক গণ্ড বাহিয়া পড়িতে লাগিল। ছেলেও মার কান্না দেখিয়া কাঁদিতেছিল। রমা ঈঙ্গিতে, অস্ফুটস্বরে সীতারামকে বলিলেন, "ওকে একবার কোলে নাও।" সীতারাম অগত্যা পুত্রকে কোলে লইলেন। তখন রমা, সকাতরে ক্ষীণকণ্ঠে, রুদ্ধশ্বাসে বলিতে লাগিল, "মার দোষে ছেলেকে ত্যাগ করিও না। এই তোমার কাছে আমার শেষ ভিক্ষা। বড় রাণীর হাতে ওকে সমর্পণ করিয়া যাব মনে করেছিলাম—কিন্তু তা না করিয়া তোমারই হাতে সমর্পণ করিলাম। কথা রাখিবে কি?"

সীতারাম কলের পুতুলের মত স্বীকৃত হইলেন, রমা তখন সীতারামকে আরও নিকটে আসিয়া বসিতে ঈঙ্গিত করিলেন। সীতারাম সরিয়া বসিলে, রমা তাঁর পায়ে হাত দিয়া, পায়ের ধূলা লইয়া আপনার মথায় দিল। বলিল, "এজন্মের মত বিদায় হইলাম। আশীর্ব্বাদ করিও, জন্মান্তরে যেন তোমাকেই পাই।"

তার পর বাক্য বন্ধ হইল। শ্বাস বড় জোরে জোরে পড়িতে লাগিল। চক্ষুর জ্যোতি গেল। মুখের উপর কালো ছায়া আরও কালো হইতে লাগিল। শেষে সব অন্ধকার হইল। সব জ্বালা জুড়াইল। রমা চলিয়া গেল।

নিষ্কাম কর্ম্ম।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় বলিয়াছেন—

"লোকেস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাং॥"

এই লোকে ধর্ম্মনিষ্ঠা দুই প্রকার, ইহা বেদে আমাকর্তৃক উক্ত হইয়াছে। নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বনের অধিকারী সাংখ্য যোগীরা জ্ঞান যোগে রত হন এবং

প্রবৃত্তিমার্গ অবলম্বনে অধিকারী যোগীরা কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিয়া থাকেন।

যাঁহারা আত্মবিষয়ে বিবেকবান্, তাঁহারা সংসার আশ্রমাদি পরিত্যাগ করিয়া বেদান্ত বিজ্ঞান সুনিশ্চিতার্থ প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া জ্ঞানযোগ দ্বারা যে নিষ্ঠা প্রাপ্ত হন তাহাই নিবৃত্তিমার্গ নিষ্ঠা, এবং কর্ম্মিগণ কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিয়া যে নিষ্ঠা লাভ করেন তাহাই প্রবৃত্তিমার্গ নিষ্ঠা। যিনি যে মার্গ অবলম্বনে অধিকারী তাঁহার সেই পথ অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য। যাঁহারা প্রবৃত্তিমার্গ অবলম্বনে অধিকারী, সংসারাশ্রম ত্যাগরূপ সন্ন্যাস তাঁহাদিগের ধর্ম্ম নহে; এই কথাটি দেবীচৌধুরাণী গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য।

যাহার চিত্ত, সুখ লাভেচ্ছায় বাহ্য বিষয়ে স্বতঃই আকৃষ্ট হয় সেই ব্যক্তি যদি কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল সংযম করিয়া ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল মনে মনে স্মরণ করিতে থাকেন তবে সেই বিমূঢ়াত্মাকে মিথ্যাচারী বলা যায়।

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচার স উচ্যতে। গীতা ৩।৮

এরূপ কপটাচার প্রকৃত ধর্ম্ম চর্চ্চার ব্যাঘাত স্বরূপ। কেন না, মন হইতে বিষয়তৃষ্ণা দূর করাই ধর্ম্মচর্চ্চার উদ্দেশ্য, বাহ্য কর্ম্ম সন্ন্যাস অবলম্বনে মনের তৃষ্ণা দূর হয় না। প্রবৃত্তি অনুযায়ী ধর্ম্মকর্ম্ম আচরণ ব্যতিরেকে মনের তৃষ্ণা দূর করা দুঃসাধ্য। সেই জন্য ধর্ম্ম কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়াই তাহাদিগের পক্ষে বিধি। এই রূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াও নির্লিপ্ত থাকিবার কৌশলকেই কর্ম্মযোগ বলে। "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলং"। এইরূপ কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিয়া কর্ম্ম করার নামই নিষ্কাম কর্ম্মাচরণ। দেবী চৌধুরাণী গ্রন্থে এই কথাই স্পষ্টরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে।

বাহ্য বিষয়ের সহিত সম্পর্কে আসিয়া পুরুষ সুখ ও দুঃখ ভোগ করে। এই সুখ দুঃখের স্মৃতি চিত্তপটে সংস্কাররূপে অঙ্কিত হইয়া থাকে। কোন কোন লোকের মনে সুখের স্মৃতিটি যত দৃঢ়াঙ্কিত হইয়া থাকে, সেই সুখের আনুষঙ্গিক দুঃখের স্মৃতি তত দৃঢ়াঙ্কিত হয় না; অপর অপর লোকের মনে দুঃখের স্মৃতিটি যত দৃঢ়াঙ্কিত হইয়া থাকে, সুখের স্মৃতি তত দৃঢ়াঙ্কিত হয় না। যেখানে সুখের সংস্কারের প্রাধান্য, মনুষ্যচিত্ত সেইখানে সুখপ্রদ

বিষয়ে স্বতই আকৃষ্ট হয় এবং ইহা হইতেই কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে। যেখানে দুঃখের সংস্কারের প্রাধান্য, সেই খানে মনুষ্য বিষয়বিদ্বেষী হইয়া ইন্দ্রিয়গণের বিষয় হইতে, প্রতিনিবৃত্ত হইতে যত্নশীল হয়। প্রসূতি, প্রসবের পর পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়াই প্রসবযন্ত্রণা সমস্ত ভুলিয়া যায়। যাহারা এইরূপ সুখপ্রদ বিষয়ের সম্পর্কে আসিয়াই আনুষঙ্গিক দুঃখ সমস্ত ভুলিয়া যায়, তাহাদের অন্তঃকরণে বিষয়বতী প্রবৃত্তির প্রাধান্য অধিক বুঝিতে হইবে। প্রবৃত্তিমার্গবিহিত স্বধর্ম্ম পালনই তাহাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এক কথায়, চিত্তে বাসনার বীজ যত দিন থাকিবে, ততদিন মনুষ্য নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বনে নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করিতে সমর্থ হইবে না।

দেবীচৌধুরাণীর ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে প্রফুল্লের প্রথম স্বামিসম্মিলন ঘটিল। একটি অপূর্ব্ব আনন্দভাব প্রফুল্লের চিত্তে দৃঢ়াঙ্কিত হইয়া গেল। পতিভক্তি-রূপ যে চিত্তবৃত্তি প্রফুল্লের অন্তরে অব্যক্ত ভাবে ছিল, তাহা এই পতি-সম্মিলনে ফুটিয়া উঠিল। প্রফুল্ল কাঙ্গালিনী, প্রফুল্ল কখনও কাহারও নিকট আদর পায় নাই—সেই প্রফুল্লের স্বামী আজি আদর করিয়া প্রফুল্লের মুখ চুম্বন করিল, প্রফুল্ল তখন মনে মনে ভাবিতেছিল যে "বুঝি এই মুখচুম্বনের মত পবিত্র পুণ্যময় কর্ম্ম ইহজগতে কখনও কেহ করে নাই।" এই দিন প্রফুল্ল যে সুখ অনুভব করিয়াছে, তাহা সে জীবনে কখনও ভুলিতে পারে নাই। এই দিন প্রফুল্ল পতিভক্তি কি পদার্থ তাহা বুঝিল। এই পতিভক্তিবৃত্তিই প্রফুল্লের চিত্তের মূল প্রবৃত্তি; এই মূল প্রবৃত্তি অনুযায়ী কর্ম্ম করাই অর্থাৎ পতিসেবায় জীবন যাপন করাই প্রফুল্লের ধর্ম্ম; এবং অহংকারশূন্য হইয়া স্বধর্ম্ম প্রতিপালনের নামই নিষ্কাম কর্ম্মাচরণ।

এইবারে মূল প্রবৃত্তি ও অহংকার এই দুইটি কথার অর্থ একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝান প্রয়োজন। মনুষ্যের প্রবৃত্তি সুখানুযায়ী ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। একই রূপ বিষয়ে, সকলে কিছু সমান সুখ অনুভব করে না; সেইজন্য আমার যে বিষয়সম্পর্কে সুখ হয়, আর একজন তাহাতে যে কি সুখ আছে তাহা বুঝিতে পারে না। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন লোকের চিত্তের বর্ত্তমানাবস্থায়, প্রবৃত্তি ভিন্ন ভিন্ন রূপ ইহা বুঝিতে হইবে। তাহার পর,

ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে আমার ভিন্ন ভিন্ন সুখের সংস্কার সকলের মধ্যে, বিশেষ কোন একটি সংস্কার সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়াঙ্কিত ও দীর্ঘকাল স্থায়ী। ইহাকেই মূল প্রবৃত্তি বলিতে পারা যায়। যে সুখভাবনা উপস্থিত হইলে ইতর সকল সুখ তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়, সেই সুখের প্রবৃত্তিকেই মূল প্রবৃত্তি বলিতে পারা যায়। শত্রুর সম্পর্কে আসিয়া শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে অর্জ্জুনের যে তৃপ্তিলাভ হইত, সেই সুখসংস্কার অর্জ্জুনের চিত্তে দৃঢ়াঙ্কিত ছিল এবং সেইজন্যই তাঁহার মূল প্রবৃত্তি অনুযায়ী ক্ষত্রিয়ধর্ম্মবিহিত যুদ্ধ-কার্য্যই অর্জ্জুনের স্বধর্ম্ম ছিল, ভগবান্ এই জন্যই তাঁহাকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতে পরামর্শ দেন নাই।

চিত্ত বড় চঞ্চল পদার্থ; এক ভাবে স্থির থাকিতে চায় না। চিত্তের চাঞ্চল্য হেতু মনুষ্য তাহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ঠিক বুঝিতে পারে না এবং সেই জন্য নানারূপ কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে। এইজন্য জ্ঞানিগণ দুঃখ নিবৃত্তির জন্য প্রথমতঃ চিত্তের চাঞ্চল্য দূর করিতে পরামর্শ দেন। ভগবান্ পতঞ্জলি বলেন,

"তৎ প্রতিষেধার্থম্ একতত্ত্বাভ্যাস"

চিত্তচাঞ্চল্য দূর করিবার জন্য কোন এক তত্ত্বে চিত্ত স্থির রাখিতে সতত অভ্যাস করিবে।

মূল প্রবৃত্তিতে চিত্ত স্থির রাখায় সেই প্রবৃত্তি মনুষ্যকে যেরূপ ধর্ম্মকর্ম্মে প্রেরণ করে তাহাই মনুষ্যের স্বধর্ম্ম। মনে কর, শত্রুসংহারে একজনের বড়ই আনন্দ হয়, শত্রুসংহারবাসনা তাহার মূল প্রবৃত্তি সেই প্রবৃত্তি তাহাকে শত্রু সংহারে প্রেরণ করে এবং সেইজন্য শত্রু দেখিলেই সংহার করাই কি তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম? শত্রুসংহার বৃত্তি মূল প্রবৃত্তি হইলেই যে শত্রু দেখিলেই সংহার করিতে হইবে এরূপ নহে। যেখানে শত্রু-সংহার ধর্ম্ম কর্ম্ম, সেইখানেই কেবল তিনি তাঁহার চিত্তের বৃত্তি ব্যক্ত ভাবে প্রকাশ করিতে অধিকারী; অন্যত্র নহে।

ধর্ম্ম কাহাকে বলে? আমি একটি চেতন জীব, যাহা চেতন জীবে আছে কিন্তু জড় পদার্থে নাই, তাহাই চেতন জীবের ধর্ম্ম। জড় পদার্থ সকলের স্বাধীন ইচ্ছা নাই, কিন্তু আমার স্বাধীন ইচ্ছা আছে; এই স্বাধীনতাই মনুষ্যের ধর্ম্ম। সাংখ্যকার কপিলদেব মতে প্রকৃতি, বুদ্ধি, অহঙ্কার

ইত্যাদি যে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের সহিত মনুষ্যের সংযোগ দেখা যায়, এ সমস্তই জড় পদার্থ এবং কেবল একমাত্র পুরুষই চেতন পদার্থ। এই সমস্ত জড় পদার্থের যে ক্রমপরিণাম দেখা যায় তাহা এক অলঙ্ঘনীয় নিয়মের বশে হইতেছে। অর্থাৎ জড় পদার্থ আত্মবশে নাই কিন্তু পুরুষের যে সুখ-দুঃখ-ভোগ আছে ইহা তাহার আত্মাধীন; পুরুষের সুখ-দুঃখ-ভোগ তাহার নিজের কর্ম্মের অধীন এবং দুঃখ নিবৃত্তিই সাংখ্য শাস্ত্রানুসারে পুরুষার্থ। দুঃখ নিবৃত্তি করা এবং না করা চেতন পুরুষের আত্মাধীন এবং এই হেতু পরবশ প্রকৃতিকে জড় এবং পুরুষকে চেতন পদার্থ বলা যায়।

আমার যেটুকু আমার নিজের বশে আছে সেই টুকুই চেতন পদার্থ, সেই টুকুতেই আমার আমিত্ব বা পুরুষত্ব আছে। অর্থাৎ স্বাধীনতাই চেতনের ধর্ম্ম।

সাংখ্য শাস্ত্রানুসারে পুরুষ সংখ্যায় অনেক আছেন। আমি একজন পুরুষ, তুমি একজন পুরুষ, তিনি একজন পুরুষ ইত্যাদি। স্বাধীনতাই সকল পুরুষের সাধারণ ধর্ম্ম।

আমার সুখ দুঃখ সম্পূর্ণরূপে আমার নিজের আয়ত্তাধীন রাখিতে চেষ্টা করাই যেমন আমার পুরুষত্ব, সেইরূপ তোমার সুখ দুঃখ সম্পূর্ণরূপে তোমার নিজের আয়ত্তাধীন রাখিতে চেষ্টা করা তোমার পুরুষত্ব। আমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অর্থাৎ আমার স্বাধীন ইচ্ছা আছে; তোমারও সেইরূপ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে; সকল চেতন জীব মাত্রেরই এইরূপ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে। মনুষ্য সকল পরস্পর পরস্পরের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া যে কার্য্য করে, তাহাই মনুষ্যধর্ম্ম। অর্থাৎ আমার যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে, আমার দুঃখনিবৃত্তির জন্য যে স্বাধীন চেষ্টা আমার আছে, সেই স্বাধীনতার একটি সীমা আছে; আমার স্বাধীনতা ব্যক্ত করিতে গেলে যেখানে অন্যের স্বাধীন ইচ্ছার ব্যাঘাত উপস্থিত হয়, সে ক্ষেত্র আমার স্বাধীনতা ব্যক্ত করিবার স্থল নহে। আমার যে কর্ম্মে অন্যের সুখ দুঃখ জন্মে, সেই সুখ-দুঃখ-ভোগ যদি তাহার স্বাধীন ইচ্ছার বিরোধী হয়, তবে আমার সেই কর্ম্ম অধর্ম্ম অর্থাৎ চেতন মনুষ্যোচিত কর্ম্ম নহে।

এইবারে শত্রুসংহার কোন্ স্থলে ধর্ম্ম কর্ম্ম, কোথায় বা অধর্ম্ম তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। শত্রু যখন স্বেচ্ছায় আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় তখন তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া অধর্ম্ম নহে।

এইবারে অহংকার কথাটির অর্থ বুঝিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥

আমার ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা যে সকল কর্ম্ম সাধিত হয়, তাহা প্রকৃতির গুণ দ্বারাই সাধিত হয়; কিন্তু আমি যে আমাকে ঐ সকল কর্ম্মের কর্ত্তা জ্ঞান করি ইহাই অহংকার। সত্ত্ব রজঃ ও তম এই তিন পদার্থের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি. পুরুষ সম্পর্কে প্রকৃতির গুণ ক্ষোভ হওয়ায় প্রকৃতিব যে ভাবান্তর হয়, তাহার নাম মহৎতত্ত্ব অথবা বুদ্ধি।

এই বুদ্ধির বিকারে অহংকারের উৎপত্তি; ইহারা সকলেই জড়পদার্থ সাংখ্য শাস্ত্রে এইরূপ কথা আছে।

জড়পদার্থ কাহাকে বলে? যাহা পরবশ তাহাই জড়পদার্থ। বাহ্য শক্তির বশে যাহা চালিত হয়, তাহাই জড়পদার্থ। মোহিনী শক্তির বশে (mesmeric powers) মুগ্ধ ব্যক্তির কর্ম্মে প্রবৃত্তি আলোচনা করিয়া দেখিলে ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, মনুষ্যের বুদ্ধি এবং অহঙ্কার বাহ্য শক্তির বশে চালিত হইয়া থাকে। যাদুকরের ইচ্ছা শক্তির বশে মুগ্ধ ব্যক্তির মনের ভাব পরিবর্ত্তন করিতে পারা যায়; এবং সেই মুগ্ধ ব্যক্তি এই শক্তির বশে কর্ম্ম করিয়া, কর্ম্মে প্রবৃত্তির কারণ সম্বন্ধে অজ্ঞান থাকায় আপনাকেই কর্ম্মের কর্ত্তা জ্ঞান করে। কোন লোককে যাদুবিদ্যা দ্বারা মুগ্ধ করিয়া যাদুকর যদি মনে মনে তাহাকে এই কথা বলিয়া দেয় যে, "তুমি অমুক দিন অমুক সময়ে অমুক ব্যক্তিকে প্রহার করিবে, ইহার যেন অন্যথা না হয়", তবে অনেক স্থলে এরূপ দেখা যায় যে, সেই ব্যক্তি সেই নির্দ্ধারিত সময়ে সেই ব্যক্তিকে প্রহার করিবার জন্য সচেষ্ট থাকে, এবং কর্ম্ম সমাধা করিয়া আপনাকেই কর্ম্মের কর্ত্তা জ্ঞান করিয়া থাকে। সে ব্যক্তি কেন ঐ রূপ কর্ম্ম করিল তাহা জিজ্ঞাসা করিলে কারণ কিছুই বলিতে পারে না, কেবল এই মাত্র বলে যে ঐ কর্ম্মে তাহার একটা বড় ইচ্ছা হওয়ায় সে ঐ রূপ কর্ম্ম করি-

য়াছে। সম্প্রতি ইটালীতে ঐরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়াছে শুনিয়াছি। একটি লোক খুন অপরাধে বিচারালয়ে আনীত হয়; সে ব্যক্তি জানে যে সে খুন করিয়াছে কিন্তু শেষে প্রমাণ হইল যে যাদু বিদ্যায় পারদর্শী (mesmerist) কোন লোকের মোহিনীশক্তির বশে তাহার ঐ খুন করিবার ঝোঁক উপস্থিত হইয়াছিল। বিচারে সে ব্যক্তি খালাস পাইয়াছে।

আমরাও মানুষ মাত্রেই যে সকল নানাবিধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হই তাহাও একটা একটা মনের খেয়ালের বশে করিয়া থাকি। এক এক সময়ে অন্তরে এক একটা ভাব ফুটিয়া উঠে এবং তাহারাই ইন্দ্রিয় সকলকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে। ভাবময় জগৎ আলোচনা করিয়া যিনি বুঝিয়াছেন যে প্রাকৃতিক জড়শক্তির নিয়মশৃঙ্খলা বশেই ঐ রূপ ভাব সকল প্রকাশ পায়, তিনি আর আপনাকে কর্ম্মের কর্ত্তা জ্ঞান করেন না। তখন তিনি কর্ম্মকর্ত্তা অহঙ্কারকে জড়পদার্থ বলিয়া বুঝিতে পারেন। তখন তাঁহার অন্তরে কোন কর্ম্ম করিবার ঝোঁক উপস্থিত হইলে তিনি ইহা বুঝিতে পারেন যে বাহিরের কোন জড়-শক্তির বশে তাঁহার এই প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপে কর্ম্মকর্ত্তাকে জড়শক্তি বুঝিয়া, কর্ম্মকর্ত্তা অহঙ্কার হইতে চেতন পুরুষকে যিনি পৃথক্ ভাবে দেখিতে শিখিয়াছেন অর্থাৎ কর্ম্মকর্ত্তা পরবশ কিন্তু চেতন পুরুষ আত্মবশ এই প্রভেদ যিনি বুঝিয়াছেন তিনিই অহঙ্কারশূন্য। যিনি কর্ম্মের হেতু অহঙ্কারকে জড়শক্তির বশতাপন্ন পরবশ জড়পদার্থ বলিয়া বুঝিয়াছেন এবং স্বাধীন আপ-নাকে চেতনপুরুষ বলিয়া জানিয়াছেন অহঙ্কারের কর্ম্মনিবন্ধন তিনি দায়ী হন না। ধর্ম্মরাজের বিচারালয়ে নীত হইলেও তিনি খালাস পাইয়া থাকেন।

দেবীচৌধুরাণীর গ্রন্থকার প্রফুল্লকে এই নিরহঙ্কারিতা শিক্ষা দিবার জন্য পবিত্র যোগশাস্ত্র ভগবদ্‌গীতাগ্রন্থরহস্যবিৎ পণ্ডিত ভবানী ঠাকুরের কাছে জ্ঞান শিক্ষার্থ পাঠাইয়াছেন। কেন না, এই জ্ঞান না জন্মাইলে প্রবৃত্তি অনুযায়ী কর্ম্ম নিষ্কাম হইতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

প্রবৃত্তি ধর্ম্ম ও নিবৃত্তি ধর্ম্ম।

শাস্ত্রকারগণ আমাদিগকে দুই রূপ ধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছেন। এক প্রবৃত্তিধর্ম্ম আর এক নিবৃত্তিধর্ম্ম। প্রথমতঃ বেদেই এই দুইরূপ ধর্ম্মের উপদেশাদি দেখিতে পাওয়া যায়। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, "দ্বিবিধোহি বেদোক্ত ধর্ম্মঃ, প্রবৃত্তিলক্ষণো নিবৃত্তিলক্ষণশ্চ।" এই দুই ধর্ম্মের প্রকৃত অর্থ কি তাহা এস্থলে দেখা যাউক।

শাস্ত্রে আছে, এই দুই ধর্ম্ম মনুষ্যসৃষ্ট নহে। জগতের সৃষ্টির সহিত ইহাও প্রথমে সৃষ্ট হইয়াছে। তবে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ঋষির দ্বারা ইহার প্রকৃত স্বরূপ প্রভৃতি নানা ভাবে বুঝান হইয়াছে এই মাত্র। শঙ্করাচার্য্য গীতাভাষ্যের উপক্রমণিকায় বলিয়াছেন,—

"স ভগবান সৃষ্ট্বেদং জগৎ তস্যচ স্থিতিং চিকীর্ষু মরীচ্যাদীনগ্রে সৃষ্ট্বা প্রজাপতীন্ প্রবৃত্তিলক্ষণং ধর্ম্মং গ্রাহয়ামাস বেদোক্তং, ততোঽন্যাংশ্চ সনকসনন্দনাদীনুৎপাদ্য নিবৃত্তিধর্ম্মং জ্ঞানবৈরাগ্যলক্ষণং গ্রাহয়ামাস।" অর্থ এই যে, ভগবান প্রথমে জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহার রক্ষার জন্য প্রজাপতিদের প্রবৃত্তিধর্ম্ম গ্রহণ করান, আর সনক সনন্দনাদিকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে জ্ঞান ও বৈরাগ্য লক্ষণযুক্ত নিবৃত্তিধর্ম্ম গ্রহণ করান।

এই কথার প্রকৃত অর্থ নির্দ্দেশ করা এস্থলে সম্ভব নহে। শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বসু মহাশয় নবজীবনে মন্বন্তর প্রবন্ধে ইহার আভাস দিয়াছেন। এস্থলে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল মাত্র।

"নিবৃত্তিধর্ম্মে তিনিই (ব্রহ্মই) সনক সনন্দন সনাতন ও সনৎকুমাররূপী পরম আদর্শ, এবং প্রবৃত্তিধর্ম্মে তিনিই মরীচি অত্রি প্রভৃতি প্রজাপতি। মরীচ্যাদি ব্রহ্মর্ষিগণ তাঁহার পুরুষ ও ব্রহ্মরূপ ধাতুর আবির্ভাব; এজন্য তাঁহারা ব্রাহ্মণ-প্রজাপতি শব্দে উক্ত হন; এবং মনুগণ তাঁহার শক্তি ও ক্ষেত্ররূপ ধাতুর অংশ; এজন্য তাঁহারা ক্ষত্রিয় প্রজাপতি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। * । পুরাণ শাস্ত্রের এই সমস্ত অর্থ বেদার্থে পূর্ণ।

সর্ব্ব প্রাণির ভোগশক্তি ও ভোগ্য বিষয় সংযুক্ত যে সত্ত্ব রজ তমোগুণময় প্রবৃত্তিধর্ম্ম বা প্রকৃতি, তৎসম্বন্ধে পরব্রহ্মের সমষ্টি নিয়ন্তৃত্ব বা কর্তৃত্ব অংশটী ব্রহ্মা নামে অভিহিত হয়। * *। এই নিমিত্ত জীবেতে সমষ্টি ভাবে দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, রিপু ও ভোগবাসনা সম্বন্ধে যত বিধি বর্ত্তমান আছে, সে সমস্তই ব্রহ্মার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বরূপ বলিয়া উক্ত হয়। * * *। সেই সার্ব্বভৌমিক দশ ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট মহা মানসবীজ হইতে জীব সমষ্টির প্রবৃত্তি রাজ্যের নিয়ামক দশবিধ ধর্ম্ম ধাতুর উৎপত্তি হইয়াছে * * তৎসমূহই ব্রাহ্মণ প্রজাপতি শব্দে উক্ত হয়। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, দক্ষ এবং নারদ এই দশজন ব্রাহ্মণ প্রজাপতি বা ব্রহ্মার মানস পুত্র।" (নবজীবন, দ্বিতীয় ভাগ, ৫১৩।১৪ পৃঃ দেখ।)

যাহা হউক, এই প্রবৃত্তিধর্ম্ম ও নিবৃত্তিধর্ম্ম বুঝা বড়ই কঠিন। ইহার স্বরূপ বুঝিলে আমাদের শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম সম্বন্ধে আর অধিক গোলযোগ থাকে না। কিন্তু এ কথা বুঝিতে হইলে প্রথমেই অনেক কথা বুঝিতে হইবে।

আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্‌কে এক্ষণে আর বুঝাইতে হইবে না যে কার্য্যই জগতের প্রাণ। কার্য্য হইতেই জগতের উৎপত্তি—এবং কার্য্যের দ্বারাই, জগতের পরিণতি হইয়া থাকে। আমাদের শাস্ত্রে এই কার্য্য শক্তিকে রজোগুণ কহে। সমষ্টি ভাবে ইহাকেই পুরাণে মুখ্যকল্পে স্রষ্টা ব্রহ্মা, আর গৌণ কল্পে তাঁহা হইতে উৎপন্ন মরীচি, প্রভৃতি ঋষিকে প্রজাপতি বলা হইয়াছে। ইহারাই জগত স্থিতির মূল কারণ।

এই জগতের কথা বুঝিতে হইলে আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। প্রাচীন ঋষিদের চিন্তাপ্রণালী ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদের চিন্তাপ্রণালী ভিন্ন প্রকৃতির হইলেও পরিণামে তাহা মিলিয়া যায়—উভয় প্রকার যুক্তির দ্বারাই পরিশেষে একরূপ মীমাংসায় উত্তীর্ণ হওয়া যায়, একথা আধুনিক পণ্ডিতগণ বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সুতরাং আমরা যদি আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত দ্বারা শাস্ত্রের গূঢ় রহস্য বুঝিতে যাই, তবে আমাদের লাভ ব্যতীত ক্ষতি নাই।

কার্য্য কিরূপে সম্পাদিত হয়, তাহার তত্ত্ব আধুনিক বিজ্ঞান সুন্দররূপে

মীমাংসা করিয়া দিয়াছে। বিজ্ঞান মতে একটা উচ্চতর শক্তি থাকে, এবং তাহার নিকট আর একটা নিম্নতর শক্তি থাকে। আর এই উচ্চতর শক্তি নিম্নতর শক্তিতে পরিণত হইতে আরম্ভ হয়। এই পরিণামের অবস্থাই ক্রিয়ার অবস্থা। এক কথায় যখন উচ্চতর শক্তি নিম্নতর শক্তিতে পরিণত হইতে থাকে, তখনই কার্য্য হয়। বিজ্ঞানের কথায় যখন higher potential Energy, lower potential energyতে (সংক্ষেপতঃ lower potential এ) পরিণত হয়, তখনই Kinetic Energyর আবির্ভাব হয়, এবং তাহা হইতে সেই পরিমাণে work উৎপন্ন হয়। এই উচ্চতর শক্তি এই প্রকারে ক্রিয়ারূপে পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে যখন সম্পূর্ণরূপে নিম্নতর শক্তিতে পরিণত হয়, তখন আর তাহার কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকে না। তবেই হইল, ক্রিয়া সাধিত হইবার জন্য একটা উচ্চতর শক্তি থাকা চাই—আর একটা নিম্নতর শক্তি থাকা চাই।—যে নিম্নশক্তি অপেক্ষা নিম্নতর শক্তি আর কল্পনা করা যায় না, বিজ্ঞানে তাহাকে Zero potential বলে।

আমাদের শাস্ত্রেও শক্তির এই তিনরূপ ভাব বা অবস্থার কথা অতি বিস্তারিত রূপে উল্লিখিত আছে। শাস্ত্রমতে এই উচ্চতর শক্তির নাম সত্ত্ব শক্তি, ক্রিয়া শক্তির নাম রজঃ শক্তি, আর নিম্নতর শক্তির নাম তমঃ শক্তি। এই সত্ত্ব শক্তি যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই কার্য্য সম্ভব হয় বলিয়া ইহাকে কার্য্যের স্থিতি কারণ কহে। রজঃ শক্তিকে ক্রিয়াত্মক কহে। আর তমঃ শক্তিতে কার্য্য শেষ হয়—তমঃ শক্তিতে পরিণত হইবার পর আর কার্য্য হইবার সম্ভাবনা থাকে না বলিয়া, ইহাকে আবরণ শক্তি কহে। এই সত্ত্ব শক্তি হইতে কার্য্যের প্রকাশ, রজঃ শক্তি কার্য্যের পরিণতি, ও তমঃ শক্তি হইতে কার্য্যের বিনাশ বা লয় কল্পিত হইতে থাকে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, জগতের এই যে ব্যক্তাবস্থা ইহাই তাহার কার্য্যাবস্থা। জগত ক্রিয়াত্মক—সুতরাং রজোগুণাত্মক। বলিয়াছি ত ইহার সৃষ্টি ও পরিণতি সমুদায়ই রজোগুণের কার্য্য। তবে ইহার মূলে উচ্চতর সত্ত্ব শক্তি থাকিয়াই এই জগত কার্য্য উৎপন্ন করিতেছে, নতুবা জগতের সৃষ্টি ও পরিণতি হইত না। এবং জগতের যে অংশটার

সত্ব শক্তি অত্যন্ত কমিয়া গিয়া, তাহার ক্রিয়া শক্তিরও একরূপ শেষ হইয়াছে, তাহা তমঃ রূপে পরিণত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

ইহা ব্যতীত অন্যরূপ অবস্থাও হইতে পারে, তাহা এস্থলে বলা আবশ্যক। (১) সুপ্ত শক্তি যদি রজঃ শক্তি ভাবে পরিণত না হইয়া সত্ব ভাবেই থাকে, (অর্থাৎ বিজ্ঞান মতে potential energy যদি potential ভাবেই থাকে) কিম্বা যদি (২) নিম্নতর শক্তি অন্য কোন কারণে অর্থাৎ সত্ব শক্তি অপেক্ষা আরও কোন উচ্চতর শক্তির (বুঝিবার সুবিধার জন্য একণে ইহাকে শক্তি বলা হইল) সহায়ে, সত্ব ভাবে উঠিতে পারে, এবং পরেও যদি সেই অবস্থাতেই থাকে, তবেও কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়।

এস্থলে সত্ব শক্তি অপেক্ষা আর একটা অনির্দ্দেশ্য উচ্চতর শক্তির কথা বলা হইল। এই শক্তির সহিত জগতের পরোক্ষ ভাবে সম্বন্ধ থাকিলেও প্রত্যক্ষ ভাবে সম্বন্ধ আমরা সহজে উপলব্ধি করিতে পারি না। তবে এস্থলে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে, এই উচ্চতর শক্তির অনুমান না করিলে এই জগত কার্য্য আদৌ বুঝা যায় না। কেন বুঝা যায় না তাহা বলিতেছি।

আমরা পূর্ব্বে যে সত্ব শক্তির কথা বলিলাম, তাহাই যদি একমাত্র উচ্চতম শক্তি হইত, অর্থাৎ তাহা অপেক্ষা যদি আর কোন উচ্চতর শক্তি (?) না থাকিত—তবে যথা সময়ে সেই শক্তি নিম্নতর শক্তির সান্নিধ্য জন্য, উচ্চ সত্ব শক্তি কার্য্য উৎপাদন করিতে করিতে কালসহকারে অতি সহজে নিম্ন শক্তিতে পরিণত হইয়া যাইত। আবার সেরূপ পরিণামের পক্ষেও আর কোনরূপ বাধা থাকিত না। এবং এরূপ পরিণামের পরেও আর কোনরূপ ক্রিয়া অসম্ভব হইত।

কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সেরূপ হয় না। আধুনিক বিজ্ঞান যথেষ্ট প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছে যে, জগৎ কার্য্য বহুদিন চলিতে চলিতে এমন এক সময় আসিবে, যখন জগতের আর পরিণতি সম্ভব হইবে না। তখনই ইহার প্রলয় হইবে। কিন্তু এই প্রলয় হইয়া জগতের একেবারে শেষ হইবে না। আবার কোন অনির্দ্দেশ্য কারণ বলে সেই নিম্নতর শক্তি উচ্চতর শক্তিতে উঠিয়া যাইবে, আবার জগতের সৃষ্টিও পরিণতি হইবে। এইরূপ সৃষ্টি ও প্রলয় কতবার হইয়াছে ও কতবার হইবে তাহার পরিমাণ করা যায় না।

এখন কোন্ শক্তি বলে এই নিম্নতর শক্তি উচ্চতর শক্তিতে পরিণত হয়—তাহা বিজ্ঞান বুঝাইতে পারে না—কেন না তাহা বিজ্ঞানের সীমার অতীত। কেন ইহা বিজ্ঞানের সাধ্যায়ত্ত নহে তাহা বলিতেছি। বিজ্ঞান শক্তির যেরূপ তত্ত্ব বুঝিতে পারে, তদনুসারে এই উচ্চতম শক্তিকে শক্তি বলিতে পারে না। কেন না তাহা হইলে ইহারও উচ্চ অবস্থা হইতে নিম্ন অবস্থাতে পরিণতি হইত—সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। কারণ বলিয়াছি ত—উচ্চতর শক্তি যদি পরিণাম দ্বারা নিম্নতর শক্তিতে না আসে, তবে আদৌ কোন ক্রিয়া হয় না; আর ক্রিয়া হইলে—তাহার নিম্নতর শক্তিতে পরিণামও অবশ্যম্ভাবী—এবং কাল বশে তাহার উচ্চতর অবস্থা গিয়া নিম্নতর অবস্থায় পরিণত হওয়াও অনিবার্য্য।

ইহা হইতে এই বুঝা গেল যে, যাহাকে আমরা উচ্চতম শক্তি বলিতে-ছিলাম, যাহাকে সত্ত্ব শক্তি অপেক্ষা আরও উচ্চতর ধরিয়াছিলাম, তাহাকে কোন রূপেই শক্তি বলা যায় না। শক্তির যে ধর্ম্ম—সত্ত্ব রজ ও তমঃ শক্তির যে গুণ এই উচ্চতর শক্তি সেই গুণাতীত, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। আমরা এই ব্যক্ত জগতের বুঝি—কেবল শক্তি, (বিজ্ঞান পরমাণুকেও শক্তির কেন্দ্র বা তাহার ক্ষুদ্রতম সমষ্টি বলিতে আরম্ভ করিয়াছে) আধুনিক বিজ্ঞানও কেবল এই শক্তির কথা বুঝিতে ও বুঝাইতে পারে। সুতরাং যাহা শক্তি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির—বিজ্ঞান তাহা বুঝাইতে পারে না, এবং আমরাও সহজে তাহার স্বরূপ বুঝিতে পারি না।

আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা যে সত্যে উপনীত হইলাম, আধু-নিক দর্শনশাস্ত্র মাত্র অবলম্বন করিয়াও অনেক পণ্ডিত এক্ষণে সেই সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন। এই জগতটাকে তাঁহারা relative existence অথবা phenomenal existence বলেন, এবং যাহার অবলম্বনে এই জগতটা প্রকাশিত হইয়াছে—এই জগত কার্য্য সুচারুরূপে চলিতেছে, তাঁহাকে ইঁহারা absolute existence বলেন। এই absolute existenceই গৌণ-কল্পে জগতের নিমিত্ত কারণ; এবং ইহা হইতে কোন অজ্ঞেয় উপায়ে এই যে সত্ত্ব, রজ, তম—এই তিন শক্তির আবির্ভাব হওয়ায় এই জগত কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে, তাহাই ইহার নিমিত্ত কারণ। পণ্ডিতেরা বলেন যে

এই জগত ত' সীমাবদ্ধ—আমরা ইহার অন্ত ধারণা করিতে না পারিলেও ইহা অনন্ত নহে; জগত সসীম। কিন্তু অসীম আধার ব্যতীত সসীম কল্পনা করা যায় না। অতএব সান্ত জগতের যে অনন্ত আধার—অনন্ত কারণ নাই তাহা বলিতে পার না,—কেননা তাহা আমাদের ধারণার সীমার অতীত।

যাউক, আধুনিক দর্শনের কথা এস্থলে বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। কেবল একটা কথা বলি যে—সত্বাদি শক্তির যে অনন্ত উৎস বা আধারের কথা বলিলাম—পণ্ডিতবর স্পেন্সর তাহাকেই eternal বা inexhaustible energy বলিয়াছেন। প্রসিদ্ধ জর্ম্মাণ পণ্ডিত কুঁজে বলিয়াছেন, "The Universe is the Deity passing into activity but not exhausted by the act." সে যাহা হউক আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, ইহাকে শক্তি বলা যায় না। অনন্ত শক্তি বলিলেও বিজ্ঞান মতে তাহা ভ্রমপূর্ণ বোধ হইবে। এই জন্য আমাদের শাস্ত্রে ইহাকে নির্গুণ (ত্রিগুণাতীত) অথচ গুণ ভোক্তা বলা হইয়াছে। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন,

"যে চৈব সাত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি।"

এই বিজ্ঞান ও দর্শন হইতে যে কথার সামান্য আভাস মাত্র পাওয়া যায়, আমাদের শাস্ত্রে সেই তত্ত্ব আরও বিশদ রূপে বুঝান আছে। যে সত্ত্ব রজ ও তম শক্তি হইতে এই জগতে, উৎপত্তির সমষ্টি ভাবে তাহাদিগকেই আমাদের শাস্ত্রে মায়া বা মূল প্রকৃতি বলা হইয়াছে। আর যে অনন্ত শক্তিমানের সন্নিধি জন্য এই প্রকৃতি অনন্ত কাল, অনন্তবার জগতের সৃষ্টি প্রলয় করিতেছে, তাহাকেই শাস্ত্রে পুরুষ বলে। এই পুরুষ ও প্রকৃতি দুই—এক মূল কারণের দুইরূপ বিকাশ মাত্র। এই মূল কারণকে শাস্ত্রে ব্রহ্ম কহে। তিনিই সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন। ইঁহারই কোন অজ্ঞাত শক্তি—ইচ্ছা (ঈক্ষণ) বিকশিত সৃষ্টি শক্তিই সত্ব রজ তমগুণাত্মক প্রকৃতিরূপে প্রকাশিত—আর সেই প্রকৃতিকে নিয়মিত করিবার জন্য সেই পরিমাণ শক্তি (?) পুরুষ রূপে অধিষ্ঠিত। এই পুরুষকে সমষ্টি ভাবে হিরণ্যগর্ভ বা বৈরাজ পুরুষ, আর ব্যষ্টি ভাবে জীবাত্মা বলে। যাহা হউক, এই সমষ্টি ও ব্যষ্টির কথা পরে বলিতেছি।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে আমরা এই বুঝিলাম যে, সত্ত্ব শক্তির ক্রমশঃ

পরিণামের দ্বারা রজো বিশাল—বা কার্য্যাত্মক জগতের সৃষ্টি ও পরিণতি হয়। আর এই সত্ত্ব শক্তিই বল, আর তম শক্তিই বল, এই পুরুষের (উচ্চতম শক্তির ?) সান্নিধ্য জন্য সত্ত্বরূপে থাকিয়া বা সত্ত্বভাবে পরিণত হইয়া সেই ভাবেই থাকিতে পারে। এই সত্ত্ব শক্তির তমঃ পরিণাম অবস্থাই রজোময় সৃষ্টির অবস্থা। এই সময়কেই রজোগুণাধার ব্রহ্মার জাগ্রতাবস্থা বলে। আর তমঃ পরিণামের চরম অবস্থাই প্রলয়ের প্রথমাবস্থা—ইহাই ব্রহ্মার নিদ্রাবস্থা। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন,

"অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্ত সংজ্ঞকে॥"

তাহার পর পুরুষের সান্নিধ্যে তমঃ শক্তির পুনর্ব্বার উচ্চতর সত্ত্ব শক্তিতে উন্নতিই প্রলয়ের শেষ অবস্থা। এবং তাহার পরেই সত্ত্বের তমঃ পরিণাম আরম্ভ হইলেই সৃষ্টি আরম্ভের অবস্থা। ইহাই জগৎ চক্র—অনন্ত কাল চলিয়া আসিতেছে। এস্থলে আমরা অন্যরূপ দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতে পারি যে, জগতের দুইদিকে যেন দুইটী বিপরীত আকর্ষণ কেন্দ্র রহিয়াছে। এক ব্রহ্ম, আর একটী মায়া; অথবা এক পুরুষ আর এক প্রকৃতি। তমঃ শক্তির আকর্ষণ প্রাবল্যে যখন জগত ব্যক্ত রূপ ধারণ করিয়া তমঃ-প্রধান প্রকৃতি অভিমুখে আসে, তখনই জগতের সৃষ্টি অবস্থা। আর যখন পুরুষ বা ব্রহ্মের আকর্ষণ প্রাবল্য জন্য জগত তমঃ হইতে ব্রহ্মাভিমুখে আসে, তখনই ইহার প্রলয় অবস্থা। জগত রূপ দোলক যেন ব্রহ্ম ও মায়া এই দুইটীর মধ্যে অনবরত দুলিতেছে; তাই সৃষ্টি ও প্রলয় অনবরত হইতেছে। [ইহা ব্যতীত প্রাকৃত প্রলয় আছে, তাহার বিবরণ এস্থলে নিষ্প্রয়োজন।]

আমরা পূর্ব্বে যে সকল তত্ত্বের আভাস দিলাম, একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা (যাহাকে ন্যায়ে সামান্য অনুমান বা analogy বলে, তাহার দ্বারা) এই সকল কথা বিশদ করিতে চেষ্টা করিব। সাংখ্য শাস্ত্রে জগৎ কার্য্যে পুরুষের উপযোগীতা বুঝাইবার সময় উক্ত আছে,

তৎ সন্নিধানাদধিষ্ঠাতৃত্বং মণিবৎ॥ ১। ৯৬॥

অর্থাৎ স্পর্শ মণি (বা চুম্বক) নিকটে থাকিলে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লৌহ ও সেই চুম্বক গুণপ্রাপ্ত হয়—প্রকৃতিও পুরুষের নিকট থাকায় সেইরূপ ক্রিয়া

শীল হইয়াছে। আমরাও মহাজনের পথ অনুসরণ করিয়া কতকটা এই রূপ দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিব।

আমরা এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডটাকে এক খণ্ড বৃহৎ চুম্বকের সহিত তুলনা করিব। চুম্বকের একদিকে যেমন উত্তরমুখী চুম্বকশক্তি কেন্দ্রীভূত থাকে, আর একদিকে ঠিক তাহার বিপরীত ধর্ম্মযুক্ত দক্ষিণমুখী চুম্বক শক্তি থাকে, এই ব্রহ্মাণ্ডেরও তেমনি এক সীমায় পুরুষ শক্তি (?) আর অপর সীমায় তমঃ শক্তি রহিয়াছে। দুই দিকে এই দুইটী শক্তিকেন্দ্র থাকাতেই এই জগত কার্য্য সংসাধিত হইতেছে চুম্বকের যেমন দুই দিকস্থ চুম্বক শক্তি পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মযুক্ত, পুরুষ ও তমশক্তিও সেইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মযুক্ত। এক নির্গুণ আর এক সগুণ; এক নিষ্ক্রিয় আর এক সক্রিয়; এক শুদ্ধ আর এক মলিন; এক চৈতন্য আর এক জড়; তবে এই দুইটীই জগতের নিত্য ও স্থায়ী ভাব—পরস্পরের মধ্যে এই মাত্র সাদৃশ্য।

এই তমই—প্রকৃতির আর এক নাম। তবে এইমাত্র বিশেষ যে সত্ত্ব রজ ও তম শক্তির সাম্যাবস্থা যে প্রকৃতি—এই তমই তাহার মূল কারণ। শ্রুতিতে আছে,

"তম এবেদমগ্র আস, তৎপরেণেরিতং বিষমত্বং প্রয়াতদ্বৈ
রজসো রূপং, তদ্রজঃ খল্বীরিতং বিষমত্বং প্রয়াত্যেতদ্বৈ-
সত্ত্বস্য রূপমিতি।"

অর্থাৎ সর্ব্বাগ্রে সৃষ্টির পূর্ব্বে, একমাত্র শক্তিই তমোরূপে বিদ্যমান ছিল। পরে বৈষম্যবশতঃ সেই তমশক্তির রজ পরিণাম, এবং রজ হইতে সত্ত্ব পরিণাম হয়।

তবেই দেখা গেল যে, এই পুরুষের অধিষ্ঠান জন্য—তমঃশক্তি উচ্চতর সত্ত্ব শক্তিতে পরিণত হয়, রজঃ বা ক্রিয়া শক্তির আবির্ভাব হয়। তাহার পর এমন এক সময় আইসে, যখন সত্ত্ব রজ ও তম তিনটীর—সমভাবে থাকায় সাম্যাবস্থা উপস্থিত হয়, উচ্চ বা নিম্ন পরিণতি বন্ধ হয়। এই অবস্থাকেই সাংখ্যশাস্ত্রে মূলপ্রকৃতি বলে। এই সময়ে সত্ত্ব শক্তির চরম (উচ্চ) পরিণতি হয়। ইহার পরেই সত্ত্বের নিম্নতর রজঃ শক্তিতে পরিণাম আরম্ভ হয়—জগতেরও সৃষ্টি হইতে থাকে।

এই সৃষ্টিকার্য্য শেষ হইলে যে অবস্থা দাঁড়ায় তাহাতে দেখা যায় যে, এই সত্ত্ব শক্তি প্রধানতঃ যে স্থানে বা যে অংশে রজঃ শক্তি বা কার্য্য উৎপন্ন করিয়া তমঃশক্তিতে পরিণত হইতে থাকে, সেই রজোবিশাল অংশকে পৃথিবী কহে। যে অংশের সত্ত্ব সত্ত্ব-ভাবেই থাকে, পুরুষের অত্যন্ত সান্নিধ্য জন্য রজ তম ভাবে পরিণত হইতে পারে না, তাহাকে স্বর্গ (ছয় স্বর্গ—যথা ভুব, স্ব, মহঃ, জন, তপ, সত্য।) বা সত্ত্ববিশাল উর্দ্ধ লোক বলে। আর যে অংশের সত্ত্ব শক্তি রজঃ উৎপন্ন করিয়া, তম ভাবে অনেকটা পরিণত হওয়ায় তাহার কার্য্যকরী শক্তি প্রায় লোপ পাইয়াছে, তাহাকে পাতাল কহে। এই পাতালের মধ্যেই মূল তমো কেন্দ্র আছে। নিম্নলিখিত চিত্রদ্বারা ইহা আরও বিশদরূপে বুঝা যাইবে।

সত্ত্ববিশাল উর্দ্ধলোক রজোবিশাল মধ্যলোক বা কর্ম্মভূমি পৃথিবী। তমঃ বিশাল অধঃলোক

পরম পুরুষ	সত্যলোক তপলোক জনলোক মহর্লোক স্বর্লোক ভুবর্লোক	মনুষ্য পশু ও মৃগ (নিম্নতর প্রাণী) উদ্ভিদ মৃত্তিকাদি inorganic substance	সপ্ত পাতাল	তমঃ প্রধানা প্রকৃতি zero potential

উল্লিখিত চিত্র হইতে চতুর্দ্দশ ভুবনবিশিষ্ট জগৎস্তর বা ব্রহ্মাণ্ডের অনেক কথা বুঝা যাইবে। ইহা ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত চুম্বকের দৃষ্টান্ত ধরিয়া আমরা আরও অনেক কথা বুঝিতে পারিব। বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতেরা বলেন যে, একখানি বৃহৎ চুম্বকের প্রত্যেক পরমাণুই এক একটী ক্ষুদ্র চুম্বক বিশেষ। প্রত্যেক পরমাণুতেই উত্তর মুখী ও দক্ষিণমুখী উভয় প্রকার চুম্বক শক্তিরই বিকাশ হয়। সকল পরমাণুগুলিরই উত্তর মুখী চুম্বক শক্তি এক দিকে, এবং দক্ষিণমুখী চুম্বক শক্তি তাহার বিপরীত দিকে থাকে। এই সমস্ত পরমাণুর এইরূপ সমবায়েই একখানি বৃহৎ চুম্বক হয়।

সেইরূপ জগত সম্বন্ধেও বলা যায়। পূর্ব্বে যে ব্যষ্টি ও সমষ্টির কথা বলিয়াছি, তাহা এইবার বুঝা যাইবে। আমরা সমগ্র জগতের যে, নিয়ম উপরে বুঝাইলাম—জগতের প্রত্যেক সত্তা সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। অর্থাৎ জগতের প্রত্যেক পদার্থ পৃথক ভাবে দেখিলেও সেই নিয়ম দেখা যাইবে।

শাস্ত্রে আছে, "এক বিজ্ঞানেন সর্ব্ব বিজ্ঞানং ভবতি।" অতএব সমস্ত জগতের যাহা নিয়ম, তোমার আমার সম্বন্ধেও তাই নিয়ম—আর সামান্য বালুকণা সম্বন্ধেও তাহাই নিয়ম। তাই সমস্ত জগতের কথা ছাড়িয়া দিয়া, এক একটী পদার্থকে পৃথক ভাবে দেখিলেই ব্যষ্টিভাবে দেখা হইল। এইরূপ সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করাই জ্ঞানের চরম উদ্দেশ্য। এক্ষণে যাহাকে বিজ্ঞান বলে, তাহাতে যে সকল নিয়ম আবিস্কৃত হইয়াছে তাহা এরূপ সাধারণ নহে। পণ্ডিত হর্বাট স্পেন্সর তাহাকে partially unified knowledge বলিয়াছেন। কেবল হিন্দু বিজ্ঞানেই সেই জ্ঞান "completely unified" হইয়াছে।

যাহা হউক সমুদায় জগৎ তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিয়া জীব সম্বন্ধে আমরা এই বুঝিতে পারিলাম যে, তাহার মধ্যেও প্রকৃতি পুরুষ রহিয়াছে। তাহার মধ্যেও প্রকৃতির সত্ত্ব রজ ও তম এই ত্রিবিধ শক্তিই রহিয়াছে। তবে এই ত্রিবিধ শক্তি কাহারও মধ্যে সমভাবে থাকিতে পারে না।

কেন পারে না, তাহা বুঝিতে হইলে আবার সেই চুম্বকের দৃষ্টান্ত লইতে হইবে। চুম্বকের ঠিক মধ্যস্থলে কোনরূপ আকর্ষণ নাই বলিলেই হয়—কেন না দুই দিকে, দুই বিপরীত ধর্ম্মযুক্ত শক্তি বিপরীত দিক হইতে সমান ভাবে আকর্ষণ করে বলিয়া, উভয় শক্তির কার্য্য ক্ষমতাই লোপ হয়। তাহার পর যদি দক্ষিণমুখী চুম্বকের দিকে যাও তখন দেখিবে যে দক্ষিণমুখী চুম্বকের শক্তি বাড়িতেছে—আর উত্তরমুখী চুম্বকের আকর্ষণ কমিতেছে। এক কথায় এই মধ্যস্থল হইতে উত্তরমুখী চুম্বকের দিকে যাইলে কেবল উত্তরমুখী চুম্বকের আকর্ষণই অনুভূত হইবে—আর দক্ষিণমুখী চুম্বকের দিকে যাইলে কেবল দক্ষিণমুখী চুম্বকের আকর্ষণই বোধ হইবে।

জগৎ সম্বন্ধেও প্রায় এইরূপ নিয়ম। উপরের চিত্রে পৃথিবী ও ঊর্দ্ধ লোকের মধ্যে যে রেখা আছে—তাহা হইতে যত ঊর্দ্ধ লোকে যাইবে ততই প্রত্যেক জীবে সত্ত্বের ভাগ অধিক আছে, আর সে সত্ত্ব শক্তি ক্রিয়া রূপে পরিণত হইবার অবস্থার অতীত—কারণ তাহার তমঃ আকর্ষণ কোনরূপ কার্য্যকারী নহে ইহা বেশ বুঝিতে পারিবে। তাহাদের মধ্যে আত্মা বা পরমপুরুষ অত্যন্ত নিকটস্থ (আভাষ চৈতন্য) আছে দেখিবে।

তাহার পর এই রেখার পরেই পৃথিবীর মনুষ্য। সুতরাং ইহাদের মধ্যে সাধারণতঃ উর্দ্ধদিকে গতি ও অধোদিকে গতি হইবার শক্তি প্রায়, সমানভাবে আছে দেখিতে পাইবে। সেই শক্তির সামান্য তারতম্য হইলেই হয় সত্ত্ব শক্তি কিম্বা তমঃ শক্তি প্রবল হইবে। তমঃশক্তি প্রবল হইলেই, তাহার সত্ত্ব শক্তি কার্য্য বা রজোরূপে পরিণত হইতে থাকিবে—তাহাকে অধোভাগে লইয়া যাইতে থাকিবে। আর যদি, সত্ত্বভাগ প্রবল হয়, তবে তাহার পরম পুরুষের দিকে গতি হইবার উপক্রম হইবে—তাহার ক্রমে উর্দ্ধগতি হইবে। সুতরাং এই দুই শক্তির মধ্যে মনুষ্য একরূপ মধ্যস্থলে (neutral ground এ) আছে বলিতে হইবে। তবে উপরের চিত্র হইতে অনুমিত হইবে যে যাহারা সন্নিস্থলের অতি নিকট তাহাদের পক্ষেই এই নিয়ম—যাহারা অপেক্ষাকৃত দূরস্থ, তাহাদের তমঃ আকর্ষণ অধিক, সুতরাং সেই দিকেই প্রধানতঃ তাহাদের গতি হয়।

ইহার পরেই পশু মৃগ বা ইতর প্রাণী। অবশ্য ইহাদের সত্ত্ব ভাগ মনুষ্য অপেক্ষা অনেক অল্প, এবং রজ ও তমভাগ অধিক। উদ্ভিদে সত্ত্বভাগ আরও অল্প, তমভাগ অত্যন্ত প্রবল—আর মৃত্তিকাদিতে তমঃ ভাগ অতিশয় বৃদ্ধি হয়। তাহাদের মধ্যে পুরুষ অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়ে, অথবা কূটস্থ ভাবে থাকে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে কার্য্য হইলেই উচ্চতর শক্তি নিম্নতর শক্তিতে পরিণত হয়। সুতরাং যে পদার্থ বা যে জীব হইতে কার্য্য হইবার কোন সম্ভাবনা আছে, সেই পদার্থ বা সেই জীবেরই সত্ত্ব শক্তি বিক্ষিপ্ত হইয়া ক্রিয়ারূপে পরিণত হয়—এই ক্রিয়ার সমষ্টি হইতেই বাস্তবিক পক্ষে জগৎ কার্য্য চলিতে থাকে। জীবে সত্ত্বশক্তি উদ্ভিদাদি অপেক্ষা অনেক অধিক, তাই তাহা হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ক্রিয়ার বিকাশ হইতে পারে। উদ্ভিদের সত্ত্ব শক্তি অল্প, তাহার ক্রিয়ার বিকাশও অল্প। আর জড় মৃত্তিকাদির সত্ত্ব শক্তি নাই বলিলেই হয়, তাই তাহাদেরও ক্রিয়া শক্তি বড় অধিক নাই। এস্থলে আরও বুঝিতে হইবে যে, সত্ত্বশক্তি ক্রিয়ারূপে পরিণত হইলে, সুধু যে সত্ত্ব শক্তির পরিমাণ কমিয়া যায় তাহা নহে, সত্ত্বশক্তিও নিম্নস্তরে আসিয়া পড়ে—অর্থাৎ সত্ত্ব শক্তিও অনেকটা হীনবীর্য্য হয়। এমনা বৃক্ষের সত্ত্ব শক্তি আর আমার সত্ত্ব শক্তি একরূপ নহে।

এ সম্বন্ধে আরও একটা কথা বুঝা আবশ্যক। উদ্ভিদ বা জড়ে যে পরিমাণ সত্ত্ব শক্তি আছে তাহার তমপরিণাম হইবার—এবং তৎসহ কার্য্য উৎপন্ন হওবার পক্ষে কোন বাধা নাই। কারণ বলিয়াছিত, উদ্ভিদে তম শক্তির আকর্ষণ অত্যন্ত বলবৎ, তাহার মধ্যে পুরুষ অত্যন্ত দূরে স্থিত। এই জন্য তাহার সত্ত্ব শক্তি পুরুষের সান্নিধ্যবলে নিরোধ করিবার কোনই ক্ষমতা নাই। সাধারণ পশু মৃগ প্রভৃতি জীব সম্বন্ধেও প্রায় এই নিয়ম। তাহাদের মধ্যেও যে নিম্নস্তরের সত্ত্ব শক্তি অল্প পরিমাণে আছে, তাহাও সহজে কার্য্য-রূপে পরিণত হইবার পক্ষে কোন বাধা থাকে না। তাহাদেরও সেই সত্ত্ব শক্তি নিরোধ করিবার ক্ষমতা অতি অল্পই আছে। কিন্তু মনুষ্য সম্বন্ধে নিয়ম সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পূর্ব্বে বলিয়াছিত তাহারা অনেক পরিমাণে মধ্যভূমিতে অবস্থিত। অর্থাৎ পুরুষের আকর্ষণ ও তম শক্তির আকর্ষণ—তাহাদের মধ্যে প্রায়ই সমশক্তিসম্পন্ন। একারণ তাহাদের যে উচ্চতর সত্ত্বশক্তি আছে, সে শক্তি পুরুষের আকর্ষণে নিরুদ্ধ হইয়া উর্দ্ধদিকেও উঠিতে পারে। কিম্বা প্রকৃতির আকর্ষণে রজোরূপে বা কার্য্যরূপে বিক্ষিপ্ত হইয়া অধঃ বা তম দিকেও যাইতে পারে। এই জন্য ইহার একটীকে আমাদের শাস্ত্রে উর্দ্ধ-স্রোতস্বিনীবৃত্তি, আর অপরটীকে অধঃস্রোতস্বিনীবৃত্তি কহে। পূর্ব্বে বলিয়াছি মনুষ্যের মধ্যে যাহারা আবার ঠিক কেন্দ্রস্থলের নিকটস্থ তাহাদেরই উর্দ্ধদিকে গমন সম্ভব ও অতি সহজ। আর যাহারা এই কেন্দ্র হইতে দূরস্থ, তাহারা অপেক্ষাকৃত তমশক্তির (বা প্রকৃতির) আকর্ষণে বিমোহিত—সুতরাং তাহাদিগের উর্দ্ধদিকে গমন অত্যন্ত কঠিন. তাহারাই সহজে তমঃ বা অধোদিকে গমন করিতে থাকে। আবার ইহাদের মধ্যে যাহাদের সত্ত্ব অধিক তাহাদের তমঃ পরিণামে অধিক পরিমাণে রজঃশক্তি উৎপন্ন হয়, আর যাহাদের সত্ত্ব অল্প, এবং সর্ব্বাপেক্ষা তমঃ শক্তির নিকটস্থ—তাহাদের রজশক্তি বা কার্য্য তত অধিক উৎপন্ন হয় না—এবং তাহাদের সহজেই তমঃ পরিণাম হওয়া সম্ভব। অতএব সৃষ্ট জীবের মধ্যে মনুষ্যের এই এক অদ্ভুত ক্ষমতা আছে যে, তাহারা চেষ্টা ও যত্ন করিলে, তাহাদের অন্তর্নিহিত সত্ত্বশক্তির কার্য্যরূপে পরিণাম বা বিক্ষেপ নিরুদ্ধ বা বদ্ধ করিয়া রাখিয়া, ক্রমে উর্দ্ধদিকে পুরুষের সন্নিধানে ধীরে ধীরে গমন করিতে পারে।

যাহা হউক আমরা এতক্ষণ যাহা বলিতেছিলাম, তাহা হইতে অনেক কথা বুঝা যাইবে। সম্প্রতি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ধর্ম্মের কথা বুঝা যাউক। আমরা পূর্ব্বে যে সত্ত্ব শক্তির বা ক্রিয়ারূপে পরিবর্ত্তনের কথা বলিয়াছি, তাহাকেই সংক্ষেপে প্রবৃত্তি ধর্ম্ম বলা যায়। ইহাকেই আবার অন্যভাবে বিক্ষেপ শক্তির অধঃস্রোতস্বিনীবৃত্তি বলা যায়। বলিয়াছি ত এই প্রবৃত্তি ধর্ম্ম বা বিক্ষেপ শক্তির দ্বারাই সমুদয় জগৎ কার্য্য সংসাধিত হইতেছে। এই প্রবৃত্তি ধর্ম্ম না থাকিলে, জগৎ আদৌ থাকিতে পারিত না। শুধু তাহাই নহে, সত্ত্ব শক্তির যতক্ষণ এই রজঃ পরিণাম, বা এই প্রবৃত্তির অবস্থা থাকে, ততক্ষণই সৃষ্টি কার্য্য চলিতে থাকে। রজঃ পরিণাম বন্ধ হইলেই সৃষ্টি কার্য্য বন্ধ হয়। তখন জগতের প্রলয়াবস্থা উপস্থিত হয়।

এই ত গেল প্রবৃত্তি ধর্ম্ম। ইহা ব্যতীত জগতের আর এক ধর্ম্ম আছে, তাহাও আমরা পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি। যখন জগতের তমঃ পরিণাম হয়, সত্ত্বশক্তি প্রায় একেবারে লোপ পায়, সুতরাং রজঃশক্তির বিকাশ হইয়া জগৎকার্য্য চলিবার যখন আর কোন সম্ভাবনা না থাকে, তখন পুনর্ব্বার পুরুষ সান্নিধ্য জন্য তমঃ শক্তির ঊর্দ্ধ পরিণাম হইয়া সত্ত্বশক্তির উৎপত্তি হয়। যতক্ষণ তমঃ হইতে সত্ত্ব উৎপন্ন না হয়, ততক্ষণই জগতের প্রলয়াবস্থা থাকে। ইহাকেই জগতের নিরোধ অবস্থা নিবৃত্তি অবস্থা বা ঊর্দ্ধস্রোত অবস্থা কহে। এই নিরুদ্ধ অবস্থায় ক্রিয়া বন্ধ হয়—ব্রহ্মা নিদ্রিত হন, ব্যক্তজগত অব্যক্তে বিলীন হয়। ইহাই জগতের প্রবৃত্তি ধর্ম্ম ও নিবৃত্তি ধর্ম্ম—অথবা সৃষ্টি অবস্থা ও প্রলয় অবস্থা।

এই ত গেল জগতের প্রবৃত্তি ধর্ম্ম ও নিবৃত্তি ধর্ম্ম। ইহা ব্যতীত মনুষ্য সম্বন্ধেও প্রবৃত্তি ধর্ম্ম এবং নিবৃত্তি ধর্ম্ম আছে। ইহা বুঝাইবার জন্যই এত কথা বলা হইল।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এই জগতের সহিত আমরা লিপ্ত। আমাদের যে সত্ত্ব শক্তি আছে, তাহার সহায়ে আর রজোগুণ দ্বারা আমরা সর্ব্বদা কার্য্য করিতে থাকি। কার্য্য করাই সাধারণতঃ মনুষ্যের ধর্ম্ম। মনুষ্যের এই কার্য্য-মুখী প্রবৃত্তিকেই শাস্ত্রে প্রবৃত্তিধর্ম্ম বলে। প্রাণী মাত্রেই এই প্রবৃত্তিধর্ম্মের অধীন। তবে মনুষ্যে সত্ত্ব শক্তি অধিক থাকায়, তাহারও প্রবৃত্তি ধর্ম্ম অধিক

বিকশিত হইতে পারে। অতএব এই কার্য্য করাই মনুষ্যের স্বধর্ম্ম। ইহাই তাহার বিক্ষেপশক্তি। আর প্রকৃতিই এই শক্তি উত্তেজনার মুখ্য কারণ।

কিন্তু ইহা সাধারণ মনুষ্যের ধর্ম্ম হইলেও, মানুষের আর এক শক্তি আছে—তাহাকে নিরোধ শক্তি বলে। এ কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। আমরা দেখাইয়াছি যে মনুষ্যের মধ্যে যাহারা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান, যাহারা পুরুষ প্রকৃতির ঠিক সন্ধি স্থলে থাকিয়া, প্রকৃতির আকর্ষণকে প্রতিহত করিতে পারে, তাহারা তাহাদের সত্ত্ব শক্তি নিরুদ্ধ করিয়া—তাহার রজঃ পরিণাম বন্ধ করিয়া, ক্রমেই পুরুষের সন্নিধানে অগ্রসর হইতে থাকে। কিন্তু এরূপ লোক অতি বিরল। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন,

"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যতিত সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাংবেত্তি তত্ত্বতঃ॥"

সুতরাং এরূপ লোক সহস্রের মধ্যে একজনও নাই; আর যাহারা আছে, তাহাদের মধ্যে অতি অল্প লোক সিদ্ধ হইতে পারে। তবে অন্যান্য প্রাণীদের ত আর কথাই নাই, তাহাদের মধ্যে নিরোধ বা নিবৃত্তি ধর্ম্ম আদৌ নাই। মানুষের এই সিদ্ধির জন্য চেষ্টা এবং সত্ত্ব শক্তিকে নিরুদ্ধ করিয়া তাহার রজঃ পরিণাম বন্ধ করাই আমাদের নিবৃত্তি ধর্ম্ম। ইহার মূল কথা গুলি আমরা বারান্তরে বুঝাইব।

জ্ঞান।

[এই সংখ্যায় ভগবদ্গীতার ১২ শ্লোকের টীকায় প্রমাণ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা অতি সংক্ষিপ্ত। বঙ্কিম বাবুর প্রণীত অপর একটি প্রবন্ধে এই তত্ত্ব সবিস্তারে বুঝান হইয়াছে। ঐ প্রবন্ধটী প্রথমে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়. পরে পুনর্মুদ্রিত হয়। কিন্তু একণে উহা অপ্রাপ্য। প্রচারের অনেক পাঠকই বোধ হয় উহা পড়েন নাই এবং ইচ্ছা করিলেও পাইবেন না। অতএব উহা আমরা এই সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত করিলাম। পুনর্মুদ্রিত করিবার তাৎপর্য্য এই যে যাঁহারা গীতার দ্বাদশ শ্লোকের টীকা পড়িবেন, তাঁহারা এই প্রবন্ধ পড়িলে প্রমাণতত্ত্ব বিশদরূপে বুঝিতে পারিবেন।—প্রঃ সং]

সেই জ্ঞান কি? আকাশ কুসুম বলিলেও একটি জ্ঞান হয়—কেন না আকাশ কি তাহা আমরা জানি, এবং কুসুম কি তাহাও জানি, মনের শক্তির দ্বারা উভয়ে সংযোগ করিতে পারি। কিন্তু সে জ্ঞান, দর্শনের উদ্দেশ্য নহে। তাহা ভ্রমজ্ঞান। যথার্থ জ্ঞানই দর্শনের উদ্দেশ্য। এই যথার্থ জ্ঞানকে প্রমাজ্ঞান বা প্রমা প্রতীতি বলে। সেই যথার্থ জ্ঞান কি?

যাহা জানি তাহাই জ্ঞান। যাহা জানি তাহা কি প্রকারে জানিয়াছি?

কতকগুলি বিষয় ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ সংযোগে জানিতে পারি। ঐ গৃহ, এই বৃক্ষ, ঐ নদী এই পর্ব্বত, আমার সম্মুখে রহিয়াছে; তাহা আমি চক্ষে দেখিতে পাইতেছি, এজন্য জানি যে ঐ গৃহ, এই বৃক্ষ, ঐ নদী, এই পর্ব্বত আছে। অতএব জ্ঞাতব্য পদার্থের সঙ্গে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগে আমাদিগের এই জ্ঞান লব্ধ হইল। * ইহাকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ বলে। এইরূপ, গৃহমধ্যে থাকিয়া শুনিতে পাইলাম, মেঘ গর্জ্জিতেছে, পক্ষী ডাকিতেছে; এখানে মেঘের ডাক, পক্ষীর রব আমরা কর্ণের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিলাম। ইহা শ্রাবণ প্রত্যক্ষ। এইরূপ চাক্ষুষ, শ্রাবণ, ঘ্রাণজ, ত্বাচ, এবং রাসন, পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাধ্য পাঁচ প্রত্যক্ষ। মনও একটি ইন্দ্রিয় বলিয়া আর্য্য দার্শনিকেরা গণিয়া থাকেন, অতএব তাঁহারা মানস প্রত্যক্ষের কথা বলেন। মন বহিরিন্দ্রিয় নহে। অন্তরিন্দ্রিয়ের সঙ্গে বহির্ব্বিষয়ের সাক্ষাৎসংযোগ অসম্ভব। অতএব মানস প্রত্যক্ষে বহির্ব্বিষয় অবগত হওয়া যায় না; কিন্তু অন্তর্ব্বিষয় জ্ঞান, মানস প্রত্যক্ষের দ্বারাই হইবে।

যে পদার্থ প্রত্যক্ষ হয়, তদ্বিষয়ে আমাদিগের জ্ঞান জন্মে, এবং তদ্ব্যতিরিক্ত বিষয়ের জ্ঞানও সূচিত হয়। আমি রুদ্ধদ্বার গৃহমধ্যে শয়ন করিয়া আছি, এমত সময়ে মেঘের ধ্বনি শুনিলাম, ইহাতে শ্রাবণ প্রত্যক্ষ হইল। কিন্তু সে প্রত্যক্ষ ধ্বনির, মেঘের নহে। মেঘ এখানে আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। অথচ আমরা জানিতে পারিলাম যে আকাশে মেঘ আছে। ধ্বনির প্রত্যক্ষে মেঘের অস্তিত্ব জ্ঞান হইল কোথা হইতে? আমরা পূর্ব্বে পূর্ব্বে দেখিয়াছি, আকাশে মেঘ ব্যতীত কখন ঐরূপ ধ্বনি হয় নাই। এমন কখনও ঘটে নাই যে, মেঘ নাই, অথচ ঐরূপ ধ্বনি শুনা গিয়াছে। অতএব রুদ্ধদ্বার গৃহমধ্যে থাকিয়াও আমরা বিনা প্রত্যক্ষে জানিলাম যে আকাশে মেঘ হইয়াছে। ইহাকে অনুমিতি বলে। মেঘধ্বনি, আমরা প্রত্যক্ষ জানিয়াছি, কিন্তু মেঘ, অনুমিতির দ্বারা।

মনে কর, ঐ রুদ্ধদ্বার গৃহ অন্ধকার, এবং তুমি সেখানে একাকী আছ। এমত কালে তোমার দেহের সহিত মনুষ্যশরীরের স্পর্শ অনুভূত করিলে। তুমি তখন কিছু না দেখিয়া, কোন শব্দও না শুনিয়া জানিতে পারিলে যে গৃহমধ্যে মনুষ্য আসিয়াছে। সেই স্পর্শজ্ঞান, ত্বাচ প্রত্যক্ষ; কিন্তু গৃহমধ্যে মনুষ্যজ্ঞান অনুমিতি। ঐ অন্ধকার গৃহে তুমি যদি যূথিকা পুষ্পের গন্ধ পাও,

---

* গৃহ, পর্ব্বতাদি দূরে রহিয়াছে—আমাদিগের চক্ষে সংলগ্ন নহে, তবে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইল কি প্রকারে? দৃষ্ট পদার্থ বিক্ষিপ্ত রশ্মির দ্বারা। ঐ রশ্মি আমাদিগের নয়নাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে দৃষ্টি হয়।

তবে তুমি বুঝিবে, যে গৃহে যুথিকা পুষ্প আছে! এখানে গন্ধই প্রত্যক্ষের বিষয়; পুষ্প অনুমিতির বিষয়।

মনুষ্য অল্প বিষয়ই স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতে পারে। অধিকাংশই অনুমিতির উপর নির্ভর করে। অনুমিতি সংসার চালাইতেছে। আমাদিগের অনুমানশক্তি না থাকিলে, আমরা প্রায় কোন কার্য্যই করিতে পারিতাম না। বিজ্ঞান, দর্শনাদি, অনুমানের উপরেই নির্ম্মিত।

কিন্তু যেমন কোন মনুষ্যই সকল বিষয় স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না, তেমনি কোন ব্যক্তি সকলতত্ত্ব স্বয়ং অনুমান করিয়া সিদ্ধ করিতে পারে না। এমন অনেক বিষয় আছে, যে তাহা অনুমান করিয়া জানিতে গেলে যে পরিশ্রম আবশ্যক তাহা একজন মনুষ্যের জীবনকালের মধ্যে সাধ্য নহে। এমন অনেক বিষয় আছে যে তাহা অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ করার জন্য যে বিদ্যা, বা যে জ্ঞান বা যে বুদ্ধি, বা যে অধ্যবসায় প্রয়োজনীয় তাহা অধিকাংশ লোকের নাই। অতএব এমন অনেক নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় আছে, যে তাহা অনেকে স্বয়ং প্রত্যক্ষ বা অনুমানের দ্বারা জ্ঞাত হইতে পারেন না। এমন স্থলে আমরা কি করিয়া থাকি? যে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছে, বা যে স্বয়ং অনুমান করিয়াছে, তাহার কথা শুনিয়া বিশ্বাস করি। ইতালীর উত্তরে যে আল্প নামে পর্ব্বতশ্রেণী আছে তাহা তুমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ কর নাই। কিন্তু যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহাদের প্রণীত পুস্তক পাঠ করিয়া তুমি সে জ্ঞান লাভ করিলে। পরমাণু মাত্র যে অন্য পরমাণু মাত্রের দ্বারা আকৃষ্ট হয়, ইহা প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না, এবং তুমিও ইহা গণনার দ্বারা সিদ্ধ করিতে পার নাই, এজন্য তুমি নিউটনের কথায় বিশ্বাস করিয়া সে জ্ঞান লাভ করিলে।

ন্যায়, সাংখ্যাদি আর্য্যদর্শনশাস্ত্রে ইহা একটি তৃতীয় প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ইহার নাম শব্দ। তাহাদিগের বিবেচনায় বেদাদি এই প্রমাণের উপর নির্ভর করে। আপ্তবাক্য বা গুরূপদেশ, স্থূলতঃ যে বিশ্বাসযোগ্য তাহার উপদেশ,—আর্য্যমতে ইহা একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ। তাহারই নাম শব্দ।

কিন্তু চার্ব্বাকাদি কোন কোন আর্য্য দার্শনিক, ইহাকে প্রমাণ বলিয়াই স্বীকার করেন না। ইউরোপীয়েরাও ইহাকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না।

দেখা যাইতেছে, সকলের কথাতে বিশ্বাস অকর্ত্তব্য। যদি একজন বিখ্যাত মিথ্যাবাদী আসিয়া বলে যে, সে জলে অগ্নি জ্বলিতে দেখিয়া আসিয়াছে তবে এ কথা কেহই বিশ্বাস করিবে না। তাহার উপদেশে প্রমাজ্ঞানের উৎপত্তি নাই। ব্যক্তিবিশেষের উপদেশই প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য। তবে, সেই জ্ঞানলাভের পূর্ব্বে, আদৌ মীমাংসা আবশ্যক যে কে বিশ্বাসযোগ্য, কে নহে।

কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এ মীমাংসা করিব? কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া, মন্বাদির কথা আপ্তবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিব, এবং রামু শ্যামুর কথা অগ্রাহ্য করিব? দেখা যাইতেছে, যে অনুমানের দ্বারা ইহা সিদ্ধ করিতে হইবে। মনুর সঙ্গে পল্লার পাদরি সাহেবের মতভেদ। তুমি চিরকাল শুনিয়া আসিয়াছ, যে মনু অভ্রান্ত ঋষি, এবং পাদরি সাহেব স্বার্থপর সামান্য মনুষ্য; এজন্য তুমি অনুমান করিলে যে মনুর কথা গ্রাহ্য, পাদরির কথা অগ্রাহ্য। মনুর ন্যায় অভ্রান্ত ঋষি গোমাংসভোজন নিষেধ করিয়াছেন, বলিয়া তুমি অনুমান করিলে গোমাংস অভক্ষ্য। অতএব শব্দকে একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ না বলিয়া, অনুমানের অন্তর্গত বল না কেন?

শুধু তাহাই নহে। যে ব্যক্তির কতক গুলি উপদেশ গ্রাহ্য কর, তাহারই আর কতকগুলি অগ্রাহ্য করিয়া থাক। মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে নিউটনের যে মত, তাহা তুমি শিরোধার্য্য কর, কিন্তু আলোক সম্বন্ধে তাঁহার যে মত, তাহা পরিত্যাগ করিয়া তুমি ক্ষুদ্রতর বুদ্ধিজীবী ইয়ঙ ও ফ্রেনেলের মত গ্রহণ কর, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ সন্ধান করিলে, তলে অনুমিতিকেই পাওয়া যাইবে। অনুমানের দ্বারা তুমি জানিয়াছ যে মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে নিউটনের যে মত, তাহা সত্য, আলোক সম্বন্ধে তাঁহার যে মত তাহা অসত্য। যদি শব্দ একটা পৃথক্ প্রমাণ হইত, তবে তাঁহার সকল মতই তুমি গ্রাহ্য করিতে।*

প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ ভিন্ন নৈয়ায়িকেরা উপমিতিকেও একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ বিবেচনা করেন। বিচার করিয়া দেখিলে সিদ্ধ হইবে যে উপমিতি, অনুমিতির প্রকার ভেদ মাত্র, এবং সেই জন্য সাংখ্যাদি দর্শনে উপমিতি স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয় নাই। অতএব উপমিতির বিস্তারিত উল্লেখ প্রয়োজনীয় বোধ হইল না। বস্তুতঃ প্রত্যক্ষ, এবং অনুমানই জ্ঞানের মূল।

তাহার পর দেখিতে হইবে, যে অনুমানও প্রত্যক্ষমূলক। যে জাতীয় প্রত্যক্ষ কখন হয় নাই, সে বিষয়ে অনুমান হয় না। তুমি যদি কখন পূর্ব্বে মেঘ না দেখিতে, বা আর কেহ কখন না দেখিত, তবে তুমি রুদ্ধদ্বার গৃহমধ্যে মেঘগর্জ্জন শুনিয়া কখন মেঘানুমান করিতে পারিতে না। তুমি যদি কখন যূথিকা গন্ধ প্রত্যক্ষ না করিতে, তবে অন্ধকার গৃহে থাকিয়া যূথিকা ঘ্রাণ পাইয়া তুমি কখন অনুমান করিতে পারিতে না, যে গৃহমধ্যে যূথিকা আছে। এইরূপ অন্যান্য পদার্থ সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে। তবে অনেক সময়ে দেখা যাইবে, যে একটি অনুমানের মূল, বহুতর বহুজাতীয় পূর্ব্ব-

---

* এই বিচারে এমত বুঝিতে হইবে না যে ভ্রমপ্রমাদাদিশূন্য, অর্থাৎ ঈশ্বর বাক্য, তাহা প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

প্রত্যক্ষ। এক একটি বৈজ্ঞানিক নিয়ম সহস্র সহস্র জাতীয় প্রত্যক্ষের ফল। অতএব প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র মূল—সকল প্রমাণের মূল।

প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র মূল, কিন্তু এই তত্ত্বের মধ্যে ইউরোপীয় দার্শনিকদিগের মধ্যে একটী ঘোরতর বিবাদ আছে। কেহ কেহ বলেন, যে আমাদিগের এমন অনেক জ্ঞান আছে, যে তাহার মূল প্রত্যক্ষে পাওয়া যায় না। যথা, কাল. আকাশ, ইত্যাদি।

কথাটি বুঝা কঠিন। আকাশ সম্বন্ধে একটি সহজ কথা গ্রহণ করা যাউক,—যথা, দুইটি সমান্তরাল রেখা যতদূর টানা যাউক, কখন মিলিত হইবে না, ইহা আমরা নিশ্চিত জানি। কিন্তু এ জ্ঞান আমরা কোথা পাইলাম? প্রত্যক্ষবাদী বলিলেন "প্রত্যক্ষের দ্বারা। আমরা যত সমান্তরাল রেখা দেখিয়াছি, তাহা কখন মিলিত হয় নাই।" তাহাতে বিপক্ষেরা প্রত্যুত্তর করেন, যে "জগতে যত সমান্তরাল রেখা হইয়াছে, সকল তুমি দেখ নাই—তুমি যাহা দেখিয়াছ, তাহা মিলে নাই বটে, কিন্তু তুমি কি প্রকারে জানিলে যে কোন কালে কোথায় এমন দুইটি সমান্তরাল রেখা হয় নাই. বা হইবে না, যে তাহা টানিতে টানিতে একস্থানে মিলিবে না? যাহা মনুষ্যের প্রত্যক্ষ হইয়াছে, তাহা হইতে তুমি কি প্রকারে অপ্রত্যক্ষীভূতের নিশ্চয় করিলে? অথচ আমরা জানিতেছি যে তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সত্য;—কস্মিন্ কালে কোথাও এমত দুইটি সমান্তরাল রেখা হইতে পারে না যে তাহা মিলিবে। তবে প্রত্যক্ষ ব্যতীত তোমার আর কোন জ্ঞানমূল আছে—নহিলে তুমি এই প্রত্যক্ষের অতিরিক্ত জ্ঞানটুকু কোথায় পাইলে?"

এই কথা বলিয়া, বিখ্যাত জর্ম্মান দার্শনিক কান্ত, লক ও হ্যুমের প্রত্যক্ষবাদের প্রতিবাদ করেন। এই অতিরিক্ত জ্ঞানের মূল তিনি এই নির্দ্দেশ করেন, যে যেখানে বহির্ব্বিষয়ের জ্ঞান আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হইয়া থাকে, সেখানে বহির্ব্বিষয়ের প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন তত্ত্বের নিতান্ত আমাদের জ্ঞানের অতীত হইলেও, আমাদিগের ইন্দ্রিয় সকলের প্রকৃতির নিতান্ত আমাদিগের জ্ঞানের আয়ত্ত বটে। আমাদিগের ইন্দ্রিয় সকলের প্রকৃতি অনুসারে আমরা বহির্ব্বিষয় কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট অবস্থাপন্ন বলিয়া পরিজ্ঞাত হই। ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি সর্ব্বত্র একরূপ, এজন্য বহির্ব্বিষয়ের তত্তৎ অবস্থাও আমাদিগের নিকট সর্ব্বত্র একরূপ। এই জন্য আমাদিগের কাল, আকাশাদির সমবায়ের নিত্যত্ব জানিতে পারি। এই জ্ঞান আমাদিগেতেই আছে—এজন্য কান্ত ইহাকে স্বতোলব্ধ বা আভ্যন্তরিক জ্ঞান বলেন।

সীতারাম।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

যে দিন রমা মরিল, সে দিন সীতারাম আর চিত্তবিশ্রামে গেলেন না। এখনও ততদূর হয় নাই। যখন সীতারাম রাজা না হইয়াছিলেন, যখন আবার শ্রীকে না দেখিয়াছিলেন, তখন সীতারাম রমাকে বড় ভাল বাসিতেন—নন্দার অপেক্ষাও ভাল বাসিতেন, তা বলিয়াছি। সে ভাল-বাসা গিয়াছিল। কিসে গেল, সীতারাম তাহার চিন্তা কখন করেন নাই। আজ একটু ভাবিলেন। ভাবিয়া দেখিলেন,—রমার দোষ বড় বেশি নয়,—দোষ তাঁর নিজের। মনে মনে আপনার উপর বড় অসন্তুষ্ট হইলেন।

কাজেই মেজাজ খারাব হইয়া উঠিল। চিত্ত প্রফুল্ল করিবার জন্য শ্রীর কাছে যাইতে প্রবৃত্তি হইল না, কেননা শ্রীর সঙ্গে এই আত্মগ্লানির বড় নিকট সম্বন্ধ; রমার প্রতি তাঁহার নিষ্ঠুরাচরণের কারণই শ্রী। শ্রীর কাছে গেলে আগুণ আরও বাড়িবে। তাই শ্রীর কাছে না গিয়া রাজা নন্দার কাছে গেলেন। কিন্তু নন্দা সে দিন একটা ভুল করিল। নন্দা বড় চটিয়াছিল। ডাকিনীই হউক আর মানুষীই হোক্, কোন পাপিষ্ঠার জন্য যে রাজা নন্দাকে অবহেলা করিতেন, নন্দা তাহাতে আপনার মনকে রাগিতে দেয় নাই। কিন্তু রমাকে এত অবহেলা করায়, রমা যে মরিল, তাহাতে রাজার উপর নন্দার রাগ হইল, কেননা আপনার অপমানও তাহার সঙ্গে মিশিল। রাগটা এত বেশি হইল, যে অনেক চেষ্টা করিয়াও নন্দা, সকলটুকু লুকাইতে পারিল না।

রমার প্রসঙ্গ উঠিলে, নন্দা বলিল, "মহারাজ! তুমিই রমার মৃত্যুর কারণ।"

নন্দা এইটুকু মাত্র রাগ প্রকাশ করিল, আর কিছুই না। কিন্তু তাহাতেই আগুণ জ্বলিল, কেননা ইন্ধন প্রস্তুত। একেত আত্মগ্লানিতে সীতারামের মেজাজ খারাব হইয়াছিল—কোন মতে আপনার নিকটে আপনার সাফাই

করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহার উপর নন্দার এই উচিত তিরস্কার শেলের মত বিঁধিল। "মহারাজ! তুমিই রমার মৃত্যুর কারণ!" শুনিয়া রাজা গর্জ্জিয়া উঠিলেন। বলিলেন,

"ঠিক কথা! আমিই তোমাদের মৃত্যুর কারণ। আমি প্রাণপাত করিয়া আপনার রক্তে পৃথিবী ভাসাইয়া, তোমাদিগকে রাজরাণী করিয়াছি—কাজেই এখন বল্‌বে বৈ কি, আমিই তোমাদের মৃত্যুর কারণ। যখন রমা, গঙ্গা-রামকে ডাকিয়া আমার মৃত্যুর কারণ হইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কৈ তখন ত কেহ কিছু বল নাই?"

এই বলিয়া রাজা রাগ করিয়া বহির্ব্বাটীতে গেলেন। সেখানে চন্দ্রচূড় ঠাকুর, রাজাকে রমার জন্য শোকাকুল বিবেচনা করিয়া, তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য নানা প্রকার আলাপ করিতে লাগিলেন। রাজার মেজাজ তপ্ত তেলের মত ফুটিতেছিল, রাজা তাঁহার কথার বড় উত্তর করিলেন না। চন্দ্রচূড় ঠাকুরও একটা ভুল করিলেন। তিনি মনে করিলেন, রমার মৃত্যুর জন্য রাজার অনুতাপ হইয়াছে, এই সময়ে চেষ্টা করিলে, যদি ডাকিনী হইতে মন ফিরে, তবে সে চেষ্টা করা উচিত। তাই চন্দ্রচূড় ঠাকুর ভূমিকা করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন, "মহারাজ! আপনি যদি ছোট রাণীর প্রতি আর একটু মনোযোগী হইতেন, তা হইলে তিনি আরোগ্য লাভ করিতে পারিতেন।"

জ্বলন্ত আগুণ এ ফুৎকারে আরও জ্বলিয়া উঠিল। রাজা বলিলেন, "আপনারও কি বিশ্বাস যে আমিই ছোট রাণীর মৃত্যুর কারণ?"

চন্দ্রচূড়ের সেই বিশ্বাস বটে। তিনি মনে করিলেন, "এ কথা রাজাকে স্পষ্ট করিয়া বলাই উচিত। আপনার দোষ না দেখিলে কাহারও চরিত্র শোধন হয় না। আমি ইঁহার গুরু ও মন্ত্রী, আমি যদি বলিতে সাহস না করিব, তবে কে বলিবে।" অতএব চন্দ্রচূড় বলিলেন, "তাহা এক রকম বলা যাইতে পারে।"

রাজা। পারে বটে। বলুন। কেবল বিবেচনা করুন আমি যদি লোকের মৃত্যু কামনা করিতাম, তাহা হইলে এই রাজ্যে একজনও এতদিন টিকিত না।"

চন্দ্র। আমি বলিতেছি না, যে আপনি কাহারও মৃত্যুকামনা করেন।

কিন্তু আপনি মৃত্যু কামনা না করিলেও, যে আপনার রক্ষণীয়, তাহাকে আপনি যত্ন ও রক্ষা না করিলে, কাজেই তাহার মৃত্যু উপস্থিত হইবে। কেবল ছোট রাণী কেন, আপনার তত্ত্বাবধানের অভাবে বুঝি সমস্ত রাজ্য যায়। কথাটা আপনাকে বলিবার জন্য কয় দিন হইতে আমি চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু আপনার অবসর অভাবে, তাহা বলিতে পারি নাই।"

রাজা মনে মনে বলিলেন, "সকল বেটাই বলে—তত্ত্বাবধানের অভাবে—বেটারা করে কি?" প্রকাশ্যে বলিলেন,

"তত্ত্বাবধানের অভাব—আপনারা করেন কি?"

চন্দ্র। যা করিতে পারি—সব করি। তবে, আমরা রাজা নহি। যেটা রাজার হুকুম নহিলে সিদ্ধ হয় না, সেইটুকু পারি না। আমার ভিক্ষা, কাল প্রাতে একবার দরবারে বসেন, আমি আপনাকে সবিশেষ অবগত করি, কাগজপত্র দেখাই; আপনি রাজাজ্ঞা প্রচার করেন।"

রাজা মনে মনে বলিলেন, "তোমার গুরুগিরির কিছু বাড়াবাড়ি হইয়াছে—আমারও ইচ্ছা তোমায় কিছু শিখাই।" প্রকাশ্যে বলিলেন,, "বিবেচনা করা যাইবে।"

চন্দ্রচূড়ের তিরস্কারে রাজার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতেছিল, কেবল গুরু বলিয়া সীতারাম তাঁহাকে বেশী কিছু বলিতে পারেন নাই। কিন্তু রাগে সে রাত্রি নিদ্রা গেলেন না। চন্দ্রচূড়কে কিসে শিক্ষা দিবেন সেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রভাতে উঠিয়াই, প্রাতঃকৃত্য সমস্ত সমাপন করিয়া দরবারে বসিলেন। চন্দ্রচূড় খাতাপত্রের রাশি আনিয়া উপস্থিত করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

যে কথাটা চন্দ্রচূড় রাজাকে জানাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহা এই। যত বড় রাজ্য হোক না কেন, আর যত বড় রাজা হোক না কেন, টাকা নহিলে কোন রাজ্যই চলে না। আমরা একালে দেখিতে পাই যেমন তোমার আমার সংসার টাকা নহিলে চলে না—তেমনি ইংরেজের এত বড় রাজ্য টাকা নহিলেও চলে না। টাকার অভাবে যেমন নফরা হাড়ি না খাইয়া

মরিল, টাকার অভাবে তেমনি রোমক সাম্রাজ্য লোপ পাইল—প্রাচীন সভ্যতা অন্ধকারে মিশাইল। সীতারামের সহসা টাকার অভাব হইল।

সীতরামের টাকার অভাব হওয়া অনুচিত, কেননা সীতারামের আয় অনেক গুণ বাড়িয়াছিল। ভূষণার ফৌজদারীর এলাকা তাঁহার করতলস্থ হইয়াছিল—বারো ভুঁইয়া তাঁহার বশে আসিযাছিল। তচ্ছাসিত প্রদেশ সম্বন্ধে দিল্লীর বাদশাহের প্রাপ্য যে কর, সীতারামের উপর তাহার আদায়ের ভার হইয়াছিল। সীতারাম এ পর্য্যন্ত তাহার এক কড়াও মুর্শিদাবাদে পাঠান নাই—যাহা আদায় করিয়াছিলেন, তাহা নিজে ভোগ করিতেছিলেন। তবে টাকার অকুলান কেন?

লোকের আয় বাড়িলেই অকুলান হইয়া উঠে। কেননা খরচ বাড়ে। ভূষণা বশে আনিতে কিছু খরচ হইয়াছিল—বারো ভুঁইয়াকে বশে আনিতে কিছু খরচ হইয়াছিল। এখন অনেক ফৌজ রাখিতে হইত—কেননা কখন কে বিদ্রোহী হয়, কখন কে আক্রমণ করে—সে জন্যও অনেক ব্যয় হইতেছিল। অভিষেকেও কিছু ব্যয় হইয়াছিল। অতএব যেমন আয় তেমনি ব্যয় বটে।

কিন্তু যেমন আয় তেমনি ব্যয় হইলে অকুলান হয় না। অকুলানের আসল কারণ চুরি। রাজা এখন আর বড় কিছু দেখেন না—চিত্তবিশ্রামেই দিনপাত করেন। কাজেই রাজপুরুষেরা রাজভাণ্ডারের টাকা লইয়া যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই করে,—কে নিষেধ করে? চন্দ্রচূড় ঠাকুর নিষেধ করেন, কিন্তু তাঁহার নিষেধ কেহ মানে না। চন্দ্রচূড় জনকত বড় বড় রাজ কর্ম্মচারীর চুরি ধরিলেন,—মনে করিলেন, এবার যে দিন রাজা দরবারে বসিবেন, সেই দিন, খাতাপত্র সকল তাঁহার সমুখে ধরিয়া দিবেন। কিন্তু রাজা কিছুতেই ধরা দেন না, "কাজ যা থাকে, মহাশয় করুন্" বলিয়া কোন মতে পাশ কাটাইয়া চিত্তবিশ্রামে পলায়ন করেন। চন্দ্রচূড়, হতাশ হইয়া শেষ নিজেই সেই কয়জনের বরতরফের হুকুম জারি করিলেন: তাহারা তাহাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিল,—বলিল, "ঠাকুর! যখন স্মৃতির ব্যবস্থা প্রয়োজন হইবে, তখন আপনার কথা শুনিব। রাজার সহি মোহরের পরওয়ানা দেখান, নহিলে ঘরে গিয়া সন্ধ্যা আহ্নিক করুন।"

রাজার সহি মোহর পাওয়া কিছু শক্ত কথা নহে। এখন রাজার কাছে যা হয় একখানা কাগজ ধরিয়া দিলেই তিনি সহি দেন—পড়িবার অবকাশ হয় না—চিত্তবিশ্রামে যাইতে হইবে। অতএব চন্দ্রচূড়, এই অপরাধী-দিগের বরতরফি পরওয়ানাতে রাজার সহি করাইয়া লইলেন। রাজা না পড়িয়াই সহি দিলেন।

কিন্তু তাহাতে কার্য্য সিদ্ধ হইল না। প্রধান অপরাধী খাতাঞ্জি. দরবারে উপস্থিত ছিল, সে দেখিল যে রাজা না পড়িয়াই সহি দিলেন। রাজা চলিয়া গেলে. সে বলিল, "ও হুকুম মানি না। ও তোমার হুকুম—রাজার নয়। রাজা কাগজ পড়িয়াও দেখেন নাই। যখন রাজা স্বয়ং বিচার করিয়া আমা-দিগকে ববতরফ করিবেন, তখন আমরা যাইব. এখন নহে।" কেহই গেল না। খুব চুরি করিতে লাগিল। ধনাগার তাহাদের হাতে, সুতরাং চন্দ্রচূড় কিছু করিতে পারিলেন না।

তাই আজ চন্দ্রচূড় রাজাকে পাকড়াও করিয়াছিলেন। রাজা দরবারে বসিলে, অপরাধীদিগের সমক্ষেই চন্দ্রচূড় কাগজপত্র সকল রাজাকে বুঝাইতে লাগিলেন। রাজা একে সমস্ত জগতের উপর রাগিয়াছিলেন. তাহাতে আবার চুরির বাহুল্য দেখিয়া ক্রোধে অত্যন্ত বিকৃতচিত্ত হইয়া উঠিলেন। রাজাজ্ঞা প্রচার করিলেন, যে অপরাধী সকলেই শূলে যাইবে।

হুকুম শুনিয়া আম দরবার শিহরিয়া উঠিল। চন্দ্রচূড় যেন বজ্রাহত হইলেন।

বলিলেন, "সে কি মহারাজ! লঘু পাপে এত গুরু দণ্ড?"

রাজা ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন, "লঘু পাপ কি? চোরের শূলই ব্যবস্থা।"

চন্দ্র। ইহার মধ্যে কয়জন ব্রাহ্মণ আছে। ব্রহ্মহত্যা করিবেন-কি প্রকারে?

রাজা। ব্রাহ্মণদিগের নাক কান কাটিয়া, কপালে তপ্ত লোহার দ্বারা "চোর" লিখিয়া ছাড়িয়া দিবে। আর সকলে শূলে যাইবে।"

এই হুকুম জারি করিয়া, রাজা চিত্তবিশ্রামে চলিয়া গেলেন। হুকুম মত অপরাধীদিগের দণ্ড হইল। নগরে হাহাকার পড়িয়া গেল। অনেক রাজ কর্ম্মচারী কর্ম্ম ছাড়িয়া পলাইল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

চুরি বন্ধ হইল, কিন্তু টাকার তবু কুলান হয় না। রাজ্যের অবস্থা রাজাকে বলা নিতান্ত আবশ্যক, কিন্তু রাজাকে পাওয়া ভার, পাইলেও কথা হয় না। চন্দ্রচূড় সন্ধানে সন্ধানে ফিরিয়া আবার এক দিন রাজাকে ধরিলেন—বলিলেন, "মহারাজ! একবার এ কথায় কর্ণপাত না করিলে রাজ্য থাকে না।"

রাজা। থাকে থাকে, যায়, যায়। ভাল শুনিতেছি, বলুন কি হয়েছে?

চন্দ্র। শিপাহী সব দলে দলে ছাড়িয়া চলিতেছে।

রাজা। কেন?

চন্দ্র। বেতন পায় না।

রাজা। কেন পায় না?

চন্দ্র। টাকা নাই।

রাজা। এখনও কি চুরি চলিতেছে না কি?

চন্দ্র। না, চুরি বন্ধ হইয়াছে। কিন্তু তাতে কি হইবে? যে টাকা চোরের পেটে গিয়েছে, তাত আর ফিরে নাই।

রাজা। কেন, আদায় তহশীল হইতেছে না?

চন্দ্র। এক পয়সাও না।

রাজ। কারণ কি?

চন্দ্র। যাহাদের প্রতি আদায়ের ভার, তাহারা কেহ বলে "আদায় করিয়া শেষ তহবিল গরমিল হইলে শূলে যাব না কি?"

রাজা। তাহাদের বরতরফ করুন।

চন্দ্র। নূতন লোক পাইব কোথায়? আর কেবল নূতন লোকের দ্বারা কি আদায় তহশীলের কাজ হয়?

রাজা। তবে তাহাদিগকে কয়েদ করুন।

চন্দ্র। সর্ব্বনাশ! তবে আদায় তহশীল করিবে কে?

রাজা। পনের দিনের মধ্যে যে বাকী বকেয়া সব আদায় না করিবে, তাহাকে কয়েদ করিব।

চন্দ্র। সকল তহশীলদারেরও দোষ নাই। দেনেওয়ালা অনেকে দিতেছে না।

রাজা। কেন দেয় না ?

চন্দ্র। বলে "মুসলমানের রাজ্য হইলে দিব। এখন দিয়া কি দোকর দিব ?"

রাজা। যে টাকা না দিবে, যাহার বাকি পড়িবে, তাহাকেও কয়েদ করিতে হইবে।

চন্দ্রচূড়, হাঁ করিয়া রহিলেন। শেষ বলিলেন, "মহারাজ কারাগারে এত স্থান কোথা ?"

রাজা। বড় বড় চালা তুলিয়া দিবেন।

এই বলিয়া বাকিদার ও তহশীলদার উভয়ের কয়েদের হুকুমে স্বাক্ষর করিয়া, রাজা চিত্তবিশ্রামে প্রস্থান করিলেন। চন্দ্রচূড় মনে মনে শপথ করিলেন, আর কখন রাজাকে রাজকার্য্যের কোন কথা জানাইবেন না।

এই হুকুমে দেশে মহা হাহাকার পড়িয়া গেল। কারাগার সকল ভরিয়া গেল—চন্দ্রচূড় চালা তুলিয়া কুলাইতে পারিলেন না। বাকিদার, তহশীলদার, উভয়েই দেশ ছাড়িয়া পলাইতে লাগিল। যে বাকিদার নয়, সেও সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে পলাইতে লাগিল।

তাই বলিতেছিলাম, যে আগে আগুণ ত জ্বলিয়াইছিল, এখন ঘর পুড়িল। যদি শ্রী না আসিত, তবে সীতারামের এতটা অবনতি হইত কি না জানিনা, কেননা সীতারাম ত মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন, যে রাজ্য-শাসনে মন দিয়া শ্রীকে ভুলিবেন—সে কথা যথাস্থানে বলিয়াছি। অসময়ে আসিয়া শ্রী দেখা দিল, সে অভিপ্রায় বালির বাঁধের মত আসক্তির বেগে ভাসিয়া গেল। রাজ্যে মন দিলেই যে সব আপদ ঘুচিত, তাহা নাই বলিলাম, কিন্তু শ্রী যদি আসিয়াছিল, তবে সে যদি নন্দার মত রাজপুরী মধ্যে মহিষী হইয়া থাকিয়া, নন্দার মত রাজার রাজধর্ম্মের সহায়তা করিত, তাহা হইলেও সীতারামের এতটা অবনতি হইত না বোধ হয়, কেননা কেবল ঐশ্বর্য্যমদে যে অবনতিটুকু হইতেছিল, শ্রী ও নন্দার সাহায্যে সেটুকুরও কিছু খর্ব্বতা হইত। তা শ্রী, যদি রাজপুরীতে মহিষী না থাকিয়া, চিত্তবিশ্রামে আসিয়া উপপত্নীর মত রহিল, তবে সন্ন্যাসিনীর মত না থাকিয়া, সেই মত থাকিলেই এতটা প্রমাদ ঘটিত না। আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ

হইলে, তাহার মোহিনী শক্তির অনেক লাঘব হইত। কিছু দিনের পর রাজার চৈতন্য হইতে পারিত। তা, যদি শ্রী সন্ন্যাসিনী হইয়াই রহিল, তবে সোজা রকম সন্ন্যাসিনী হইলেও এ বিপদ হইত না। কিন্তু এই ইন্দ্রাণীর মত সন্ন্যাসিনী বাঘছালে বসিয়া বাক্যে মধুবৃষ্টি করিতে থাকিবে, আর সীতারাম কুকুরের মত তফাতে বসিয়া মুখপানে চাহিয়া থাকিবে—অথচ সে সীতারামের স্ত্রী! এতেইত সর্ব্বনাশ ঘটিল। আগে আগুন লাগিয়াছিল মাত্র,—এখন ঘর পুড়িল। সীতারাম আর সহ্য করিতে না পারিয়া, মনে মনে সঙ্কল্প করিল, শ্রীর উপর বলপ্রয়োগ করিবেন।

তবে যাকে ভালবাসে, তাহার উপর বলপ্রয়োগ বড় পামরেও পারে না। শ্রীর উপর রাজার যে ভালবাসা, তাহা এখন কাজেই ইন্দ্রিয়বশ্যতায় আসিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু ভালবাসা এখনও যায় নাই। তাই বল প্রয়োগে ইচ্ছুক হইয়াও সীতারাম তাহা পারিতেছিল না। বলপ্রয়োগ করিব কি না এ কি কথার মীংমাসা করিতে সীতারামের প্রাণ বাহির হইতেছিল। যত দিন না সীতারাম একটা এদিক ওদিক স্থির করিতে পারিলেন, তত দিন সীতারাম এক প্রকার জ্ঞানশূন্যাবস্থায় ছিলেন। সেই ভয়ানক সময়ের বুদ্ধি বিপর্য্যয়ে রাজপুরুষেরা শূলে গেল, আদায় তহশীলের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্ম-চারিরা কারাগারে গেল, বাকিদারেরা আবদ্ধ হইল, প্রজা সব পালাইল, রাজ্য ছারেখারে যাইতে লাগিল।

শেষ সীতারাম স্থির করিলেন, শ্রীর প্রতি বলপ্রয়োগই করিবেন। কথাটা মনোমধ্যে স্থির হইয়া কার্য্যে পরিণত হইতে না হইতেই অকস্মাৎ এক গোলযোগ উপস্থিত হইল। চন্দ্রচূড় ঠাকুর রাজাকে আর এক দিন পাকড়া করিয়া বলিলেন, "মহারাজ! তীর্থপর্য্যটনে যাইব ইচ্ছা করিয়াছি। আপনি অনুমতি করিলেই যাই।"

কথাটা রাজার মাথায় যেন বজ্রাঘাতের মত পড়িল। চন্দ্রচূড় গেলে নিশ্চয়ই শ্রীকে পরিত্যাগ করিতে হইবে নয়, রাজ্য পরিত্যাগ করিতে হইবে। অতএব রাজা চন্দ্রচূড় ঠাকুরকে তীর্থযাত্রা হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এখন, চন্দ্রচূড় ঠাকুরের স্থিরসিদ্ধান্ত এই যে, এ পাপ রাজ্যে আর বাস করিবেন

না, এ পাপিষ্ঠ রাজার কর্ম্ম আর করিবেন না। অতএব তিনি সহজে সম্মত হইলেন না। অনেক কথাবার্ত্তা হইল। চন্দ্রচূড় অনেক তিরস্কার করিলেন। রাজাও অনেক উত্তর প্রত্যুত্তর করিলেন। শেষে চন্দ্রচূড় থাকিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু কথায় কথায় অনেক রাত্রি হইল। কাজেই রাজা সে দিন চিত্তবিশ্রামে গেলেন না। এদিকে চিত্তবিশ্রামে সেই রাত্রে একটা কাণ্ড উপস্থিত হইল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

সেই দিন দৈবগতিকে চিত্তবিশ্রামের দ্বারদেশে একজন ভৈরবী আসিয়া দর্শন দিল। এখন চিত্তবিশ্রাম ক্ষুদ্র প্রমোদগৃহ হইলেও রাজগৃহ; জনকত দ্বারবানও দ্বারদেশে আছে। ভৈরবী দ্বারবানদিগের নিকট পথ ভিক্ষা করিল।

দ্বারবানেরা বলিল, "এ রাজবাড়ী—এখানে একটী রাণী থাকেন। কাহারও যাইবার হুকুম নাই।" বলা বাহুল্য যে রাজাদিগের উপরাণীরাও ভৃত্যদিগের নিকট রাণী নাম পাইয়া থাকে।

ভৈরবী বলিল, "আমার তাহা জানা আছে। রাজাও আমায় জানেন। আমার যাইবার নিষেধ নাই। তোমরা গিয়া রাজাকে জানাও।"

দ্বারবানেরা বলিল, "রাজা এখন এখানে নাই—রাজধানী গিয়াছেন।"

ভৈ। তবে যে রাণী এখানে থাকেন, তাঁকেই জানাও। তাঁর হুকুমে হইবে না?"

দ্বারবানেরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করিল। চিত্তবিশ্রামের অন্তঃপুরে কখন কেহ প্রবেশ করিতে পায় নাই—রাজার বিশেষ নিষেধ। রাণীরও নিষেধ। রাজার অবর্ত্তমানে দুই একজন স্ত্রীলোক (নন্দার প্রেরিতা) অন্তঃপুরে যাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু রাণীকে সম্বাদ দেওয়াতে তিনি কাহাকেও আসিতে দিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তবে আবার রাণীজিকে খবর দেওয়া যাইবে কি? তবে এ ভৈরবীটার মূর্ত্তি দেখিয়া ইহাকে মনুষ্য বলিয়া বোধ হয় না—তাড়াইয়া দিলেও যদি কোন গোলযোগ ঘটে!

দ্বারবানেরা সাত পাঁচ ভাবিয়া পরিচারিকার দ্বারা অন্তঃপুরে সম্বাদ পাঠাইল। ভৈরবী আসিয়াছে শুনিয়া শ্রী তখনই আসিবার অনুমতি দিল। জয়ন্তী অন্তঃপুরে গেল।

দেখিয়া শ্রী বলিল, "আসিয়াছ ভাল হইয়াছে। আমার এমন সময় উপস্থিত হইয়াছে, যে তোমার পরামর্শ নহিলে চলিতেছে না।"

জয়ন্তী বলিল, "আমি ত এই সময়ে তোমার সম্বাদ লইতে আসিব বলিয়া গিয়াছিলাম। এখন সম্বাদ কি, বল। নগরে শুনিলাম, রাজ্যের নাকি বড় গোলযোগ? আর তুমিই নাকি তার কারণ? টোলে টোলে শুনিয়া আসিলাম, ছাত্রেরা সব রঘুর উনবিংশের শ্লোক আওড়াইতেছে। ব্যপারটা কি?"

শ্রী বলিল, "তাই তোমায় খুঁজিতে ছিলাম।" শ্রী তখন আদ্যোপান্ত সকল বলিল। জয়ন্তী বলিল, "তবে তোমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম করিতেছ না কেন?"

শ্রী। সেটা ত বুঝিতে পারিতেছি না।

জয়ন্তী। রাজধানীতে যাও। রাজপুরী মধ্যে মহিষী হইয়া বাস কর। সেখানে রাজার প্রধান মন্ত্রী হইয়া তাঁহাকে স্বধর্ম্মে রাখ। এ তোমারই কাজ।

শ্রী। তাত জানি না। মহিষীর ধর্ম্ম ত শিখি নাই। সন্ন্যাসিনীর ধর্ম্ম শিখাইয়াছ, তাই শিখিয়াছি। যাহা জানি না, যাহা পারি না, সেই ধর্ম্ম গ্রহন করিয়া সব গোল করিব। সন্ন্যাসিনী মহিষী হইলে কি মঙ্গল হইবে?"

জয়ন্তী ভাবিল। বলিল, "তা আমি বলিতে পারি না। তোমা হইতে সে ধর্ম্ম পালন হইবে না; বোধ হইতেছে—তাহা হইবার সম্ভাবনা থাকিলে কি এতদূর হয়?"

শ্রী। বুঝি সে একদিন ছিল। যে দিন আঁচল দোলাইয়া মুসলমান সেনা ধ্বংস করিয়াছিলাম— সেদিন থাকিলে বুঝি হইত। কিন্তু অদৃষ্ট সে পথে গেল না, সে শিক্ষা হইল না। অদৃষ্ট গেল ঠিক উল্‌টা পথে—বনবাসে— সন্ন্যাসে গেল। কে জানে আবার অদৃষ্ট ফিরিবে?"

জ। এখন উপায়?

শ্রী। পলায়ন ভিন্ন ত আর উপায় দেখি না। কেবল রাজার জন্য বা রাজ্যের জন্য বলি না। আমার আপনার জন্যও বলিতেছি। রাজাকে রাত্রি দিন দেখিতে দেখিতে অনেক সময়ে মনে হয়, আমি গৃহিণী, উঁহার ধর্ম্মপত্নী।

জ। তাত বটেই।

শ্রী। তাতে পুরাণ কথা মনে আসে। আবার কি ভালবাসার ফাঁদে পড়িব? তাই, আগেই বলিয়াছিলাম রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করাই ভাল। শত্রু, রাজা লইয়া বার জন।"

জয়ন্তী। আর এগার জন আপনার শরীরে? ভারি ত সন্ন্যাস সাধিয়াছ, দেখিতেছি! যাহা জগদীশ্বরে সমর্পণ করিয়াছিলে, তাহা আবার কাড়িয়া লইয়াছ, দেখিতেছি। আবার আপনার ভাবনাও ভাবিতে শিখিয়াছ দেখিতেছি! একে কি বলে সন্ন্যাস?

শ্রী। তাই বলিতেছিলাম, পলায়নই বিধি কি না?

জ। বিধি বটে।

শ্রী। রাজা বলেন, আমি পলাইলে তিনি আত্মঘাতী হইবেন।

জ। পুরুষ মানুষের মেয়ে ভুলান কথা! পুষ্পশরাহতের প্রলাপ!

শ্রী। সে ভয় নাই?

জ। থাকিলে তোমার কি? রাজা বাঁচিল মরিল, তাতে তোমার কি? তোমার স্বামী বলিয়া কি তোমার এত ব্যথা? এই কি সন্ন্যাস?

শ্রী। তা হোক না হোক—রাজা মরিলেই কোন্ সর্ব্বভূতের হিত সাধন হইল?

জ। রাজা মরিবে না ভয় নাই। ছেলে খেলানা হারাইলে কাঁদে, মরেনা। তুমি ঈশ্বরে কর্ম্মসংন্যাস করিয়া যাহাতে সংযতচিত্ত হইতে পার তাই কর।

শ্রী। তা হইলে এখান হইতে প্রস্থান করিতে হয়।

জ। এখনই।

শ্রী। কি প্রকারে যাই? দ্বারবানেরা ছাড়িবে কেন?

জ। তোমার সে গৈরিক, রুদ্রাক্ষ, ত্রিশূল, সবই আছে দেখিতেছি। ভৈরবী বেশে পলাও, দ্বারবানেরা কিছু বলিবে না।"

শ্রী। মনে করিবে, তুমি যাইতেছ? তার পর তুমি যাইবে কি প্রকারে?

জয়ন্তী হাসিয়া বলিল, "একি আমার সৌভাগ্য! এতকালের পর আমার জন্য ভাবিবার একটা লোক হইয়াছে! আমি নাই যাইতে পারিলাম, তাতে ক্ষতি কি দিদি?"

শ্রী। রাজার হাতে পড়িবে—কি জানি রাজা যদি তোমার উপর ক্রুদ্ধ হন!

জ। হইলে আমার কি করিবেন? এমন সম্বাদ পাইয়াছ কি, যে রাজাদিগের এমন কোন ক্ষমতা আছে, যে আমার অনিষ্ট করিতে পারে?

জয়ন্তীর উপর শ্রীর অনন্ত বিশ্বাস। সুতরাং শ্রী আর বাদানুবাদ না করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার সঙ্গে কোথায় সাক্ষাৎ হইবে?"

"তুমি বরাবর—গ্রামে যাও। সেখানে রাজার পুরোহিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও। তোমার ত্রিশূল আমাকে দাও; আমার ত্রিশূল তুমি নাও। সে গ্রামের রাজার পুরোহিত আমার মন্ত্রশিষ্য। তিনি আমার চিহ্নিত ত্রিশূল দেখিলে, তুমি যা বলিবে, তাই করিবেন। তাঁকে বলিও, তোমাকে অতি গোপনীয় স্থানে লুকাইয়া রাখেন। কেন না তোমার জন্য বিস্তর খোঁজ তল্লাস হইবে। তিনি তোমাকে রাজপুরী মধ্যে লুকাইয়া রাখিবেন। সেই খানে তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইবে।

তখন শ্রী জয়ন্তীর পদধূলি গ্রহন করিয়া আবার বনবাসে নিষ্ক্রান্ত হইল। দ্বারবানেরা কিছু বলিল না।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

রামচাঁদ। ভয়ানক ব্যাপার! লোক অস্থির হ'য়ে উঠল।

শ্যামচাঁদ। তাই ত দাদা! আর তিলার্দ্ধ এ রাজ্যে থাকা নয়।

রামচাঁদ। তা তুমি ত আজ কত দিন ধ'রে যাই যাই ক'চ্ছো—যাও নি যে?

শ্যামচাঁদ। যাওয়ারই মধ্যে, মেয়ে ছেলে সব নলডাঙ্গা পাঠি'য়ে দিয়েছি। তবে আমার কিছু লহনা পড়ে রয়েছে, সে গুলা যতদূর হয় আদায় ওসুল ক'রে নিয়ে যাই। আর আদায় ওসুল বা করবো কার আছে—দেনেওয়ালারাও সব ফেরাব হয়েছে।

রামচাঁদ। আচ্ছা এ আবার নূতন ব্যাপার কি? কেন এত হাঙ্গামা তা কিছু জান? শুনেছি নাকি হাবুজখানায় আর কয়েদী ধরেনা, নূতন চালাগুলাতেও ধরেনা, এখন নাকি গোহালের গোরু বাহির করিয়া কয়েদী রাখছে?

শ্যামচাঁদ। ব্যাপারটা কি জানন? সেই ডাকিনীটা পালিয়েছে

রাম। তা শুনেছি। আচ্ছা, সে ডাকিনীটা ত এত যাগ যজ্ঞে কিছুতেই গেল না—এখন আপনি পালাল যে?

শ্যাম। আপনি কি আর গিয়েছে? (চুপি চুপি) বল্‌তে গায়ে কাঁটা দেয়। সে নাকি দেবতার তাড়নায় গিয়েছে।

রাম। সে কি!

শ্যাম। এই নগরে এক দেবী অধিষ্টান করেন শুন নি? তিনি কখন কখন দেখা দেন—অনেকেই তাঁকে দেখিয়াছে। কেন, যে দিন ছোট রাণীর পরীক্ষা হয়, সে দিন তুমি ছিলে না?

রাম। হাঁ! হাঁ! সেই তিনিই! আচ্ছা, বল দেখি তিনি কে?

শ্যাম। তা তিনি কি কারও কাছে আপনার পরিচয় দিতে গিয়েছেন! তবে পাঁচজন লোকে পাঁচ রকম বল্‌চে।

রাম। কি বলে?

শ্যাম। কেউ বলে তিনি এই পুরীর রাজলক্ষ্মী। কেউ বলে তিনি স্বয়ং লক্ষ্মী, লক্ষ্মীনারায়ণ জিউর মন্দির হইতে কখন কখন রূপ ধারণ ক'রে বার হন, লোকে এমন দেখেছে। কেউ বলে তিনি স্বয়ং দশভুজা; দশভুজার মন্দিরে গিয়া অন্তর্দ্ধান হ'তে তাঁকে নাকি দেখেছে।

রাম। তাই হবে। নইলে তিনি ভৈরবী বেশ ধারণ কর্‌বেন কেন? সে সভায় ত তিনি ভৈরবীবেশে অধিষ্ঠান করেছিলেন?

শ্যাম। তা যিনিই হন, আমাদের অনেক ভাগ্য যে আমরা তাঁকে সে দিন দর্শন করেছিলাম। কিন্তু রাজার এমনই মতিচ্ছন্ন ধরেছে যে—

রাম। হাঁ—তারপর ডাকিনীটা গেল কি ক'রে শুনি।

শ্যাম। সেই দেবী, ডাকিণী হ'তে রাজ্যের অমঙ্গল হ'চ্ছে দেখে একদিন ভৈরবীবেশে ত্রিশূল ধারণ ক'রে তাকে বধ করতে গেলেন।

রাম। ইঃ! তারপর?

শ্যাম। তারপর আর কি? মার রণরঙ্গিনী মূর্ত্তি দেখে, সেটা তালগাছ প্রমান বিকটাকার মুর্ত্তি ধারণ ক'রে, ঘোর গর্জ্জন কর্‌তে কর্‌তে কোথায় যে আকাশপথে উড়ে গেল কেউ আর দেখ্‌তে পেলে না।

রাম। কে বল্‌লে?

শ্যাম। বল্‌লে আর কে? যারা দেখেছে, তারাই বলেছে। রাজা এমনই সেই ডাকিনীর মায়ায় বদ্ধ, যে সেটা গেছে বলে চিত্তবিশ্রামের যত দ্বারবান দাস দাসী সবাইকে ধরে এনে কয়েদ করেছেন। তারাই এই সব কথা প্রকাশ করেছে। তারা বলে, "মহারাজ! আমাদের অপরাধ কি? দেবতার কাছে আমরা কি ক্‌রব?"'

রাম। গল্প কথা নয় ত?

শ্যাম। একি আর গল্প কথা!

রাম। কি জানি। হয় ত ডাকিনীটা মড়া ফড়া খাবার জন্য রাত্রে কোথা বেরিয়ে গিয়েছিল, আর আসে নি। এখন রাজার পীড়াপীড়িতে তারা আপনার বাঁচন জন্য একটা রচে মচে বল্‌চে।

শ্যাম। একি আর রচা কথা? তারা দেখেছে যে, সেটার এমন এমন মুলোর মত দাঁত, শোনের মত চুল, বারকোশের মত চোক, একটা আস্ত কুমীরের মত জিব, দুটো জালার মত দুটো স্তন, মেঘগর্জ্জনের মত নিঃশ্বাস, আর ডাকেতে একেবারে মেদিনী বিদীর্ণ!

রাম। সর্ব্বনাশ! এত বড় অদ্ভুত ব্যাপার! রাজার মতিচ্ছন্ন ধরেছে বল্‌ছিলে কি?

শ্যাম। তাই বল্‌চি শোন না। এই ত গেল নিরপরাধী বেচারাদের নাহক কয়েদ। তারপর, সেই ডাকিনীটাকে খুঁজে ধরে আন্‌বার জন্য রাজা ত দিক বিদিকে কত লোকই পাঠাচ্চেন। এখন সে আপনার স্বস্থানে চলে গেছে, মনুষ্যের সাধ্য কি যে তাকে সন্ধান ক'রে ধ'রে আনে। কেউ তা পারচে না—সবাই এসে যোড় হাত ক'রে এত্তেলা করছে যে সন্ধান করতে পারলে না।

রাম। তাতে রাজা কি বলেন?

শ্যাম। এখন যাই কেউ ফিরে এসে বল্‌চে যে পারলে না, অমনই রাজা

তাকে কয়েদে পাটাচ্চেন। এই করে ত হাবুজখানা পরিপূর্ণ। এ দিকে রাজপুরুষদের এমনই ভয় লেগেছে যে বাড়ী, ঘর, দ্বার, স্ত্রী, পুত্র ছেড়ে পালাচ্চে। দেখাদেখি নগরের প্রজা দোকানদারও সব পালাচ্চে।

রাম। তা, দেবী কি করেন? তিনি কটাক্ষ করিলেই ত এই সকল নিরা-পরাধী লোক রক্ষা পায়।

শ্যাম। তিনি সাক্ষাৎ ভগবতী! তিনি এই সকল ব্যাপার দেখিয়া ভৈরবী বেশে রাজাকে দর্শন দিয়া বলিলেন, "রাজা! নিরপরাধীর পীড়ন করিও না। নিরপরাধীর পীড়ন করিলে রাজার রাজ্য থাকে না। এদের কোন দোষ নাই। আমিই সেটাকে তাড়াইয়াছি—কেননা সেটা হ'তে তোমার রাজ্যের অমঙ্গল হইতেছিল। দোষ হইয়া থাকে, আমারই হইয়াছে। দণ্ড করিতে হয়, উহাদের ছাড়িয়া দিয়া আমারই দণ্ড কর।"

রাম। তারপর!

শ্যাম। তাই বল্‌ছিলাম, রাজার বড় মতিচ্ছন্ন ধরিয়াছে। সেটা পালান অবধি রাজার মেজাজ এমন গরম, যে কাক পক্ষী কাছে যাইতে পারিতেছে না। তর্কালঙ্কার ঠাকুর কাছে গিয়াছিলেন, বড় রাণী কাছে গিয়াছিলেন, গাল খেয়ে পালিয়ে এলেন?

রাম। সে কি! গুরুকে গালি গালাজ? নির্ব্বংশ হবেন যে।

শ্যাম। তার কি আর কথা আছে? তার পর শোন না। গরম মেজাজের প্রথম মোহাড়াতেই সেই দেবতা গিয়া দর্শন দিয়া ঐ কথা বল্‌লেন। বলতেই রাজা চক্ষু আরক্ত করিয়া তাঁকে স্বহস্তে প্রহার করিতেই উদ্যত। তা না ক'রে, যা করেছে সে ত আরও ভয়ানক!

রাম। কি করেছে!

শ্যাম। ঠাকুরাণীকে কয়েদ করেছে। আর হুকুম দিয়েছে, যে তিন দিন মধ্যে ডাকিনীকে যদি না পাওয়া যায়, তবে সমস্ত রাজ্যের লোকের সমুখে (সেই দেবীকে) উলঙ্গ ক'রে চাঁড়ালের দ্বারা বেত মারিবে।

রাম। হো! হো! হোহো! দেবতার আবার কি করবে! রাজাকে কি পাগল হয়েছে! তা, মা কি কয়েদে গিয়েছেন না কি? তাঁকে কয়েদ করে কার বাপের সাধ্য?

শ্যাম। দেবচরিত্র কার সাধ্য বুঝে! রাজার নাকি রাজ্যভোগের নির্দ্দিষ্ট কাল ফুরেয়েছে, তাই মা ছল ধরিয়া, এখন স্বধামে গমনের চেষ্টায় আছেন। রাজা কয়েদের হুকুম দিলেন, মা সচ্ছন্দে গজেন্দ্র গমনে কারাগার মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিলেন। শুনতে পাই, রাত্রে কাগাগার মহা কোলাহল উপস্থিত হয়। যত দেবতারা আসিয়া স্তব পাঠ করেন—ঋষিরা আসিয়া বেদ পাঠ মন্ত্র পাঠ করেন। পাহারায়োলারা বাহির হইতে শুনিতে পায়, কিন্তু দ্বার খুলিলেই সব অন্তর্দ্ধান হয়। (বলা বাহুল্য যে জয়ন্তী নিজেই রাত্রকালে ঈশ্বর স্তোত্র পাঠ করেন। পাহারোয়ালারা তাহাই শুনিতে পায়)

রাম। তারপর?

শ্যাম। তারপর, এখন আজ সে তিন দিন পূরিল। রাজা ঢেঁট্‌রা দিয়েছেন যে কাল একমাগী চোরকে বেইয্যৎ করিয়া বেত মারা যাইবে, যাহার ইচ্ছা হয় দেখিতে আসিতে পারে। শুন নাই?

রাম। কি দুর্ব্বুদ্ধি! তর্কালঙ্কার ঠাকুরই বা কিছু বলেন না কেন? বড় রাণী, বা কিছু বলেন না কেন? দুটো গালির ভয়ে কি তাঁরা আর কাছে আসিতে পারেন না?

শ্যাম। তাঁরা না কি অনেক বলেছেন। রাজা বলেন, ভাল দেবতাই যদি হয়, তবে আপনার রক্ষা আপনিই করিবে, তোমাদের কথা কহিবার প্রয়োজন কি? আর যদি মানুষ হয়, তবে আমি রাজা, চোরের দণ্ড আমি দিব, তোমাদের কথা কহিবার প্রয়োজন কি?

রাম। তা এক রকম বলেছে মন্দ নয়—ঠিক কথাই ত। তা ব্যাপারটা কি হয়, কাল দেখতে যেতে হবে। তুমি যাবে?

শ্যাম। যাব বৈ কি? সবাই যাবে। এমন কাণ্ড কেনা দেখ্‌তে যাবে।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

আজ জয়ন্তীর বেত্রাঘাত হইবে। রাজ্যে ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে যে তাহাকে বিবস্ত্রা করিয়া বেত্রাঘাত করা হইবে। প্রভাত হইতে লোক আসিতে আরম্ভ করিল। বেলা অল্প হইতে দুর্গ পরিপূর্ণ হইল আর লোক ধরে না। ক্রমে

ঠেসাঠেসি ঘেঁষাঘেঁষি পেষাপিষি মিশামিশি হইতে লাগিল। এই দুর্গমধ্যে আর এক দিন এমনই লোকারণ্য হইয়াছিল—সে দিন রমার বিচার। আজ জয়ন্তীর দণ্ড। বিচার অপেক্ষা দণ্ড দেখিতে লোক বেশী আসিল। নন্দা বাতায়ন হইতে দেখিলেন, কালো চুল মাথার তরঙ্গ ভিন্ন আর কিছু দেখা যায় না; কদাচিৎ কোন স্ত্রীলোকের মাথায় অাঁচল, বা কোন পুরুষের মাথা চাদর জড়ান, সেই কৃষ্ণসাগরে ফেনরাজির ন্যায় ভাসিতেছে। সেই রমার পরীক্ষা নন্দার মনে পড়িল, কিন্তু মনে পড়িল যে, সে দিন দেখিয়াছিলেন যে সেই জনার্ণব বড় চঞ্চল, সংক্ষুব্ধ, যেন বাত্যাতাড়িত; রাজপুরুষেরা কষ্টে শান্তি রক্ষা করিয়াছিল, আজ সকলেই নিস্তব্ধ। সকলেরই মনে রাজ্যের অমঙ্গল আশঙ্কা বড় জাগরুক। সকলেই মনে মনে ভয় পাইতেছিল। আজ এই লোকারণ্য সিংহব্যাঘ্রবিক্রান্ত মহারণ্য অপেক্ষাও ভয়ানক দেখাইতেছিল।

সেই বৃহৎ দুর্গ প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে এক উচ্চ মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তদুপরি এক কৃষ্ণকায় বলিষ্ঠ গঠন বিকটদর্শন চাণ্ডাল, মূর্ত্তিমান অন্ধকারের ন্যায় দীর্ঘ বেত্র হস্তে লইয়া দণ্ডায়মান আছে। জয়ন্তীকে তদুপরি আরোহণ করাইয়া, সর্ব্বসমক্ষে বিবস্ত্রা করিয়া সেই চাণ্ডাল বেত্রাঘাত করিবে, ইহাই রাজাজ্ঞা।

জয়ন্তীকে এখনও সেখানে আনা হয় নাই। রাজা এখনো আসেন নাই—আসিলে তবে তাহাকে আনা হইবে। মঞ্চের সম্মুখে রাজার জন্য সিংহাসন রক্ষিত হইয়াছে। তাহা বেষ্টন করিয়া চোপদার ও সিপাহীগণ দাঁড়াইয়া আছে। অমাত্যবর্গ আজ সকলেই অনুপস্থিত। এমন কুকাণ্ড দেখিতে আসিতে কাহারও প্রবৃত্তি হয় নাই। রাজাও কাহাকে ডাকেন নাই।

কতক্ষণে রাজা আসিবেন, কতক্ষণে সেই দণ্ডনীয়া দেবী বা মানবী আসিবে, কতক্ষণে কি হইবে, সেই জন্য প্রত্যাশাপন্ন হইয়া লোকারণ্য ঊর্দ্ধমুখ হইয়াছিল। এমন সময়ে হঠাৎ নকিব ফুকরাইল; স্তাবকেরা স্তুতিবাদ করিল। দর্শকেরা জানিল রাজা আসিতেছেন।

রাজার আজ বেশ ভূষার কিছুমাত্র পারিপাট্য নাই—বৈশাখের দিনান্ত কালের মেঘের মত রাজা আজ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি! আয়ত চক্ষু আরক্ত বর্ণ—বিশাল বক্ষ মধ্যে মধ্যে স্ফীত ও উচ্ছ্বসিত হইতেছে। বর্ষণোম্মুখ জলধরের

উন্নমনের ন্যায় রাজা আসিয়া সিংহাসনের উপর বসিলেন। কেহ বলিল না, মহারাজাধিরাজ কি জয়!"

তখন সেই লোকারণ্য উর্দ্ধমুখ হইয়া ইতস্ততঃ দেখিতে লাগিল—দেখিল সেই সময়ে প্রহরীগণ জয়ন্তীকে লইয়া মঞ্চোপরি আরোহণ করিতেছে। প্রহরীরা তাহাকে মঞ্চোপরি স্থাপিত করিয়া চলিয়া গেল। কোন প্রাসাদ শিখরোপরে উদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় জয়ন্তীর অতুলনীয় রূপরাশি সেই মঞ্চোপরে উদিত হইল। তখন সেই সহস্র সহস্র দর্শক, উর্দ্ধমুখে, উৎক্ষিপ্তলোচনে, গৈরিক বসনাবৃতা মঞ্চস্থা অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সেই উন্নত, সম্পূর্ণায়ত, ললিত মধুর অথচ উজ্জ্বল জ্যোতির্ব্বিশিষ্ট দেহ; তাহার দেবোপম স্থৈর্য্য—দেবদুর্ল্লভ শান্তি; সকলে বিমুগ্ধ হইয়া দেখিতে লাগিল। দেখিল জয়ন্তীর নবরবিকরপ্রোদ্ভিন্ন পদ্মবৎ অপূর্ব্ব প্রফুল্ল মুখ; এখনও অধর ভরা মৃদু মধুর মন্দ স্নিগ্ধ বিনম্র হাস্য—সর্ব্ববিপদ্ সংহারিণী শক্তির পরিচয় স্বরূপসেই স্নিগ্ধ মধুর মন্দহাস্য! দেখিয়া, অনেকে দেবতা জ্ঞানে যুক্তকরে প্রণাম করিল। যখন কতকগুলি লোক দেখিল, আর কতকগুলি লোক জয়ন্তীকে প্রণাম করিতেছে—তখন তাহাদেরও মনে সেই ভক্তিভাব প্রবেশ করিল। তখন তাহারা "জয় মায়ি কি জয়!" "জয় লছমী মায়ি কি জয়! ইত্যাদি ঘোররবে জয়ধ্বনি করিল। সেই জয়ধ্বনি ক্রমে ক্রমে প্রাঙ্গনের একভাগ হইতে, অপর ভাগে, এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে গিরিশ্রেণীস্থিত বজ্রনাদের মত প্রক্ষিপ্ত ও প্রতিহত হইতে লাগিল। শেষ সেই সমবেত লোক সমারোহ এককণ্ঠ হইয়া তুমুল জয় শব্দ করিল। পুরী কম্পিতা হইল। চাণ্ডালের হস্ত হইতে বেত্র খসিয়া পড়িল। জয়ন্তী মনে মনে ডাকিতে লাগিল "জয় জগদীশ্বর! তোমারি জয়! তুমি আপনিই এই লোকারণ্য, আপনিই এই লোকের কণ্ঠে থাকিয়া, আপনার জয়বাদ আপনিই দিতেছ! জয় জগন্নাথ তোমারই জয়! আমি কে?"

ক্রুদ্ধ রাজা তখন অগ্নি মূর্ত্তি হইয়া মেঘ গম্ভীর স্বরে চাণ্ডালকে আজ্ঞা করিলেন, "কাপড় কাড়িয়া নিয়া বেত লাগা!"

এই সময়ে চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার সহসা রাজসমীপে আসিয়া রাজার দুইটি হাত ধরিলেন। বলিলেন "মহারাজ! রক্ষা কর! আমি আর কখন

ভিক্ষা চাহিব না, এই বার আমায় এই ভিক্ষা দাও—ইহাঁকে ছাড়িয়া দাও।”

রাজা (ব্যঙ্গের সহিত)। কেন—দেবতার এমন সাধ্য নাই, যে আপনি ছাড়াইয়া যায়! বেটী জুয়াচোরের উচিত শাসন হইতেছে।

চন্দ্র। দেবতা না হইল—স্ত্রীলোক বটে।

রাজা। স্ত্রীলোকেরও রাজা দণ্ড করিতে পারেন।

চন্দ্র। এই জয়ধ্বনি শুনিতেছেন? এই জয়ধ্বনিতে আপনার রাজা নাম ডুবিয়া যাইতেছে।

রাজা। ঠাকুর! আপনার কাজে যাও। পুঁথি পাঁজি নাই কি?

চন্দ্রচূড় চলিয়া গেলেন। তখন চাণ্ডাল পুনরপি রাজাজ্ঞা পাইয়া আবার বেত উঠাইয়া লইল—বেত উচু করিল—জয়ন্তীর মুখ প্রতি চাহিয়া দেখিল বেত নামাইয়া—রাজার পানে চাহিল—আবার জয়ন্তীর পানে চাহিল—শেষ বেত আছাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

“কি!” বলিয়া রাজা বজ্রের ন্যায় শব্দ করিলেন।

চাণ্ডাল বলিল, “মহারাজ! আমা হইতে হইবে না।”

রাজা বলিলেন, “তোমাকে শূলে যাইতে হইবে।”

চাণ্ডাল, যোড়হাত করিয়া বলিল, “মহারাজের হুকুমে তা পারিব। এ পারিব না।”

তখন রাজা অনুচর বর্গকে আদেশ করিলেন, “চাণ্ডালকে ধরিয়া লইয়া গিয়া কয়েদ কর।”

রক্ষিবর্গ চাণ্ডালকে ধরিবার জন্য মঞ্চের উপর আরোহণ করিতে উদ্যত দেখিয়া জয়ন্তী সীতারামকে বলিলেন, “এ ব্যক্তিকে পীড়ন করিবেন না, আপনার যে আজ্ঞা আমি নিজেই পালন করিতেছি—চাণ্ডাল বা জল্লাদের প্রয়োজন নাই।” তথাপি রক্ষিবর্গ চাণ্ডালকে ধরিতে আসিতেছে দেখিয়া, জয়ন্তী তাহাকে বলিল, “বাছা! তুমি আমার জন্য কেন দুঃখ পাইবে। আমি সন্ন্যাসিনী, আমার কিছুতেই সুখ দুঃখ নাই; বেতে আমার কি হইবে? আর বিবস্ত্র—সন্ন্যাসীর পক্ষে বস্ত্র বিবস্ত্র সমান। কেন দুঃখ পাও—বেত তোল।

চাণ্ডাল বেত উঠাইল না। জয়ন্তী তখন চাণ্ডালকে বলিল, "বাছা! স্ত্রীলোকের কথা বলিয়া বিশ্বাস করিলে না—এই তার প্রমাণ দেখ।" এই বলিয়া জয়ন্তী আপনি বেত উঠাইয়া লইয়া, দক্ষিণ হস্তে দৃঢ়মুষ্টিতে তাহা ধরিল। পরে সেই জনসমারোহ সমক্ষে, আপনার প্রফুল্লপদ্মসন্নিভ রক্তপ্রভ ক্ষুদ্র করপল্লব পাতিয়া, সবলে তাহাতে বেত্রাঘাত করিল। বেত, মাংস কাটিয়া লইয়া উঠিল—হাতে রক্তের স্রোত বহিল। জয়ন্তীর গৈরিক বস্ত্র এবং মঞ্চতল তাহাতে প্লাবিত হইল। দেখিয়া লোকে হাহাকার করিতে লাগিল।

জয়ন্তী মৃদু হাসিয়া চাণ্ডালকে বলিল, "দেখিলে বাছা! সন্ন্যাসিনীকে কি লাগে? তোমার ভয় কি?"

চাণ্ডাল একবার রুধিরাক্ত ক্ষত পানে চাহিল—একবার জয়ন্তীর সহাস্য প্রফুল্ল মুখপানে চাহিয়া দেখিল—দেখিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া, অতি ত্রস্তভাবে মঞ্চ সোপান অবরোহণ করিয়া, ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। লোকারণ্য মধ্যে সে কোথায় লুকাইল, কেহ দেখিতে পাইল না।

রাজা তখন অনুচরবর্গকে আজ্ঞা করিলেন, "দোসরা লোক লইয়া আইস—মুসলমান।"

অনুচরবর্গ, কালান্তক যমের সদৃশ একজন কসাইকে লইয়া আসিল। সে মহম্মদপুরে গোরু কাটিতে পারিত না—কিন্তু নগর প্রান্তে বকরি মেড়া কাটিয়া বেচিত। সে ব্যক্তি অতিশয় বলবান ও কদাকার। সে রাজাজ্ঞা পাইয়া মঞ্চের উপর উঠিয়া, বেত হাতে লইয়া জয়ন্তীর সম্মুখে দাঁড়াইল। বেত উঁচু করিয়া, কসাই জয়ন্তীকে বলিল, "কাপড়া উতার্—তেরি গোশ্‌ত টুক্‌রা টুক্‌রা কর্‌কে হাম দোকানমে বেচেঙ্গে।"

জয়ন্তী তখন, অপরিম্লান মুখে, জনসমারোহকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, রাজাজ্ঞায় এই মঞ্চের উপর বিবস্ত্র হইব। তোমাদের মধ্যে যে সতীপুত্র হইবে, সেই আপনার মাতাকে স্মরণ করিয়া ক্ষণকাল জন্য এখন চক্ষু আবৃত করুক। যাহার কন্যা আছে, সেই আপনার কন্যাকে মনে করিয়া, আমাকে সেই কন্যা ভাবিয়া চক্ষু আবৃত করুক। যে হিন্দু, যাহার দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তি আছে, সেই চক্ষু আবৃত করুক। যাহার মাতা অসতী, যে বেশ্যার

গর্ভে জন্মিয়াছে, সে যাহা ইচ্ছা করুক, তাহার কাছে আমার লজ্জা নাই, আমি তাহাদের মনুষ্যের মধ্যে গণ্য করি না।"

লোকে এই কথা শুনিয়া চক্ষু বুজিল কি না বুজিল, জয়ন্তী তাহা আর চাহিয়া দেখিল না। মন তখন খুব উচু সুরে বাঁধা আছে—জয়ন্তী তখন জগদীশ্বর ভিন্ন আর কাহাকে দেখিতে পাইতেছে না। জয়ন্তী কেবল রাজার দিকে ফিরিয়া বলিল, "তোমার আজ্ঞায় আমি বিবস্ত্র হইব। কিন্তু তুমি চাহিয়া দেখিও না। তুমি রাজ্যেশ্বর; তোমায় পশুবৃত্ত দেখিলে প্রজারা কি না করিবে? মহারাজ! আমি বনবাসিনী. বনে থাকিতে গেলে অনেক সময়ে বিবস্ত্র হইতে হয়। একদা আমি বাঘের মুখে পড়িয়াছিলাম—বাঘের মুখ হইতে আপনার শরীর রক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম, কিন্তু বস্ত্র রক্ষা করিতে পারি নাই। তোমাকেও আমি. তোমার আচরণ দেখিয়া সেই রূপ বন্য পশু মনে করিতেছি, অতএব তোমার কাছে আমার লজ্জা হইতেছে না। কিন্তু তোমার লজ্জা হওয়া উচিত—কেননা তুমি রাজা, এবং গৃহী, তোমার মহিষী আছেন। চক্ষু বুজ।"

বৃথা বলা! তখন মহাক্রোধান্ধকারে রাজা একেবারে অন্ধ হইয়াছেন। জয়ন্তীর কথার কোন উত্তর না দিয়া, কসাইকে বলিলেন, "জবরদস্তী কাপড়া উতার লেও!"

তখন জয়ন্তী আর বৃথা কথা না কহিয়া, জানু পাতিয়া মঞ্চের উপর বসিল। জয়ন্তী আপনার কাছে, আপনি ঠকিয়াছে,—এখন বুঝি জয়ন্তীর চোখে জল আসে। জয়ন্তী মনে করিয়াছিল, "যখন পৃথিবীর সকল সুখদুঃখে জলাঞ্জলি দিয়াছি, যখন আর আমার সুখও নাই দুঃখও নাই, তখন আমার আবার লজ্জা কি? ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে আমার মনের যখন কোন সম্বন্ধ নাই, তখন আমার আর বিবস্ত্র আর সবস্ত্র কি? পাপই লজ্জা, আবার কিসে লজ্জা করিব? জগদীশ্বরের নিকট ভিন্ন. সুখদুঃখের অধীন মনুষ্যের কাছে লজ্জা কি? আমি কেন এই সভা মধ্যে বিবস্ত্র হইতে পারিব না?" তাই, জয়ন্তী এতক্ষণ আপনাকে বিপন্নই মনে করে নাই—বেত্রাঘাতটা ত গণ্যের মধ্যে নহে। কিন্তু এখন যখন বিবস্ত্র হইবার সময় উপস্থিত হইল—তখন কোথা হইতে পাপ লজ্জা আসিয়া সেই ইন্দ্রিয়বিজয়িনী সুখদুঃখবর্জ্জিতা জয়ন্তীকে ও

আসিয়া অভিভূত করিল। তাই নারীজন্মকে ধিক্কার দিয়া জয়ন্তী মঞ্চতলে জানু পাতিয়া বসিল! তখন যুক্তকরে, পবিত্রচিত্তে জয়ন্তী আত্মাকে সমাহিত করিয়া মনে মনে ডাকিতে লাগিল "দীনবন্ধু! আজ রক্ষা কর! মনে করিয়াছিলাম, বুঝি এ পৃথিবীর সকল সুখদুঃখে জলাঞ্জলি দিয়াছি, কিন্তু হে দর্পহারী! আমার দর্প চূর্ণ হইয়াছে, আমায় আজ রক্ষা কর! নারীদেহ কেন দিয়াছিলে, প্রভু! সব সুখদুঃখ বিসর্জ্জন করা যায়, কিন্তু নারীদেহ থাকিতে লজ্জা বিসর্জ্জন করা যায়না। তাই আজ কাতরে ডাকিতেছি, জগন্নাথ! আজ রক্ষা কর।"

যতক্ষণ জয়ন্তী জগদীশ্বরকে ডাকিতেছিল, ততক্ষণ কসাই তাহার অঞ্চল ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছিল। দেখিয়া সমস্ত জনমণ্ডলী এককণ্ঠে হাহাকার শব্দ করিতে লাগিল—বলিতে লাগিল, "মহারাজ! এই পাপে তোমার সর্ব্বনাশ হইবে—তোমার রাজ্য গেল।" রাজা কর্ণপাতও করিলেন না। নিরুপায় জয়ন্তী, আপনার অঞ্চল ধরিয়া টানাটানি করিতেছিল, ছাড়িতেছিল না। তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছিল। শ্রী থাকিলে বড় বিস্মিতা হইত—জয়ন্তীর চক্ষে আর কখন কেহ জল দেখে নাই। জয়ন্তী রুধিরাক্ত ক্ষতহস্তে আপনার অঞ্চল ধরিয়া ডাকিতে ছিল, "জগন্নাথ! রক্ষা কর!"

বুঝি জগন্নাথ সে কথা শুনিলেন। সেই অসংখ্য জনসমূহ হাহাকার করিতে করিতে সহসা আবার জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। "রাণী জি কি জয়! মহারাণীকি জয়! দেবী কি জয়!" এই সময়ে অধোমুখী জয়ন্তীর কর্ণে অলঙ্কারশিঞ্জিত প্রবেশ করিল। তখন জয়ন্তী মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, সমস্ত পৌরস্ত্রী সঙ্গে করিয়া, মহারাণী নন্দা মঞ্চোপরি আরোহণ করিতেছেন। জয়ন্তী উঠিয়া দাঁড়াইল।

সেই সমস্ত পৌরস্ত্রী জয়ন্তীকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। মহারাণী নিজে জয়ন্তীকে আড়াল করিয়া, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। দর্শকেরা সকলে করতালি দিয়া হরিবোল দিতে লাগিল। কসাই জয়ন্তীর আঁচল ছাড়িয়া দিল, কিন্তু মঞ্চ হইতে নামিল না।

রাজা অত্যন্ত বিস্মিত ও রুষ্ট হইয়া অতি পরুষভাবে নন্দাকে বলিলেন, "একি এ মহারাণী?"

নন্দা বলিলেন " মহারাজ! আমি পতিপুত্রবতী। আমি জীবিত থাকিতে তোমাকে কখন এ পাপ করিতে দিব না। তাহা হইলে আমার কেহ থাকিবে না। "

রাজা পূর্ব্ববৎ ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, " তোমার স্থান অন্তঃপুরে, এখানে নয়। অন্তঃপুরে যাও। "

নন্দা সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিল, " মহারাজ! আমি যে মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়াছি, এই কসাইটা সেই মঞ্চে দাঁড়াইয়া থাকে কোন্ সাহসে? উহাকে নামিতে আজ্ঞা দিন। "

রাজা কথা কহিলেন না। তখন নন্দা উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, " এই রাজপুরী মধ্যে আমার কি এমন কেহ নাই, যে এটাকে নামাইয়া দেয়। "

তখন সহস্র দর্শক এককালে " মার! মার! " শব্দ করিয়া কসাইয়ের প্রতি ধাবমান হইল। সে লম্ফ দিয়া মঞ্চ হইতে পড়িয়া পালাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু দর্শকগণ তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া, মারিতে মারিতে দুর্গের বাহিরে লইয়া গেল। পরে অনেক লাঞ্ছনা করিয়া প্রাণমাত্র রাখিয়া ছাড়িয়া দিল।

নন্দা জয়ন্তীকে বলিল, " মা! দয়া করিয়া অভয় দাও! মা, আমার বড় ভয় হইতেছে, পাছে কোন দেবতা ছলনা করিতে আসিয়া থাকেন। মা! অপরাধ লইও না। একবার অন্তঃপুরে পায়ের ধূলা দিবে চল, আমি তোমার পূজা করিব। "

তখন রাণী পৌরস্ত্রীগণ সমভিব্যাহারে জয়ন্তীকে ঘেরিয়া অন্তঃপুরে লইয়া চলিলেন। রাজা কিছু করিতে না পারিয়া সিংহাসন হইতে উঠিয়া গেলেন। তখন মহাকোলাহল পূর্ব্বক, এবং নন্দাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে, দর্শক-মণ্ডলী দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

অন্তঃপুরে গিয়া জয়ন্তী ক্ষণকালও অবস্থিতি করিল না। নন্দা অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া, স্বহস্তে গঙ্গাজলে জয়ন্তীর পা ধুয়াইয়া, সিংহাসনে বসাইতে গেলেন। কিন্তু জয়ন্তী হাসিয়া উড়াইয়া দিল। বলিল, " মা! আমি কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমাদের মঙ্গল হউক। ক্ষণমাত্র জন্য মনে করিওনা যে আমি কোন প্রকার রাগ বা দুঃখ করিয়াছি।

ঈশ্বর না করুন, কিন্তু যদি কখনও তোমার বিপদ্ পড়ে, জানিতে পারিলে, আমি আসিয়া আমার যথাসাধ্য উপকার করিব। কিন্তু রাজপুরীমধ্যে সন্ন্যাসিনীর ঠাঁই নাই। অতএব আমি চলিলাম।” নন্দা এবং পৌরবর্গ জয়ন্তীর পদধূলি লইয়া তাঁহাকে বিদায় করিল।

গোলাপ ফুল।

১

ফুল! তুমি শিখাও আমারে,
অমনি করিয়া আমি ফুটে রব সংসারে!
অমনি পবিত্র বেশে, অমনি গৌরবে ভেসে,
অমনি আনন্দে হেসে কণ্টকের মাঝারে,
অমনি সুন্দর হ'য়ে বিরাজিব সংসারে!
ফুল! তুমি শিখাও আমারে।

২

ফুল! তুমি শিখাও আমারে,
ওই চির-সরলতা ধরিব এ অন্তরে!
রূপ রস গন্ধ ল'য়ে, ধরায় অতুল হ'য়ে,
অমনি বিনীত র'য়ে পরিতৃপ্ত আকারে,
অমনি সন্যাসী আমি হইব এ সংসারে!
ফুল! তুমি শিখাও আমারে।

৩

ফুল! তুমি শিখাও আমারে,
অমনি অকূল প্রাণ ধরিব এ অন্তরে!
কোমলতা পূর্ণ বুক, মমতায় পূর্ণ সুখ,
তবু তিল নাহি দুখ তাপ বৃষ্টি প্রহারে!
সাধনার মূর্ত্তি, মরি, তুমি ইহ সংসারে!
ফুল! তুমি শিখাও আমারে।

৪

ফুল! তুমি শিখাও আমারে,
অমনি করিয়া আমি সেবিব এ সংসারে!
ভুলি আশা অভিমান কেবলি শিখিব দান,
জুড়াতে পরের প্রাণ বিলাইব আমারে,
উচ্চ নীচ পাপী পুণ্য সমতুল্য আচারে,
ফুল! তুমি শিখাও আমারে।

৫

ফুল! তুমি শিখাও আমারে;
তুষিতে অমনি ক'রে পারি যেন সবারে!
বালকের খেলিবার, প্রেমিকের কণ্ঠহার,
সাধকের অর্চ্চনার, সুধা দিয়ে ভ্রমরে,
অমনি করিয়া আমি মোহিব এ সংসারে!
ফুল! তুমি শিখাও আমারে।

৬

ফুল! তুমি শিখাও আমারে,
সাধিবারে ধর্ম্ম যেন পারি ওই প্রকারে!
সুখ দুখ সমুদায় সমর্পিয়ে বিধাতায়,
বিলাইয়ে আপনার সদানন্দ আকারে,
ঘুচাতে বিষাদ যেন পারি ইহ সংসারে!
ফুল! তুমি শিখাও আমারে।

৭

ফুল! তুমি শিখাও আমারে,
ওই বিশ্বব্যাপী-প্রেম শিখিব কি প্রকারে!
কেমন করিয়ে হায়, ছড়াইব এ হৃদয়
কণ্টক ফুটিছে গায় চারি দিকে সংসারে;
রূপ রস গন্ধে সদা অন্ধ ক'রে আমারে,
নয়ন থাকিতে অন্ধ হ'য়ে আছি সংসারে!
ফুল! তুমি শিখাও আমারে।

৮

ফুল! তুমি শিখাও আমারে,
ওই পরিণাম তব লভিব কি আচারে!
রূপ গন্ধ শুকাইলে পরিমল ফুরাইলে
সেবিতে অশক্ত হ'লে ধর্ম্মক্ষেত্র ধরারে
অমনি আনন্দে ঝ'রে পড়িব এ সংসারে
ফুল! তুমি শিখাও আমারে।

ঈশান।

ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি।

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং নমামঃ।
অজা যে তাং জুষমাণাং ভজন্তে
জহত্যেনাং ভুক্তভোগান্ নুমস্তান্॥

এই জগতে নিত্য পদার্থ কি এবং অনিত্য পদার্থই বা কি ইহা আলোচনা করাই হিন্দু দর্শন শাস্ত্র সমূহের প্রথম উদ্দেশ্য। সাংখ্যদর্শন মতে পুরুষ এবং প্রকৃতি উভয়ই নিত্য পদার্থ। পুরুষ চেতন এবং প্রকৃতি জড়; প্রকৃতি কখন পুরুষ ছাড়া থাকেন না এবং পুরুষও প্রকৃতি ছাড়া থাকেন না; প্রকৃতির শক্তি হইতেই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় হইতেছে—অর্থাৎ এই সংসার-চক্র প্রবর্ত্তিত হইতেছে; পুরুষ এই প্রকৃতির লীলার দ্রষ্টা মাত্র; বদ্ধ পুরুষ, চেতন পদার্থ 'আপনা' (আত্মা) হইতে জড় প্রকৃতির প্রভেদ বুঝিতে পারেন না, সেই জন্যই দুঃখ যোগে বদ্ধ থাকেন; প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক জ্ঞান জন্মাইলেই পুরুষ, দুঃখযোগ হইতে মুক্ত হন এবং সংসারচক্র তাঁহার পক্ষে নিবৃত্ত হয়। দেহ এবং দেহীর যে সম্বন্ধ তাহাই প্রকৃতি ও পুরুষের সম্বন্ধ। গীতায় যে সাংখ্যযোগ কথিত হইয়াছে তাহাতে নিত্য চেতন পদার্থ পুরুষকে 'দেহী' এই নামে অভিহিত করা হইয়াছে। দেহের জন্ম মৃত্যু পরিবর্ত্তনাদি ব্যাপার প্রকৃতির নিয়মের অধীন; যে পুরুষ এই দেহের জন্ম মৃত্যু পরিবর্ত্তনাদি নিবন্ধন 'আপনাকে' (আত্মাকে) সুখদুঃখভোগী জ্ঞান করেন তিনিই

বদ্ধ পুরুষ; যাহার প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক জ্ঞান জন্মিয়াছে তিনি দেহ হইতে আপনাকে (দেহীকে) পৃথক বলিয়া বুঝেন এবং সেই জন্য দেহের সুখ দুঃখে আপনাকে সুখী বা দুঃখী জ্ঞান করেন না। যিনি দুঃখে কখনও উদ্বিগ্ন হন না এবং সুখেও বিগতস্পৃহ তিনিই সাংখ্য যোগীগণ মতে মুক্ত পুরুষ।

পুরুষের সান্নিধ্য বশতঃই প্রকৃতি নানাবিধ প্রজা সৃষ্টি করিতে সক্ষম হন। সুতরাং সাংখ্য দর্শনের প্রকৃতি কথার অর্থ বুঝিতে হইলে প্রকৃতিকে পুরুষের সহিত এক সঙ্গে ভাবিতে হইবে, নহিলে প্রকৃতি কথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যাইবে না। জড়প্রকৃতিকে চেতনপুরুষের সহিত সম্পর্কশূন্য বলিয়া যাঁহারা ভাবেন তাঁহারা সাংখ্যশাস্ত্রকথিত প্রকৃতির কার্য্য সকল বুঝিতে সক্ষম হইবেন না। আজ কালকার পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ জগতের মূলকারণ অন্বেষণ করিতে গিয়া যে "chaotic cosmic matter" কে জগতের আদি উপাদান বলিয়া বুঝিতেছেন, সাংখ্যশাস্ত্রের প্রকৃতি কথায় সেরূপ জড় পদার্থ বুঝায় না; তাঁহারা জড়ের যেরূপ শক্তিকে আদি শক্তি বলিয়া অনুমান করেন সাংখ্যের সত্ত্ব রজ তম শক্তি, কথায় সেরূপ শক্তি বুঝায় না। আজকালকার বিজ্ঞানবিৎগণ যে শক্তিতত্ত্ব আলোচনা করিতেছেন আর প্রাচীন পণ্ডিতগণ যে শক্তিতত্ত্ব আলোচনা করিতেন এ উভয়ের মধ্যে বড় একটি প্রভেদ আছে; এই প্রভেদটি না বুঝিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের শক্তি কথাটি আর প্রাচীন পণ্ডিতদের শক্তি কথায় এক অর্থ বুঝিলে অনেক ভ্রমে পড়িবার সম্ভাবনা। জড়ের শক্তির সহিত চেতনের যে কি সম্বন্ধ আজকালকার বিজ্ঞানবিদ্‌গণ তাহা ভাবেন না; পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের শক্তির সহিত চেতন পুরুষের কোন সম্বন্ধই নাই; কিন্তু প্রাচীন পণ্ডিতগণ চেতনের সহিত প্রকৃতির যে সম্বন্ধসূত্র তাহাকেই শক্তি নাম দিয়া গিয়াছেন; শক্তি কথার সঙ্গে সঙ্গেই চেতন জীবের অস্তিত্ব তাঁহাদের মনে আসিত; কিন্তু আজকালকার বিজ্ঞানবিদ্‌দের শক্তি কথাটিতে জড়ের সহিত জড়ের সম্বন্ধই মনে আসে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্‌গণ যখন তড়িৎ শক্তির কথা ভাবেন তখন তাঁহাদের মনের মধ্যে বাহ্য জড় পদার্থের উপর তড়িৎশক্তির যেরূপ ক্রিয়া দেখা যায়, সেই সকল কথাই উদয় হয়, কিন্তু প্রাচ্য পণ্ডিতগণ তড়িৎশক্তির কথা ভাবিতে গেলে ঐ শক্তি তাঁহাদের অন্তরে সুখপ্রদ কি দুঃখপ্রদ, যদি সুখপ্রদ হয় তবে সে সুখ

কোন জাতীয়, যদি দুঃখপ্রদ হয় তবে সে দুঃখ কোন জাতীয়, এই সকল কথাই ভাবিতেন। আর একটি উদাহরণ দিলে আমার কথা অনেকটা পরিষ্কার হইবে। ইচ্ছাশক্তি বলে একটি কথা আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে আছে; প্রাচীনগণ ইহা বুঝিতেন যে ইচ্ছানিবন্ধন জীবের মনের একটি অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় এবং সেই জন্যই ইচ্ছাকে শক্তি নাম দিয়াছেন। কিন্তু আজ-কালকার বিজ্ঞানবিদ্‌গণ ইচ্ছাশক্তি বলিলে জীবের ইচ্ছানিবন্ধন বাহ্যিক জড় পদার্থের উপর কিরূপ ক্রিয়া প্রকাশ পায় তাহাই ভাবিবেন। ইংরাজীর force কথার অর্থ এইরূপ—That which produces motion in matter is force. জড়ের গতির কারণের নাম foree। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রকথিত শক্তি কথার অর্থ এইরূপ—জীবের সংসার চক্রে গতির কারণের নাম শক্তি। জীব নাম ধারী যে 'আমি' সেই আমার যে অবস্থান্তর হয় সেই পরিবর্ত্তনের কারণকেই হিন্দু শাস্ত্রে শক্তি বলা যায়। এই সমস্ত কারণে সাংখ্য- যোগীগণ বা তান্ত্রিক যোগীগণ কথিত শক্তি কথার পরিবর্ত্তে ইংরাজী force বা energy কথা ব্যবহার করিতে গেলে একটু বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত।

সাংখ্যশাস্ত্রে জড় প্রকৃতিকেই সৃষ্টির আদি কারণ বলিয়া কথিত থাকাতে অনেকে মনে করেন যে সাংখ্য শাস্ত্রে কথিত সৃষ্টিপ্রক্রিয়া সম্বন্ধীয় কথা এবং জড়বাদী পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সৃষ্টিপ্রক্রিয়া সম্বন্ধে যে তথ্যে উপনীত হইয়াছেন, তাহা একই প্রকারের। কিন্তু সাংখ্য শাস্ত্রের মধ্যে একটু প্রবেশ করিয়া দেখিলে এইরূপ বিবেচনা ভুল বলিয়া বোধ হয়।

চেতন পুরুষের সান্নিধ্য বশতঃ প্রকৃতির কার্য্য আরম্ভ হয়, সাংখ্যদর্শনের এই কথাটি পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যতদিন না মানিবে ততদিন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সহিত সাংখ্য বৈজ্ঞনিক তত্ত্বের আদৌ ঐক্য হইবে না। সাংখ্যকারের মূল প্রকৃতি chaotic cosmic matter নহে কেননা সাংখ্য-কারের মূল প্রকৃতি নিজে জড় পদার্থ হইলেও উহা চৈতন্যের আভায় আভাম্বিত। মূল প্রকৃতি, প্রকৃতি-উপাধি-অভিমানী হিরণ্যগর্ভ পুরুষের দেহ। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদদের chaotic cosmic matter নিৰ্জ্জীব। আমাদের মূল প্রকৃতি জড় বটে কিন্তু সজীব। আমার সত্বানিবন্ধন আমার দেহকে যেমন সজীব বলা যায় কিন্তু বাস্তবিক দেহ জড় পদার্থ সেইরূপ

হিরণ্যাগর্ভ পুরুষের সত্বানিবন্ধন প্রকৃতি সজীব পদার্থ। এই সজীব দেহ হইতেই নানাবিধ প্রজা প্রসূত হইয়াছে।

আজকালকার পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্গণমতে এই জগত কাহারও সঙ্কল্প প্রসূত নহে কিন্তু সাংখ্য শাস্ত্র আলোচনায় ইহা বুঝা যায় যে, এই যে বাহ্য-জগৎ ব্যক্তাবস্থায় দেখিতেছি, এই ব্যক্তাবস্থার বীজস্বরূপ অব্যক্ত জগৎ সেই আদি পুরুষের অন্তঃকরণে বিদ্যমান ছিল। সাখ্যদর্শন অনুসারে সৃষ্টির প্রারম্ভে আদি পুরুষের অন্তঃকরণে যে ভাবময় বীজ প্রকাশিত হয় প্রকৃতিই তাহার কারণ; চেতন পুরুষ নিজে ভাবেন না প্রকৃতিই তাঁহাকে ভাবায়। সাংখ্য দর্শনের এক কথায় পুরুষ নিজে কিছুই করেন না তিনি অপরিণামী কূটস্থ; যাহা কিছু কার্য্য এই জগতে হইতেছে তাহা প্রকৃতি হইতেই হইতেছে; কিন্তু নিত্য—পুরুষের অধিষ্ঠান বশতঃই প্রকৃতি কার্য্য করিতে সমর্থ হয় নচেৎ প্রকৃতি কোন কার্য্য করিতে পারেনা এবং এই জন্যই প্রকৃতিকে জড় পদার্থ বলে।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আলোচনা করিয়া সৃষ্টির প্রথমাবস্থা যখন ভাবা যায় তখন দেখি যে জড় পরমাণুর এক বিস্তৃত সমুদ্র চক্ষের সমক্ষে রহিয়াছে। পরমাণু সকল ঘুরিতেছে নড়িতেছে একটি অপরটিকে আঘাত করিতেছে, আবার প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে,পরমাণু সমুদ্রে নানারূপ আবর্ত্ত ঘুরিতেছে। কিন্তু সাংখ্যদর্শন আলোচনা করিয়া যখন সেই সময়ের কথা ভাবা যায়, যে সময় মহৎতত্ব মূল প্রকৃতি হইতে প্রসূত হইয়া সৃষ্টিক্রিয়া আরম্ভ হইল তখন দেখি, যে জ্যোতির্ম্ময় তেজপুঞ্জ মধ্যে চেতন পুরুষ একজন ধ্যান পরায়ণ হইয়া রহিয়াছেন; প্রকৃতির গুণক্ষোভ হওয়ায় তাঁহার অন্তরে জ্ঞানময় ভাবের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে; সৃষ্টির প্রারম্ভে বুদ্ধিতত্ব প্রসূত হইয়া বুদ্ধিতত্বে লীন পুরুষকে ধ্যানে নিমগ্ন করানই তাহার শক্তির ক্রিয়া; এই ধ্যানস্থ পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ বুদ্ধিতত্ব অহংকারতত্ব প্রসব করিল এবং এই রূপে সৃষ্টি কার্য্য চলিল।

এইরূপে যখনই একটু ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখা যায় তখনই ইহাই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, সাংখ্যকার সৃষ্টিবিজ্ঞান সম্বন্ধে যে তথ্যে উপনীত হইয়াছিলেন, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিংগণ সে দিক দিয়াও যান নাই।

সাংখ্যকার প্রকৃতিকে জড়পদার্থ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু এই জড় কথা আর পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের Inanimate Matter একার্থবোধক নহে। প্রকৃতি জড় হইলেও কখনও জীবন শূন্য নহে; পুরুষসংযোগ ব্যতীত প্রকৃতি প্রকাশ পায় না, পুরুষ প্রকৃতিকে বুঝিতে পারে কিন্তু প্রকৃতি নিজেকে বুঝিতে পারে না এই জন্যই প্রকৃতিকে জড় পদার্থ বলা যায়। কিন্তু যেমন একটি বৃক্ষ জড় পদার্থ হইলেও উহাকে সজীব বলা যায়, কেননা উহার জন্ম বর্দ্ধন অবস্থান্তর পরিণাম ইত্যাদি আছে, সেইরূপ প্রকৃতি নিত্যা হইলেও উহার ক্রমপরিণাম আছে এবং সেই ক্রমপরিণাম প্রকৃতির অভ্যন্তরস্থ শক্তির বশে একটি অবশ্যম্ভাবী নিয়মানুযায়ী হইতেছে বলিয়া প্রকৃতিকে সজীব পদার্থ বলা যায়। তান্ত্রিক যোগীগণ জীবনী শক্তিকেই (কুণ্ডলিনী শক্তি) প্রকৃতির অন্তর্ব্বাহী শক্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। আভ্যন্তরিক শক্তির বশে যাহার উৎপত্তি বর্দ্ধন ও ক্রমপরিণাম দেখিতে পাওয়া যায় তাহাকেই সজীব পদার্থ বলে এবং সেই আভ্যন্তরিক শক্তির নাম জীবনী শক্তি। এই অর্থে প্রকৃতিই সজীব পদার্থ কিন্তু পুরুষের জীবন নাই এবং সেই জন্য মরণও নাই। সুতরাং পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের Inanimate Universeকে প্রকৃতি বলা যায় না। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ জীবভূতা প্রকৃতিকেই পরা প্রকৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধিমে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ। গীতা ৭।৫। ইহা হইতে বুঝা যায় যে কেবল মাত্র জীবনী শক্তিই মূল প্রকৃতির অভ্যন্তরস্থা শক্তি। ইয়ুরোপে এক সময় প্রাচীন দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা ছিল সেই সময়কার দার্শনিকগণ Animus mundi (The Universal life) অর্থে যাহা বুঝিতেন আমাদের প্রকৃতি কথারও তাহাই অর্থ। এই বিশ্বব্যাপী জীবনী শক্তি হইতে প্রথমে যে জীব উৎপন্ন হন তিনি বা তাঁহারা বুদ্ধিমান, সংশয়রহিত বুদ্ধিরিন্দ্রিয় ভিন্ন তাঁহাদের অন্য কোন জ্ঞানেন্দ্রিয় বা কর্ম্মেন্দ্রিয় নাই, এই কথা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যবে প্রমাণ করিতে পারিবে তবেই তাঁহাদের বিজ্ঞান সাংখ্যের বিজ্ঞানের সমকক্ষতা লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

প্লেটোর দর্শন শাস্ত্রের কথাসকল আমাদের দর্শন শাস্ত্রের কথাসকল অনেকটা এক রকম। প্লেটো বলেন যে বাহ্য জগতে যে সকল ঘটনা (pheno-

mena) দেখা যায় ইহারা ভাবময় জগতের ভাব সমূহ (Ideas) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; এই ভাবসমষ্টিই সাংখ্য দর্শনের বুদ্ধিতত্ব। যে মূল ভাব সকল* হইতে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে সেই ভাব সমূহের সমষ্টি ভাবের দ্রষ্টা যে পুরুষ, তাঁহাকেই হিন্দুগণ হিরণ্যগর্ভ, বিরাট পুরুষ বা ঈশ্বর নামে অভিহিত করেন। (এই পুরুষ কথায় হস্তপদমস্তক বিশিষ্ট মনুষ্য বলিয়া যেন কেহ না বুঝেন)।

চেতন পুরুষের সম্পর্ক ছাড়িয়া, জড় জগৎকে যিনি ভাবনা করিবেন তিনি সাংখ্য দর্শনের প্রকৃতি কথার অর্থ আদৌ বুঝিতে পারিবেন না। এই কথাটি মনে রাখিয়া তবে প্রকৃতির সত্ব রজ ও তম গুণের প্রকৃত অর্থ সনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।

প্রকৃতির সহিত চেতন পুরুষের যে সম্বন্ধ সেইটি আলোচনা করিয়া সত্ব রজ ও তম গুণ কথাটির অর্থ বুঝিতে হইবে।

সত্ত্বং রজ স্তম ই'তি গুণাঃ প্রকৃতি সম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো! দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥ ৫
তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকং অনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ॥ ৬
রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্॥ ৭
তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্ব দেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত॥ ৮
সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত॥ ৯

---

* এই মূল ভাব সকলই বেদবাক্য; যে পুরুষ যে ভাবের স্রষ্টা এবং প্রকাশক তিনি সেই বাক্যের ঋষি; এবং সেই বাক্যনিহিত প্রকৃতির যে যে শক্তি হইতে বাহ্য জগতীয় কার্য্য প্রবর্ত্তিত হয় সেই শক্তির নাম দৈবশক্তি। বেদ কথার প্রকৃত অর্থ The book of universal life; এই স্বাভাবিক গ্রন্থের কতক কতক আমরা যাহারে বেদশাস্ত্র বলি তাহার মধ্যে আছে।

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃসত্ত্বং রজস্তথা ॥ ১০
সর্ব্বদ্বারেষ্ দেহেস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ ১১
লোভঃ প্রবৃত্তিবারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১২
অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহএব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩

শ্রীভগবদ্গীতা ১৪ অধ্যায়।

সত্ত্ব রজ ও তমঃ এই গুণত্রয় প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয় এবং ইহারই অব্যয় দেহীকে (চেতন আত্মাকে) দেহে আবদ্ধ করিয়া রাখে।

তন্মধ্যে সত্ত্ব গুণপ্রকাশক এবং অনাময়; নির্ম্মলতা হেতু এই সত্ত্বগুণ দেহীকে সুখসঙ্গে এবং জ্ঞানসঙ্গে বদ্ধ করে।

রজগুণ রাগাত্মক এবং তৃষ্ণা সাঙ্গ হইতে সমুদ্ভূত, এই গুণ দেহীকে কর্ম্ম সঙ্গে বদ্ধ করে।

তমগুণকে অজ্ঞানজ বলিয়া জানিও, ইহা দেহী সকলকে মোহে মুগ্ধ করে এবং প্রমাদ আলস্য ও নিদ্রায় আবদ্ধ করে।

সত্ত্ব দেহীগণকে সুখে আসক্ত করে. রজঃ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে, এবং জ্ঞান আবরণ করিয়া তমগুণ প্রমাদের বশীভূত করে। সত্ত্বগুণ রজ ও তমকে, রজোগুণ সত্ত্ব ও তমকে এবং তমগুণ সত্ত্ব ও রজকে অভিভূত করিয়া উদ্ভূত হইয়া থাকে।

যখন দেহের সর্ব্ব দ্বারে জ্ঞানের প্রকাশ উপস্থিত হয় তখন সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে বুঝিও

রজগুণ বৃদ্ধি পাইলে লোভ প্রবৃত্তি কর্ম্মারম্ভ স্পৃহা ও অশান্তির উদয় হয় তমগুণ বৃদ্ধি পাইলে বিবেক ভ্রংশ অপ্রবৃত্তি প্রমাদ ও মোহ উপস্থিত হয়।

গীতা হইতে যে কথা গুলি উদ্ধৃত হইল তাহা হইতে ইহা বুঝা যায় যে সুখ ও জ্ঞান প্রদা শক্তির নাম সত্ত্বগুণ, যে শক্তি নিবন্ধন পুরুষের চিত্তে

চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়া তাঁহার কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে তাহারই নাম রজোগুণ এবং যে জন্য মোহ উপস্থিত হইয়া আলস্যের উদয় হয় তাহারই নাম তমো-গুণ। জীবজগতে জীবনী শক্তি তিন প্রকার রূপ ধারণ করিয়া প্রকাশ পায়; যেখানে সুখের ও জ্ঞানের প্রাধান্য তাহাই সাত্ত্বিক জীবন, যেখানে কর্ম্মে প্রবৃত্তির প্রাধান্য তাহাই রাজসিক জীবন এবং যেখানে আলস্য এবং জড়তার প্রাধান্য তাহাই তামসিক জীবন। স্পেন্সর ডারুইন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ জীবের ক্রমাভিব্যক্তিতত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়া, জীবনী শক্তির আকার দেখিতে পাইয়াছেন তাহাই বোধ হয় প্রকৃতির রাজসিক আকার। এই পণ্ডিতগণ বলেন যে এই জীব জগতে জীবনের জন্য একটি যুদ্ধ অনবরত চলিতেছে এবং ইহা হইতেই জীবের ক্রমবিকাশ হইতেছে (Strugle for existence and Survival of the fittest)। জীবনের জন্য এই যুদ্ধ যেখানে প্রবর্ত্তিত হয় সেইখানে প্রকৃতির রজোগুণের লীলা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

প্রকৃতি কথাটির অর্থ এই—প্রকরোতি ইতি প্রকৃতিঃ। প্রকার যিনি করেন তাঁহারই নাম প্রকৃতি। এই 'প্রকার' কথাটিকে ইংরাজীতে বলিতে গেলে 'variation' বলা যায়। ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের দেহ প্রসঙ্গ করাই প্রকৃতির কাজ। আবার এই জগতে যত প্রকার জীবদেহ প্রকৃত হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে সকল গুলির মধ্যদিয়া এক গাছি জীবন সূত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। এই জীবন সূত্রই (Thread of life) সূত্রাত্মা মূলপ্রকৃতি। হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে এই সূত্র চক্রাকার অর্থাৎ জীবের প্রথম আকার (সৃষ্টির প্রারম্ভে) এবং শেষ আকার (প্রলয়ের অবস্থায়) এক প্রকার, কিন্তু এ সকল সত্য পাশ্চাত্য জীবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এখন ও বুঝিতে পারেন নাই।

দেহিনোস্মিন্ যথা দেহে কৌমার যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ ধীরস্তত্র নমুহ্যতি॥ গীতা

দেহীর (পুরুষের) দেহে কৌমার যৌবন ও জরাদশা যেমন নিশ্চয় সেইরূপ দেহীর দেহান্তরপ্রাপ্তিও নিশ্চয়; ধীর ব্যক্তি এই বুঝিয়া কখনও মোহগ্রস্ত হন না। সাংখ্য দর্শনের এই কথা যাঁহারা না মানেন তাঁহাদের সৃষ্টিসম্বন্ধীয় কাল্পনিক কথা সকল (Sherry) সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্বের সহিত

আদৌ মিলিতে পারে না। আমি পুরুষ, আমি অমর—আমি এখন যেমন আমার অস্তিত্ব অনুভব করিতেছি, সৃষ্টির প্রারম্ভেও সেইরূপ আমার অস্তিত্ব অনুভব করিয়াছি এবং পরেও করিব; আমি এখন আছি, পূর্ব্বেও ছিলাম, পরেও থাকিব; সুতরাং সাংখ্য দর্শনানুযায়ী সৃষ্টির কথা ভাবিতে গেলে সৃষ্টির প্রারম্ভে আমি কি অবস্থায় ছিলাম তাহাই ভাবিয়া থাকি, সেই সময় আমি বাহ্য জগতের সত্ত্বা কিরূপ অনুভব করিতাম তাহাই ভাবিয়া প্রকৃতিতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করি। কিন্তু পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ এ ধরণের ভাবনার দিক দিয়াও যান না সুতরাং তাঁহাদের কথা দিয়া সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝান অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। সাংখ্য দর্শনে প্রকৃতিকে জড় বলেন এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেও প্রকৃতিকে জড় বলে, ইহা হইতেই যাঁহারা বুঝেন যে সাংখ্য দর্শনের কথা আর পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কথা একই, তাঁহারা, আমার বোধ হয়, ভুল বুঝিয়াছেন। সাংখ্য দর্শনে প্রকৃতিকে জড় বলা হইয়াছে বটে কিন্তু চেতন পুরুষ সদাই যে সেই জড়ে অধিষ্ঠিত আছেন এ কথাটা যেন সকলেরই স্মরণ থাকে। আসল কথায় এই জগৎ জড় পদার্থ নহে এই জগৎ চৈতন্যময়; কিন্তু চেতন পুরুষ প্রকৃতির নানাবিধ পরিণামে বর্ত্তমান থাকিয়াও নিজে অপরিণামী, এই জন্য প্রকৃতির সহিত চেতন পুরুষের একটি ভেদ আছে। প্রকৃতি যে নানাবিধ রূপ ধারণ করে তাহা পুরুষের ভোগ ও অপবর্গের জন্য, তাহার নিজের তাহাতে কোন উপকার নাই; প্রকৃতির কার্য্য পরার্থ এই জন্যই প্রকৃতিকে জড়রূপ এবং চেতন পুরুষ হইতে ভিন্ন ভাবে দেখিতে সাংখ্য দর্শনে উপদেশ দেয়।

আমি আজি যে দেহ ধারণ করিয়া আমার অস্তিত্ব অনুভব করিতেছি, এই দেহ জীর্ণ হইয়া যখন নষ্ট হইয়া যাইবে তখন আমি অন্য এক দেহ ধারণ করিয়া আমার অস্তিত্ব অনুভব করিতে থাকিব, তখন আমার এই দেহ যে আমা হইতে ভিন্ন পদার্থ তাহা বুঝিতে হইবে; আবার সেই দেহ নষ্ট হইয়া যখন অন্য দেহ ধারণ করিব তখন সেই দেহ ও আমা ছাড়া তাহা বুঝিতে হইবে। সংসারচক্রে ঘুরিতে আরম্ভ করিয়া আমি এইরূপ এক দেহ হইতে দেহান্তরে, আবার সেই দেহ হইতে দেহান্তরে পরিভ্রমণ করিতেছি, এইরূপ পরিভ্রমণকে শাস্ত্রে যোনীভ্রমণ নাম দেওয়া আছে।

আমার যেখান হইতে উৎপত্তি, ঘুরিতে ঘুরিতে যখন সেই যোনী প্রাপ্ত হইব, তখন আমার সংসার চক্রে এক পাক ঘুরা হইবে। আমি প্রকৃতির পরিণাম-চক্রের মধ্যে পড়িয়া যে নানাবিধ আকারে অবস্থিতি করি সেই সমস্ত 'আকার' শ্রেণী যেন এক গাছি মালার ন্যায়; এক গাছি জীবনসূত্রে পরস্পর গাঁথা আছে; এই সূতা গাছটির রং কোথাও সাদা, কোথাও রাঙ্গা, কোথাও কাল; ইহারাই প্রকৃতির সত্ত্ব রজ ও তম গুণ। যে দেহ আশ্রয় করিলে আমি আমাকে সদাই সুখী জ্ঞান করি এবং জ্ঞানময় ভাব সকল অন্তরে প্রকাশ পাইয়া থাকে সেই দেহের জীবনের নামই সত্ত্বগুণ; রজ ও তম গুণের অর্থও ঐরূপ বুঝিতে হইবে। এই মনুষ্য দেহের মধ্যে আমি যখন মস্তিষ্কে অবস্থান করি (অর্থাৎ মস্তিষ্ক ভাগে মনঃসংযোগ করি) তখন আমার অন্তরে ভাব সকল প্রকাশ পাইতে থাকে এই জন্য মস্তিষ্কে সত্ত্বাধিক্য আছে বলা যায়। যখন মধ্যভাগে মনঃসংযোগ করা যায় তখন হৃদয়ের চাঞ্চল্য বশতঃ কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে এ জন্য দেহের মধ্যভাগে রাজসিক শক্তির আধিক্য আছে বলা যায়। যখন অধোভাগে চিত্ত ধারণা করা যায় তখন আলস্য নিদ্রা উপস্থিত হয় এই জন্য অধোভাগে তম শক্তির প্রাধান্য আছে বলা যায়। শাস্ত্রে সত্ত্বং ঊর্দ্ধবিশালা, রজঃ মধ্যবিশালা এবং তমো অধো-বিশালা এইরূপ যে সমস্ত কথা আছে সেই গুলির অর্থ পূর্ব্বকথিত কথা হইতে বুঝা যাইবে। ঐ কথা গুলির অন্য কোনরূপ অর্থ আছে বলিয়া বোধ হয় না।—[ক্রমশঃ]

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

তারা।

নীরব নিথর আঁধার সাগরে
রচিয়ে আনন্দ-মেলা,
কে তোরা রূপসী, জেগে সারা নিশি,
আকাশে করিস্ খেলা?

আকাশের কোলে কতই হাসিস্—
কতই গাহিস্ গান,
আঁধারের কোলে ফুটিয়ে উঠিস্—
আঁধারে জুড়াস্ প্রাণ।
চাঁদের জোছনা নয়নে লাগিলে
মুখানি করিয়ে নত,
মুদি আঁখি-পাতা সুনীল শয্যায়,
ঘুমায়ে পড়িস্ কত।
অনন্ত আকাশে নিশির কুসুম—
নিশির শিশিরে স্নান,
সারা নিশি জেগে আনন্দে করিস্
নিশির শিশির পান।
উজল প্রখর তপন - কিরণ
নয়নে সহেনি ব'লে,
দিবস আসিলে ঘুমায়ে পড়িস্
সুনীল নভের কোলে।
অনন্ত তোদের সুখের প্রদেশে
নড়ে না একটি শাখী,
সুখের স্বপন ভাঙ্গিতে তোদের
ডাকে না একটি পাখী।
অতি মৃদু বায় তরু-কোলে মৃদু
হেলেনা একটি লতা,
কানে কানে সেথা জনপ্রাণী এক
কহে না একটি কথা।
তোদের সুদূর সুনীল রাজ্যেতে
অবনীর, কলরব,
পশিবার তরে বাসনা মাত্রেতে
ম'রে ঝ'রে পড়ে সব।

এ হেন বিজনে শয়ন রচিস্
ঘুমাতে দিনের বেলা,
স্বপনের মাঝে প্রাণে জাগে তবু
আঁধারের সনে খেলা।
সন্ধ্যার আরতি পবন বহিলে,
প্রদোষে বাজিলে বীণা,
আঁখিটি খুলিয়ে চাহিয়ে দেখিস্
তপন ডুবেছে কি না।
একে একে শেষে মেলি' কোটি আঁখি—
আঁধারে পাইয়ে বল,
ছুটোছুটি ক'রে আসিয়ে সাজাস্
সুনীল গগন - তল।
অনন্ত প্রাণের অনন্ত উচ্ছাসে
আঁধারে পূরিয়ে তান,
সাগরের কূলে শয়ন রচিয়ে
অনন্তে গাহিস্ গান।
অনন্ত সঙ্গীত সুধার ক্ষরণে
অধর নাহিক নড়ে,
অনিমিখ ওই ভাবের আঁখিতে
পলক নাহিক পড়ে।
নীরবতা সেথা কান পেতে যেন
শুনে সে সঙ্গীত ব'সে,
স্তুতিবাদ - ছলে নীরবতা তা'র
মুখ হ'তে পড়ে খ'সে।
তবু সে সঙ্গীত অনন্ত অসীম
দিগন্তের কোলে ফুটে,
ভেদিয়া অনন্ত আঁধারের স্তর
অসীম অনন্তে ছুটে।

সংসারের জ্বালা অসীমে বিলা'তে
আকাশের পানে চাই,
আঁধারে তোদের সে সঙ্গীত শুনি'
কি-যেন-কি হ'য়ে যাই
আঁধারের কারা ভেদিয়ে যে আমি
এসেছি আঁধার হ'তে,
সারা দিন রাত গেয়ে গেয়ে ভেসে
চ'লেছি আঁধার স্রোতে।
কত নদ নদী— দেশ দেশান্তর—
অচল সমুদ্র - পারে,
পৃথিবী ছাড়িয়ে সুদূর অসীমে
পৃথিবীর কোন্ ধারে—
জানিনে ত কিছু সে আবার কোন্
অজানা আঁধার দেশে,
ভাসিয়ে ভাসিয়ে গাহিয়ে গাহিয়ে
গিয়ে যে ঠেকিব শেষে।
জীবনের পথে খুঁজি আমি তাই
একটি সঙ্গীত-সাথী—
অনন্ত আঁধারে পথ দেখাইতে
একটু আলোক-ভাতি।
তোরা সে আমার আলোকের মালা—
আঁধারের ধ্যানে রত,
নিরখি তোদের প্রাণে আমি তাই
পাই সে আনন্দ কত।
আয় রে আমার সঙ্গীতের সাথী,
আমারে নে হোথা তুলে,
সংসারের মায়া— অসার বাসনা—
সব যাই আমি ভুলে।

ও অনন্ত ধ্যান— অনন্ত সমাধি—
ঢেলে দে আমার প্রাণে,
নীল নভ-কোলে বিভোর হইয়ে
পরাণ মাতা'ব গানে!

শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

পত্র।

ভাই, এ মূল্যহীন দুর্ব্বল দুদিনের নবীন জীবনে গোধূলি আসিয়াছে! জীবনের চারিদিকই ক্রমে ঘোর অন্ধকার হইয়া আসিতেছে! জীবন-পথে আজ আর একটিও আলো নাই—কেহ নাই! সব নীরব! ভক্তি—প্রেম —দয়া—স্নেহ—বন্ধুতা—তাহারা আজ কোথায়? হায়, আজ তাহারা— যাহারা এক সময়ে আমার জীবন ছিল—আমার এই স্ফুটিতোন্মুখ জীবন-দৃশ্যের নেপথ্যে দাঁড়াইয়া অট্টহাসি হাসিতেছে। তাহারা বলিয়া গেল জীবন—প্রহসন! তাহারা কি তবে এ প্রহসনের কেহ নয়? কেবল দর্শক মাত্র?—তবে জীবন কি একটা খেলা? শিশুর হাসি কান্না?—ফাঁকি? ভাই, সমস্ত ফাঁকি? এত সব কেবল দুটি দিনের? হায় হায়! নিমন্ত্রণ রক্ষামাত্র? অনন্ত পথ-যাত্রায় দুদণ্ডের বিশ্রাম? সেই—চির জিজ্ঞাসা— তাঁহার—কোথায় তিনি?—অর্থ শূন্য আজ্ঞাপালন? ফুলের ফোটা ছাড়া আর কিছুই নহে? দেখ মানুষ মরিবেই। আমিও মরিব। কিন্তু জীবনের অস্তিত্ব কি কিছুই থাকিবে না? পূর্ব্ব জন্মের আত্মত্যাগের—কাহার জন্য?— ফল স্বরূপ এ সাধের মনুষ্য-জন্মের চির আত্মবিস্মৃত আগমনময় এই জীবন-ভালবাসার কি কোন অস্তিত্ব নাই? আমার এ ক্ষুদ্র জীবনের আলো পাইয়া—আভ্যন্তরীণ জীবন-একতা-সূত্রের অদৃশ্য নিয়মে—যে ফুল ফুটিয়াছে সেই ফুলের প্রাণের মধ্যে কি আমার জীবনের বিলুপ্ত অস্তিত্ব বীজের কার্য্য চলিতেছে না? আমার জীবন-বৃক্ষের-মৃত্যু-বারি পাইয়া, যে একটি বিভিন্ন বৃক্ষের জন্ম হইল, তাহার সেই সদ্য ফুলের গন্ধ কি আমি হইব না? তাহার সেই নবীন তরুণ স্বপ্নময় মধুর ছায়ার উপর বসিয়া কি কেহ আমার এই

আধ ফোটা জীবনের কেমন এক বিষাদময় বাতাস পাইবে না? তাহার জীবন-গৃহে ঢুকিয়া কেহ কি আমার ছবি দেখিতে পাইবে না? তাহাকে দেখিয়া কি, আমার পুরাতন কাহিনী—জীবননাটক—কাহার হৃদয়ের উপর দিয়া এক মুহূর্ত্তের মধ্যে ভাসিয়া যাইবে না? সে মানুষ—শূন্যে সময়ে সময়ে কোথাকার কোন্ অদৃশ্য পথ দিয়া আমার বাঁশীরব আসিয়া বাজিয়া যাইবে না? তাহাকে আকুল করিবে না? সুখ দুঃখের সমষ্টির সেই যে মাটির দেহ-পিঞ্জর, তাহার অন্তঃপুরে কি—আমাকে খুঁজিবার জন্য—হাহাকার রবকারী কি এক অভাব-পাখী চিরদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া বেড়াইবে না? বল না ভাই, তুমি কি জান আজ আমাকে এ কথা কে বুঝাইবে? কে বুঝাইলে আমার বিশ্বাস হইবে? কোথায় বসিলে—এ জগতের কোথায় বসিলে—এ কথার সঠিক উত্তর শুনিতে পাইব? এ জগতে ইহার উত্তর কি নাই? মনুষ্যে ইহার উত্তর কি জানে না?

দেখ, যখন প্রথম জগৎ-মহামেলার ভিতর প্রবেশ করিলাম, তখন কত আনন্দ। সুখ আর ধরে না! দেখিলাম, আমার আশার সুবর্ণ বৃক্ষের চারিদিকে সুখের হীরক-ফুল স্তবকে স্তবকে প্রস্ফুটিত! তোমার জগতের আকাশে এক চাঁদ—সেই এক চাঁদে জগৎ পূর্ণ আলোকিত! আর আমার—আকাশে শত শত চাঁদ। আমার আশে পাশে চাঁদ, মাথায় চাঁদ, চাঁদে আমি বেষ্টিত। আমার হৃদয়ের ভিতর চাঁদের অভিনয়! তখন আমি ও চাঁদ! আ মরি মরি—সে কি পুষ্পময়—চাঁদময়—নির্ম্মল বিভোর সুখ! তখন আমার সে জীবন—সে নিদ্রা—সে স্বপ্ন সকলেই চাঁদময়। সেই স্বপ্ন-মাখা ঘুম-ঘোরময় গীতি-পূর্ণ শত চাঁদময় জীবন ইহ জন্মে কি কখন ভুলিতে পারিব? সে কি ভোলা যায়? কোথাকার কেমন এক প্রাণ উদাসী স্মৃতি জাগান বাঁশী সদাই কানে বাজিত! শুনিতাম, যেন আমার আপনার কে কোন্ স্বর্গের দুয়ার খুলিয়া মধুর অধরের মধুর হাসির খেলাতে আমাকে ডাকিতেছে। যেন কি এক রাগিণীময় স্বর্গীয় কাব্যের জন্মান্তরীণ অস্পষ্ট স্মৃতি-সমীরণ আনিত। যেন আমার জীবন-বসন্তের সাধের মালঞ্চের সৌরভময় সৈকত দিয়া কি একটি স্বপ্ন-প্রবাহিনী, অতি ধীরে ধীরে দূরাগত সঙ্গীতের মত বহিয়া যাইত! আর এক সমীরণ—সে সমীরণের কথা আর কি বলিব—

বোধ হইত যেন মন্দাকিনীর সেই পরিমল বাহী কল্পনাময় কাব্য-তীর হইতে ষোড়শী রূপসী সুর-বালারা কি এক স্বর্গীয় গান গাহিতে গাহিতে আমাকে বাতাস করিতেছে।

ভাই, আমার সেই নবনীত—জ্যোৎস্নাময—স্বপ্নময় অতি সুখের বাল্য কালের কাহিনী তোমার মনে পড়ে কি? মনে পড়ে কি, দুজনের গলাগলি করিয়া আমাদের সেই—জীবনের শেষ ভাগের ন্যায়—মৃদুগামিনী শীর্ণা-স্বরস্বতী-তীরে ভ্রমণ? মনে পড়ে কি, সেই অনন্যমনা হইয়া বিলুপ্তপ্রায় স্বপ্নসম অতীত-কথা সব আলোচনা করিতে করিতে সমস্ত রাত্রি—এমন কত—অতিবাহন? সেই এক দিন—সেই চারিদিক ঘোর ঘন অন্ধকার করিয়া মেঘ আসিয়া ভীষণ বজ্রনাদে পৃথিবী কম্পিত করিয়া তুলিতেছে—যেন জগতে মহা প্রলয় উপস্থিত—তখন আমরা দুটি এক অতি বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে—মাঠ জন-প্রাণী-শূন্য—সেই সময়ে প্রকৃতির কি দৌরাত্ম্য! প্রকৃতির যত শক্তি তখন আমাদের উপর। যেন আমরা তাহার প্রতিবাদী। প্রকৃতি তাহার ঝড়-মেঘ বিদ্যুৎ-বৃষ্টি বজ্রাঘাত লইয়া আমাদের রসাতলে দিবার পরামর্শ করিল।—তখন সেই প্রকৃতির অপূর্ব্ব নৈসর্গিক সন্দর্শনের সময় আমাদের—মনে আছে কি তোমার?—কি আনন্দ? প্রকৃতির সহিত কি মেশামিশি? মাথার উপর অনন্ত বারি-ধারা—কিন্তু আমাদের কি মাতামাতি কি উচ্চ হাস্য-লহরী? যেন মার কোল পাইয়া শিশু মাতিয়া উঠিল! আর প্রকৃতির শক্তির কাছে আমরা কত—কত ক্ষুদ্র! কার্য্য জগদ্ব্যাপী! মহতের কোন্ কার্য্য কবে ঢাকা পড়িয়াছে? প্রাকৃতিক নিয়মে যে কার্য্য-ফুল ফুটে তাহার গন্ধে জগৎ আমোদিত হইবেই! তাহা, তোমার নহে, সমস্ত জগতের। তুমি তাহার কর্ম্মীমাত্র।—চাবি। মহৎ ব্যক্তি, প্রকৃতির কার্য্যের সাকার মূর্ত্তি। আর সেই বসন্ত লতা? তার কথা কিছু মনে পড়ে কি? কে সে? সৌন্দর্য্য। জগৎ তন্ত্রী মধ্যে সৌন্দর্য্যের লয়—কোকিলের স্বর—সমুদ্রের অনন্ত বিস্তার—সুনীল অনন্ত আকাশ—কাব্যের কল্পনা। সেই—সেই বসন্তের বসন্তলতা যখন ফুলের গন্ধের মতন—নিশীথ জ্যোৎস্নায় বেহাগ সুরের ন্যায়, আমার অকূল হৃদয়-সাগরে ভাসিয়া বেড়াইত, তখন আমি তাহাকে গ্রামের কুলবধূদিগের চোকের ভিতর দিয়া দেখিতে পাইতাম।

দেখিতে-দেখিতে দেখিতাম। দেখিয়া—তাহাকে দেখিয়া কখন আমার দেখা ফুরাইতে পারি নাই। অনন্তকাল ধরিয়া দেখিয়াও তাহাকে ফুরাইতে পারিব কি? একদিন যখন সে বৃষ্টিতে ভিজিতে—ভিজিতে—ভিজিতে—ভিজিতে আমার সেই ক্ষুদ্র গৃহের জানালার সম্মুখ দিয়া—পঞ্চতালে—লজ্জায় অস্ফুট গোলাপের মত চলিয়া যাইতেছিল, তখন মনে হইল যেন একটি সৌন্দর্য্যের পুঁতুল ভিজিয়া গলিয়া—উছলিয়া—জল হইয়া পড়িতে—পড়িতে যা—ই—তে—ছে! বুঝি যেন সব সৌন্দর্য্য একেবারে ধুইয়া গেল!! প্রকৃতি যেন এত সৌন্দর্য্য চোকের উপর আর দেখিতে পারিল না।

আর তাহার সেই গৃহ, যে গৃহে বসন্ত শয্যা যাইত, সে গৃহ যেন আমার একটি স্বপ্ন—মায়াজাত ভ্রান্তি। জাগিয়া কখন আমার সেই এ জগতের অমরাবতী—সেই কি-জানি কি—শয়ন-মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারি নাই। অকস্মাৎ একদিন—কবে কে জানে—দেখিলাম অপ্সরা-রূপিণী বসন্তলতা, শ্বেত শয্যার উপর অনন্ত কেশরাশি ছড়াইয়া—ঘন কেশের কাল চাদর পাতিয়া—তাহার চারিদিকে হাসির একরাশি জ্যোৎস্না ফুটাইয়া নিদ্রিত। সব এলোথেলো। মরি কি শোভা! সে অতুল শোভার তুলনা কি দিব। দেখিলাম, যেন অন্ধকার নিশীথের ভীম মেঘের কোলে একখানি বিদ্যুৎ। যেন কৃষ্ণবর্ণ রমণীর মুখে সুখের বিভোর হাসি-জ্যোৎস্না। যেন অন্ধকার গৃহের হৃদয়ে দূরাগত আলোর কিরণ-সম্পাত। আবার শোভার উপর শোভা!—সেই অনাবৃত চিরবসন্তময় গানময় স্বপ্নময় হৃদয়-মুকুলের উপর দুইখানি সুগোল জ্যোৎস্নাময় হাত, পরস্পরকে জড়াইয়া—এক হইয়া নিদ্রামগ্ন। বিদ্যুতের উপর যেন পারিজাতের মালা—প্রকৃতির উপর কবি-কল্পনা—সৃষ্টি-কৌশল—জীবন সরোবরে—কবিতাপদ্ম—নিশীথ জ্যোৎস্নাকাশে অনন্ত জীবনের অদৃষ্ট আভাস অসীম-সসীমের চেনাচিনি—সাধাসাধি।

এইরূপে তখন জীবনের চারিদিকে নিশি দিন কত ফুল ফুটিত—কত সোহাগের হাসি ছড়াছড়ি যাইত—কত কোলাহল জমা হইত। Shelley—Keats—Swinburne—Tennyson—Ruskin—Goethe—বঙ্কিম প্রভৃতি সেই কবিগণ,—আমার চোখের সম্মুখে তাহাদের অপূর্ব্ব সৃষ্টির কল্পনাময় নীরব মধুর আদর্শ মানস-পুত্তলি ধরিয়া এবং আলো-অন্ধকার—সুখ দুঃখ—

ভয়-ভালবাসা—জন্ম-মৃত্যুর কেমন সেই স্বপ্নমাখা—কাহার কমনীয় মুখ খানির মতন—এক কি গান আঁকিয়া দিয়া নৃত্য করিত। তখন কত কি ভাল বাসিতাম। তখন নিদ্রিতা বালিকার অস্ফুট হাসিমাখা মুখের সৌন্দর্য্য বড় ভাল বাসিতাম। কখন জ্যোৎস্নালোকে একাকী ছাদের উপর বসিয়া আমার পুরাণ স্মৃতি-পুস্তক খানি খুলিয়া—নিশার প্রথম সময়কার মত হৃদয় লইয়া—নীরবে কত কালের নূতন-পুরাতন কাহিনী গুলি পড়িতাম। তখন নিশীথ-অন্ধকারে নদী-সৈকতে দাঁড়াইয়া কল্লোলিনীর মৃদু তরঙ্গ-লীলার মধ্যে কেমন গান শুনিতাম। সে গানে আরও কিছু শুনিতাম। শুনিতাম যেন সে গান কাহার হৃদয়ের প্রতিধ্বনি! তখন কাননে লতা-বধূদের ঘোমটা খুলিয়া দিয়া লুকাইতাম—কত রহস্য করিতাম—কত লুকাচুরী খেলিতাম। সেই খেলাতেই আমার দিন কাটিয়া যাইত। তখন ঐ ক্ষুদ্রাক্ষুদ্র এক একটি অপূর্ব্ব নক্ষত্রের উজ্জ্বল চোখের উপর চাহিয়া—চাহিয়া কত নিশি জাগিয়া থাকিতাম। তখন কুসুমের হাসির দর্পণের মধ্যে স্বর্গের ছায়া দেখিতে পাইতাম। তখন আকাশের চাঁদকে জগতের সমস্ত রমণীর—নিদ্রিতা রমণীর স্বপ্নজাত হাসির স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের সমবায় বলিয়া জানিতাম। যেন ঘুমন্ত শশীমুখীদের হাসির সৌন্দর্য্য অণুগুলি একত্রিত হইয়া হইয়া চাঁদ আকারে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তখন আমি স্বয়ং একটি বাঁশী ছিলাম। সদাই বাজিতাম। কে যেন আমাকে—আমার হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অমানুষী কি এক কবিত্বময় ফুঁ দিয়া বাজাইত। তখন ইচ্ছা করিয়া—তাহার প্রতিকূলে দাঁড়াইয়াও—তাহা থামাইতে পারিতাম না।

তাহার পর, কি?—একদিন আচম্বিতে কোথাকার কোন্ এক ঘটনা-ফলের অদৃষ্ট আকাশ হইতে কি এক ঝড় আসিয়া এ জীবন-কাননের কত সাধের বৃক্ষের বিচিত্র আশা কুসুমগুলি ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া, বৃক্ষগুলি ভাঙ্গিয়া—উন্মূলিত করিয়া—চারিদিক একাকার—সমভূমি—শূন্য করিয়া দিয়া,—কালের অক্ষয় পৃষ্ঠে তাহার একটা চিহ্ন রাখিয়া—চলিয়া গেল। সেই অবধি আমার, এই নবীন জীবনে, যাতনার ঘরে বাস! এ স্রোত ফিরাইবার নহে। অদৃষ্টের অদম্য স্রোত কে কবে ফিরাইতে পারিয়াছে? জীবন-ক্ষেত্রে কার্য্য-বৃক্ষের ফল দু'টি। একটি সু, অপরটি কু। দু'টি বিপরীত

শক্তিজাত। এক শক্তির ফল নহে। যাহার যেমন কার্য্য, তাহার ফলও সেইরূপ। আমি করিব কুকার্য্য, কিন্তু তাহার ফল সু কি করিয়া আশা করিব? কার্য্যের ফল অবশ্যম্ভাবী। তা' তুমি যেরূপ কার্য্যই কর না কেন। আমিও আমার যে সাধের খেলা-ঘর একবার ভাঙ্গিয়া স্নেহের—প্রেমের পুত্তলিগুলি বিসর্জ্জন দিয়াছি, তাহা আর আজ কোথায় পাইব? আর কি তাহা গড়া যায়? আমার গড়িবার প্রাণ-বিসর্জ্জী ইচ্ছা থাকিলেও সে ভাঙ্গা জোড়া লাগে কৈ? তাহারা আসে কৈ? কৈ, তাহার নয়ন-জ্যোৎস্না ত আর আমার এ গৃহে আসে না? তাহার হাসির ফুল-হার আর ত আমার নয়ন-নদীতে ভাসে না? আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়-দ্বীপের চারিদিকে ত আর তাহার হৃদয়-তরঙ্গ-লীলা দেখিতে পাই না? যে অসংখ্য সোহাগ-ফুল আমার গৃহের আশে পাশে প্রতিদিন ফুটিত, এখন কেন আর ফোটে না? এত চেষ্টা করি, তবু বাঁশী বাজে না কেন? জগতের পথে সকলেই চলিয়াছে, আমি শুধু কেন দাঁড়াইয়া? কি হইল ভাই? এত যত্ন, এত সাধ, এত চিন্তা, এত ভালবাসা কি সব মিথ্যা? স্রোত কি ফিরে না? যাহা একবার অন্ধকারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহা কি আর এ জীবনে—এ জীবনের সমস্ত আলো দিয়া সারিতে পারিব না? এ জগতের ত চারিদিকে গড়িতেছে—ভাঙ্গিতেছে, আবার ভাঙ্গিতেছে—গড়িতেছে। ফুল ঝরিয়া পড়িতেছে আবার ফুটিতেছে। সূর্য্য অস্ত যাইতেছে আবার উদিত হইতেছে। বসন্ত যাইতেছে আবার আসিতেছে। একটার পর আর একটা। এইরূপে জগতের সকল জিনিসই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কিন্তু আমার এ মুহূর্ত্তের জীবন এক সূত্রবাহী কেন? যে নিয়মে ফুল ফুটিতেছে, পাখী ডাকিতেছে, চাঁদ ডুবিতেছে, সূর্য্য দেখা দিতেছে, নদী বহিয়া চলিয়াছে, সে নিয়মে কি আমি ফুটি নাই? আমি কি জগৎ-নিয়মের বাহিরে? আমার চারিদিক নীরব—শূন্য কেন? আমার জীবন-ফুল শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িতেছে কেন? এ জগতে সৎ পদার্থের ধ্বংস নাই। সৎ পদার্থ, চির-বর্দ্ধনশীল। জগতের ফুল আজিও ফুটিতেছে। জগতের যাহা অঙ্গ, তাহার তিরোধান হয় কি করিয়া? সে যে জগৎ—জগৎ জীবনের অংশ। কিন্তু আমার জগৎ তবে মরিয়া যাইতেছে কেন? হায় রে! মনুষ্য-জগতে যাহা একবার ভাঙ্গিয়া

যায় আর কি তাহার পুনর্ম্মিলন হয় না! মনুষ্য এত ক্ষুদ্র! এত দুর্ব্বল! এত মনুষ্য!! জগৎ, তাহার কল্যকার কথা ভুলিয়া আজ অনন্তের পথে অগ্রসর, আর মানুষ সে কথা না ভুলিয়া তাহার সঙ্কীর্ণতার মধ্যে চির-আবদ্ধ! মানুষ, মানুষের কারাগার! সময় বিশেষে মৃত্যুও আবার! এই মনুষ্যের এত গৌরব?

এক ত জীবনই কতকগুলি অভাবের সমষ্টি। তার উপর আবার ইহা মনুষ্য-কারাগারে আবদ্ধ। এই মনুষ্য-কারাগারে দাস-জীবন লইয়া আর ক'দিন বাঁচিব বল? অভাবের উপর অভাব। জীবন-অভাবই সব পূর্ণ হয় না। আবার কি না মানুষ-অভাবে ঘিরেছে! এত ভার, এ ক্ষুদ্র জীবনে সহিবে কেন বল? ইহা পীড়ন—অত্যাচার—মৃত্যু! হায়! এ দেবতা-দুর্ল্লভ—মল্লিকার সৌরভের মত—কবিত্বের আলয়—সৌন্দর্য্যের আধার স্বরূপ এমন স্বাভাবিক মানবজীবনে প্রীতির চিরস্বাস্থ্যময় কিরণ, কয় দিনের জন্য পাইলাম? জীবনের আকাশে স্নেহের পূর্ণ চাঁদ কয় দিন উঠিয়াছে? আর সুখ? তার কথা আর কেন?—কই—কবে—মনে একটা তার ছায়া আছে মাত্র! কেবলি যুদ্ধ—যুদ্ধ—যুদ্ধ! এ জীবনটাই যুদ্ধময়! এ যুদ্ধের অবসান কোথায় জানি না! জানি বই কি—ঐ শুন কিসের হরিধ্বনি—আমার অবসানের গান, অবসানের অদৃশ্য গৃহ-পথ দিয়া আসিয়া আমার মুখের প্রতি প্রেমের অস্পষ্ট ঘোর ঘোর নয়নে চাহিয়া অনন্ত হরিধ্বনি দিতেছে! সে আমার অনন্ত শয়নের শয্যা প্রস্তুত করিতেছে! এই দেখিতে—দেখিতে—দেখিতে একদিন দেখিবে—তাহার উপর আমি শুইয়া! এখন প্রতিদিন শুনিতে পাই, কে যেন আমাকে কোথা হইতে কি এক শব্দাতীত অনুভূতিময় স্বরে ডাকিতেছে! যেন আমার জন্য কিসের একটা সৃষ্টি অপেক্ষা করিতেছে! যেন আমি কোথায়—আমার চক্ষু-কর্ণ-স্পর্শ-শক্তির ধারণার অতীত এক অনন্ত তীরে বসিয়া—আর সেই অনন্তের তীর হইতে কি এক মৃত্যু—বাতাস আসিয়া আমার জীবন-গ্রন্থিগুলি একটি একটি করিয়া খুলিয়া দিতেছে! অনন্তের আহ্বান লঙ্ঘন করিতে কে পারে? যাইতে হইবে—অতি শীঘ্রই। অনন্তের ডাক অবহেলা করিয়া থাকিতে পারি কৈ? সে ডাক ফিরাইবার শক্তি, মনুষ্যের নাই। যাইবার পূর্ব্বে

তোমার কাছে আমার চির-বিদায় লইলাম। তোমার কাছে আমার বিদায় লইতে চক্ষে জল আসে! সে কথা ভাবিতে পারি না! এ জীবনের আমার তুমিই একমাত্র আনন্দ—এ জীবন-অমাবস্যার পূর্ণচাঁদ। তোমার অনুরাগ-বারি পাইয়াই এ জীবন-কুঁড়ি, আজ বৃক্ষে পরিণত। তুমি যদি না থাকিতে তাহা হইলে আজ, নিম্ন-স্বাক্ষরসহিত এই পত্র—লেখা, কেহই জগতে দেখিতে পাইত না! আর এ নাম কালের অনন্ত ক্রোড়ে যে কবে লয় পাইত তাহা কে বলিতে পারে!!!—হায়! তবু ছাড়িয়া যাইতে হইবে!—কোথায় যাইব!—কার কাছে!—" Who am I; what is this Me? A Voice, a Motion, an appearence?"

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণ সুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাংস্তাংস্তিতিক্ষস্য ভারত॥ ১৪॥

অনুবাদ।

হে কৌন্তেয়! ইন্দ্রিয়গণ এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে তৎসংযোগ,* ইহাই শীতোষ্ণাদি সুখদুঃখজনক। সে সকলের উৎপত্তি ও অপায় আছে, অতএব তাহা অনিত্য, অতএব হে ভারত! সে সকল সহ্য কর। ১৪॥

টীকা।

একাদশ শ্লোকে বলা হইল, যে যাহার জন্য শোক করা উচিত নহে, তাহার জন্য তুমি শোক করিতেছ। দ্বাদশ শ্লোকে এরূপ অনুযোগ করিবার কারণ নির্দ্দেশ করা হইল। সে কারণ এই যে কেহই ত মরিবে না, কেননা আত্মা অবিনাশী। তুমি কাটিয়া পাড়িলেও সে থাকিবে, কেন না তাহার আত্মা থাকিবে। একাদশ শ্লোক পাঠে জানা যায় যে যখন গীতা প্রণীত হয়, তখন জন্মান্তর জনসমাজে গৃহীত। একাদশ শ্লোকে অর্জ্জুনের আপত্তি

---

* মাত্রাশ্চ স্পর্শাশ্চ ইতি শঙ্করঃ।

আশঙ্কা করিয়া, ভগবান্ তাহারই খণ্ডন করিতেছেন। অর্জ্জুন বলিতে পারেন, আত্মা না হয় রহিল, কিন্তু যখন দেহ গেল, তখন আমার আত্মীয় ব্যক্তি যাহার জন্য শোক করিতেছি, সে আর রহিল কৈ? দেহান্তর প্রাপ্ত হইলে সে ত ভিন্ন ব্যক্তি হইল। এই আপত্তির আশঙ্কা করিয়া ভগবান্ ত্রয়োদশ শ্লোকে বলিতেছেন, যে এ রূপ ভেদ কল্পনা করা অনুচিত, কেন না যেমন কৌমার যৌবন জরা একব্যক্তিরই অবস্থান্তর মাত্র, তেমনি দেহান্তর প্রাপ্তি ও অবস্থান্তর মাত্র। ইহাতে ও অর্জ্জুন আপত্তি করিতে পারেন যে না হয় স্বীকার করা গেল যে দেহান্তরে ও দেহীর একতা থাকে—কিন্তু মৃত্যুর একটা দুঃখ কষ্ট ত আছেই? এই স্বজনগণ সেই কষ্ট পাইবে—তাহা স্মরণ করিয়া শোক করিব না কেন? তাহাদের বিরহে কাতর হইব না কেন?

তাহার উত্তরে ভগবান্ এই চতুর্দ্দশ শ্লোকে বলিতেছেন, যে যে সকলকে তুমি এই দুঃখ বলিতেছ, তাহা ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ জনিত। যতক্ষণ সেই সংযোগ থাকে ততক্ষণ সেই দুঃখ থাকে, সংযোগের অভাবে আর সে দুঃখ থাকে না। যেমন যতক্ষণ ত্বগের সঙ্গে রৌদ্রাদি উত্তাপের বা হিমের শৈত্যের সংযোগ হয়, ততক্ষণ উষ্ণ বা শীত স্বরূপ যে দুঃখ তাহা অনুভূত করি, রৌদ্রাদির অভাব হইলে আর তাহা থাকে না। যাহা থাকিবে না, অনিত্য, তাহা সহ্য করাই উচিত। যে দুঃখ সহ্য করিলেই ফুরাইবে, তাহার জন্য কষ্ট বিবেচনা করিব কেন?

এই সহিষ্ণুতা বা ধৈর্য্য গুণ থাকিলেই জীবন মধুর হয়। অভ্যাস করিলে অভ্যাস গুণে আর কোন দুঃখকেই দুঃখবোধ হয় না। তার পর এই গীতোক্ত সর্ব্বানন্দময়ী ভক্তি মনুষ্যের জীবন অপরিসীম সুখে আপ্লুত হয়। দুঃখ মাত্র থাকে না। জীবনকে সুখময় করিবার জন্য, গোড়াতে এই দুঃখ সহিষ্ণুতা আছে—তাহা ব্যতীত কিছু হইবে না। ইন্দ্রিয়গণের সহিত বহির্ব্বিষয়ের সংযোগজনিত যে সুখ—ভোগবিলাসাদি, তাহাও দুঃখের মধ্যে গণ্য করিতে হইবে, কেননা তাহার প্রতি অনুরাগ জন্মিলে, তাহার অভাব ও দুঃখ বলিয়া বোধ হয়। এই জন্য "শীতোষ্ণ সুখদুঃখ" একত্রে গণনা করা হইয়াছে।*

---

* এখানে মূলে যে মাত্রা শব্দ ও মাত্রাস্পর্শ পদ আছে; তাহার দুই প্রকার অর্থ করা যায়। উহার দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে বুঝাইতে পারে, এবং ইন্দ্রিয়-

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ।

হে পুরুষর্ষভ! সুখদুঃখে সমভাব যে ধীর পুরুষ এ সকলে ব্যথিত হন না, তিনিই মোক্ষ লাভে সমর্থ হন।

টীকা।

সুখ দুঃখ সহ্য করিতে পারিলে মোক্ষলাভের উপযোগী হয় কেন? দুঃখ হইতে মুক্তিই মুক্তি বা মোক্ষ। সংসার দুঃখময়। যাঁহারা বলেন সংসারে দুঃখের অপেক্ষা সুখ বেশী, তাঁহাদেরও স্বীকার করিতে হইবে, সংসারে দুঃখ আছে। এ জন্য জন্মান্তরও দুঃখ, কেননা পুনর্ব্বার সংসারে আসিয়া আবার দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। অতএব পুনর্জন্ম হইতে মুক্তি লাভ ও মুক্তি বা মোক্ষ। স্থূলতঃ দুঃখভোগ হইতে মুক্তিলাভই মোক্ষ। এই জন্য সাংখ্যকার প্রথম

গণের বিষয়কেও বুঝাইতে পারে। শঙ্করাচার্য্য বলেন, "মাত্রা আভির্ম্মীয়ন্তে শব্দাদয় ইতি শ্রোত্রাদিনীন্দ্রিয়াণি, মাত্রাণাং স্পর্শাঃ শব্দাদিভিঃ সংযোগাঃ।" শ্রীধরস্বামীও ঐরূপ বলেন যথা "মীয়ন্তে জ্ঞায়ন্তে বিষয়া আভিরিতি মাত্রা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়স্তাসাং স্পর্শবিষয়ৈঃসহ সম্বন্ধাঃ (মাত্রাস্পর্শাঃ)। মধুসূদন সরস্বতী ও ঠিক তাই বলেন। পক্ষান্তরে, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন, "মাত্রা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিষয়াঃ।" তাতে ও বড় আসিয়া যাইত না, কিন্তু একজন ইংরেজ অনুবাদক* স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে এই মাত্রা শব্দ লাটিন ভাষায় Materia ও ইংরাজিতে matter, সুতরাং তিনি "মাত্রাস্পর্শাঃ" পদের অনুবাদে "matter—contacts" লিখিয়াছেন। পরিমান জ্ঞানের জন্য ইন্দ্রিয় বিষয়ের ও যে আবশ্যকতা তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সাংখ্যদর্শনের "তন্মাত্র" শব্দের তাৎপর্য্য বিচার করা কর্ত্তব্য। বলা বাহুল্য যে আমি বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও ডেবিস সাহেবকে পরিত্যাগ করিয়া শঙ্করাচার্য্য ও শ্রীধরস্বামীর অনুসরণ করিয়াছি।

* Davis

সূত্রেই বলিয়াছেন "ত্রিবিধদুঃখস্যাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ।" এখন, দুঃখ সহ্য করিতে শিখিলেই দুঃখ হইতে মুক্তি হইল। কেননা, যে দুঃখ সহ্য করিতে শিখিয়াছে সে দুঃখকে আর দুঃখ মনে করে না। তাহার আর দুঃখ নাই বলিয়া তাহার মোক্ষলাভ হইয়াছে। অতএব মোক্ষের জন্য মরিবার প্রয়োজন নাই। দুঃখ সহ্য করিতে পারিলে, অর্থাৎ দুঃখে দুঃখিত না হইলে, ইহ জীবনেই মোক্ষলাভ হইল।

নাসতোবিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ। ১৬।

অনুবাদ

অসৎ বস্তুর অস্তিত্ব নাই, সদ্বস্তুর অভাব হয় না। তত্ত্বদর্শিগণ এইরূপ উভয়ের অন্তদর্শন করিয়াছেন।

টীকা।

অস ধাতু হইতে সৎ শব্দ হইয়াছে। যাহা থাকিবে তাহাই সৎ; যাহা নাই বা থাকিবে না তাহাই অসৎ। আত্মাই সৎ; শীতোষ্ণাদি সুখ দুঃখ অসৎ। নিত্য আত্মায় এই অনিত্য শীতোষ্ণাদি সুখ দুঃখাদি স্থায়ী হইতে পারে না। কেননা সৎ যে আত্মা, অসৎ শীতোষ্ণাদি তাহার ধর্ম্মবিরোধী। শ্রীধর স্বামী এইরূপ বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন, "অসতোঽনাত্মধর্ম্মত্বাৎ অবিদ্যমানস্য শীতোষ্ণাদেরাত্মনি ন ভাবঃ।" আমরা তাঁহারই অনুসরণ করিয়াছি।

শঙ্করাচার্য্য এই শ্লোক অবলম্বন করিয়া সদসদ্বুদ্ধি যে প্রকার বুঝাইয়াছেন, তাহাও পাঠকদিগের বিশেষ অভিনিবেশ পূর্ব্বক আলোচনা কর্ত্তব্য। তাহা হইতে আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা এই সকল বিষয় কোন দিগ হইতে দেখিতেন, এবং আমরা এখন কোন দিগ হইতে দেখি, তাহার প্রভেদ বুঝিতে পারিবেন। এই শ্লোকের শঙ্কর প্রণীত ভাষ্য অতিশয় দুরূহ। নিম্নে তাহার একটি অনুবাদ দেওয়া গেল।

কারণ হইতে উৎপন্ন অতএব অসৎস্বরূপ শীত উষ্ণ প্রভৃতি কার্য্যের অস্তিত্ব নাই। শীত উষ্ণাদি যে কারণ হইতে উৎপন্ন তাহা প্রমাণ দ্বারা নিরূপিত হয়; সুতরাং উহারা সৎ পদার্থ হইতে পারে না। কারণ উহারা বিকার মাত্র, এবং বিকারেরও সর্ব্বদা ব্যভিচার দৃষ্ট হয় (অর্থাৎ কখন বিকার

থাকে কখন থাকে না)। যেমন চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাইলেও ঘটাদি পদার্থ মৃত্তিকা ভিন্ন অন্য কিছু* বলিয়া উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ কারণ ভিন্ন অন্য কিছু বলিয়া উপলব্ধি না হওয়ায় সর্ব্ব প্রকার বিকার পদার্থই অসৎ। উৎপত্তির পূর্ব্বে এবং ধ্বংসের পরে মৃত্তিকাদি কারণ হইতে উৎপন্ন ঘটাদি কার্য্যের উপলব্ধি হয় না। সেই সকল কারণও আবার তাহাদের কারণ হইতে ভিন্ন বলিয়া উপলব্ধি হয় না, সুতরাং তাহারাও অসৎ। এস্থলে আপত্তি হইতে পারে, কারণ সমূহ এইরূপে অসৎ হইলে সকল পদার্থই অসৎ হইয়া পড়ে, (সৎ আর কিছুই থাকে না)। এরূপ আপত্তির খণ্ডন এই যে সকল স্থলেই দুই প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হয়; সৎ বলিয়া জ্ঞান ও অসৎ বলিয়া জ্ঞান। যে বস্তুর জ্ঞানের ব্যভিচার নাই অর্থাৎ যে বস্তু একবার "আছে" বলিয়া বোধ হইলে আর "নাই" বলিয়া বোধ হয় না, তাহার নাম সৎ। আর যে বস্তু একবার আছে বলিয়া বোধ হইলে পরে আবার নাই বলিয়া বোধ হয় তাহার নাম অসৎ। এইরূপে বুদ্ধিতন্ত্র সৎ ও অসৎ দুই ভাগে বিভক্ত, এবং সকলেই সর্ব্বত্র, এই দুই প্রকার জ্ঞান হইতেছে বলিয়া উপলব্ধি করেন। বিশেষণ ও বিশেষ্য পদ এক বিভক্তিতে বর্ত্তমান থাকিলে তাহাদের অভেদ হয়, যেমন "নীলং উৎপলং" ইহার অর্থ উৎপল নীল হইতে অভিন্ন, অর্থাৎ ঐ উৎপলের জ্ঞান হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে অভিন্ন ভাবে নীলত্বেরও জ্ঞান হইবে। এইরূপ যখন "ঘটঃসন্" "পটঃসন্" "হস্তীসন্" ইত্যাদি জ্ঞান হয় তখন ঘট জ্ঞানের সহিত "সৎ" এই জ্ঞান অভিন্ন ভাবে উৎপন্ন হয়; সুতরাং সৎ ও অসৎ ভেদ বুদ্ধির যে কল্পনা করা হইতেছিল তাহা নিরর্থক হয়। কিন্তু লোকে এরূপ অভিন্ন ভাবে উপলব্ধি করে না। এই বুদ্ধিদ্বয়ের (সৎ ও অসৎ) মধ্যে ঘটাদি বুদ্ধির ব্যভিচার হয় তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে; সৎ বুদ্ধির ব্যভিচার হয় না। অতএব ব্যভিচার হয় বলিয়া যে পদার্থ ঘটাদি বুদ্ধির বিষয় তাহা অসৎ, এবং অব্যভিচার হয় না বলিয়া উহা সৎ বুদ্ধির বিষয় হইতে পারে না।

---

* অর্থাৎ ঘটের জ্ঞান জন্মিতে গেলে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্তিকার জ্ঞান জন্মায়। মৃত্তিকার জ্ঞান না জন্মাইলে ঘটের জ্ঞান জন্মায় না; সুতরাং ঘট অসৎ, উহার কারণ মৃত্তিকা সৎ।

যদি বল ঘট বিনষ্ট হইলে যখন ঘট বুদ্ধির ব্যভিচার হয়, তখন সেই সঙ্গে সঙ্গে সৎবুদ্ধিরও ব্যভিচার হউক (অর্থাৎ আপত্তিকারীর মতে ঘটবুদ্ধি ও সংবুদ্ধি অভিন্ন, সুতরাং ঘট বুদ্ধির ব্যভিচার হইলে সৎবুদ্ধিরও ব্যভিচার হউক)। এই আপত্তি খাটিতে পারে না, কারণ তৎকালে সেই সৎবুদ্ধি ঘটাদিতে বর্ত্তমান থাকে (সুতরাং উহার ব্যভিচার হয় না)। সে সৎবুদ্ধি বিশেষণ ভাবে অবস্থিত, সুতরাং (বিশেষ্য নাশে) বিনষ্ট হয় না।

যদি বল সংবুদ্ধি স্থলে যেরূপ যুক্তি অনুসারে একটি ঘট বিনষ্ট হইলেও অন্য ঘটে ত ঘটবুদ্ধি থাকে, "সুতরাং ঘটবুদ্ধি সৎ হউক," এ আপত্তি ইহাতে খাটিতে পারে না; যেহেতু সে ঘটবুদ্ধি পটাদিতে থাকে না।

যদি বল সংবুদ্ধিও ঘট নষ্ট হইলে দৃষ্ট হয় না। এ কথা গুরুতর নহে। সৎবুদ্ধি বিশেষণ ভাবে অবস্থিত, বিশেষ্যের অভাব হইলে বিশেষণ থাকিতে পারে না। থাকিলে তাহার বিষয় কি হইবে? বিষয়ের অভাব হইলে সৎবুদ্ধি থাকে না। যদি বল ঘটাদি বিশেষ্যের অভাব হইলেও বিশেষণ বিশেষ্য ভাবে এক বিভক্তিতে উল্লেখ করা যায় বলিয়া ঘট সৎ হইবে, তাহার উত্তর এই যে মরীচিকা প্রভৃতি স্থলেও সৎবুদ্ধি এবং উদক্ উভয়ের অভাব হইলেও এক বিভক্তিতে 'সৎ ইদং উদকং' এরূপ ব্যবহার হয়, (ইহা দ্বারা এক বিভক্তিতে উল্লেখ হওয়া সৎ অথবা অসৎ এ উভয়ের কোন পক্ষেই প্রমাণ নহে)

অতএব দেহাদি দ্বন্দ্ব কারণ হইতে উৎপন্ন ও অসৎ, উহার অস্তিত্ব নাই। এবং সৎ যে আত্মা তাঁহারও কোথায় অভাব নাই, যেহেতু তাঁহার কোথায় ব্যভিচার হয় না। ইহাই সৎ এবং অসৎরূপ আত্মা এবং অনাত্মার স্বরূপ নির্ণয়। যে সৎ সে সৎই যে অসৎ সে অসৎই।*"

শঙ্করাচার্য্য যেমন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, এই দার্শনিক বিচারও তাহার উপযুক্ত। তবে উনবিংর্শ শতাব্দীর পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে ইহা বড় মিশিবে না। সুখ দুঃখকে সৎই বল, আর অসৎই বল, সুখ দুঃখ আছে। থাকিবে না সত্য,

---

* শাঙ্কর ভাষ্যের এই অনুবাদ আমরা কোন বন্ধুর নিকট উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি।

কিছু নাই, এ-কথা বলিবার বিষয় নাই। কিন্তু থাকিবে না, এইটাই বড় কাজের কথা। তবে, সহ্য করিতে পারিলেই, দুঃখ নষ্ট হইবে।

"————The darkest day,
Wait till to-morrow, will have passed away."

এখন, ১৪।১৫।১৬, এই তিন শ্লোকে যাহা উক্ত হইল, তাহা ভাল করিয়া না বুঝিলে, কয়েকটি আপত্তি উপস্থাপিত হইতে পারে। প্রথম আপত্তি, দুঃখ সহ্য করিতে হইবে—নিবারণ করিতে হইবে না? অর্জ্জুনের দুঃখ, জ্ঞাতি বন্ধু বধ; যুদ্ধ না করিলেই সে দুঃখ নিবারণ হইল; দুঃখ নিবারণের সহজ উপায় আছে। এ স্থলে তাঁহাকে দুঃখ নিবারণ করিতে উপদেশ না দিয়া ভগবান্ দুঃখ সহ্য করিতে উপদেশ দিতেছেন, ইহা কিরূপ উপদেশ? রোগীর রোগের উপশমের জন্য ঔষধ ব্যবহার করিতে পরামর্শ না দিয়া তাহাকে রোগের দুঃখ সহ্য করিতে উপদেশ দেওয়ার সঙ্গে কি এ উপদেশ তুল্য নহে?

না। তাহা নহে। দুঃখ নিবারণের কোন নিষেধ নাই। তবে যেখানে দুঃখ নিবারণ করিতে গেলে অধর্ম্ম হয়, সেখানে দুঃখ নিবারণ না করিয়া সহ্য করিবে। যে যুদ্ধে অর্জ্জুন প্রবৃত্ত, তাহা ধর্ম্ম্য যুদ্ধ। ধর্ম্মযুদ্ধের অপেক্ষা ক্ষত্রি-য়ের আর ধর্ম্ম নাই। ধর্ম্ম পরিত্যাগে অধর্ম্ম। অতএব এস্থলে দুঃখ সহ্য না করিয়া নিবারণ করিলে অধর্ম্ম আছে। এজন্য এখানে সহ্য করিতে হইবে, নিবারণ করা হইবে না।

দ্বিতীয় আপত্তি, এই, দুঃখই সহ্য করিবে—সুখ সহ্য করা কিরূপ? সুখ দুঃখ সমান জ্ঞান করিব? তবে ভগবানের কি এই আজ্ঞা, যে পৃথিবীর কোন সুখে সুখ হইবে না? তবে আর aceticism কাহাকে বলে? সুখ-শূন্য ধর্ম্ম লইয়া কি হইবে?

ইহার উত্তর পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। ইন্দ্রিয়ের অধীন যে সুখ, তাহা দুঃখের কারণ—তাহা দুঃখ মধ্যে গণ্য। ইন্দ্রিয়াদির অনধীন যে সুখ, যথা—জ্ঞান, ভক্তি, প্রীতি, দয়াদি জনিত যে সুখ, তাহা গীতোক্ত ধর্ম্মানুসারে পরিত্যজ্য নহে, বরং গীতোক্ত ধর্ম্মের সেই সুখই উদ্দেশ্য। আর ইন্দ্রিয়ের অধীন

যে সুখ, তাহাও প্রকৃত পক্ষে পরিত্যজ্য নহে। তৎপরিত্যাগও গীতোক্ত ধর্ম্মের উদ্দেশ্য নহে। তাহাতে অনাসক্তিই গীতোক্ত ধর্ম্মের উদ্দেশ্য, পরিত্যাগ উদ্দেশ্য নহে।

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈ বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥ ২।৬৪

উক্ত চতুঃষষ্ঠিতম শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে আমরা এ বিষয়ে আরও কিছু বলিব।

আমরা দেখিয়াছি যে দ্বাদশ শ্লোকে হিন্দু ধর্ম্মের প্রথমতত্ত্ব সূচিত হইয়াছে, আত্মার অবিনাশিতা। ত্রয়োদশ শ্লোকে দ্বিতীয় তত্ত্ব—জন্মান্তরবাদ। এই চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ, এবং ষোড়শ শ্লোকে তৃতীয় তত্ত্ব সূচিত হইতেছে—সুখদুঃখের অনাত্মধর্ম্মিতা ও অনিত্যত্ব। সাংখ্য দর্শনের ব্যাখ্যার উপলক্ষে, আত্মার সঙ্গে সুখদুঃখের সম্বন্ধ পূর্ব্বে যেরূপ বুঝাইয়াছিলাম, তাহা বুঝাইতেছি।

"শরীরাদি ব্যতিরিক্ত পুরুষ। কিন্তু দুঃখ ত শারীরাদিক, শরীরাদিতে যে দুঃখের কারণ নাই,—এমন দুঃখ নাই। যাহাকে মানসিক দুঃখ বলি—বাহ্য পদার্থই তাহার মূল। আমার বাক্যে তুমি অপমানিত হইলে, আমার বাক্য প্রাকৃতিক পদার্থ, তাহা শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা তুমি গ্রহণ করিলে তাহাতে তোমার দুঃখ। অতএব প্রকৃতি ভিন্ন দুঃখ নাই, কিন্তু প্রকৃতিঘটিত দুঃখ পুরুষে বর্ত্তে কেন? "অসঙ্গোয়ম্পুরুষঃ।" পুরুষ একা, কাহার সংসর্গ-বিশিষ্ট নহে। (১ম অধ্যায়ে ১৫ সূত্র।) অবস্থাদি, সকল শরীরের, আত্মার নহে। (ঐ ১৪ সূত্র।)

ন বাহ্যান্তরয়োরূপরজ্যোপরঞ্জকভাবোপি দেশব্যবধানাৎ স্রুঘ্নস্যপাটলিপুত্রস্যয়োরিব।" বাহ্য এবং আন্তরিকের মধ্যে উপরজ্য এবং উপরঞ্জক ভাব নাই; কেননা তাহা পরস্পর সংলগ্ন নহে, দেশব্যবধানবিশিষ্ট, যেমন এক জন পাটলিপুত্র নগরে থাকে, আর একজন স্রুঘ্ন নগরে থাকে, ইহাদিগের পরস্পরের ব্যবধান। তদ্রূপ।

তবে পুরুষের দুঃখ কেন? প্রকৃতির সংযোগই দুঃখের কারণ। বাহ্যে আন্তরিকে দেশ ব্যবধান আছে বটে, কিন্তু কোন প্রকার সংযোগ নাই, এমত নহে। যেমন স্ফাটিক পাত্রের নিকট জবা কুসুম রাখিলে পাত্র পুষ্পের বর্ণ

বিশিষ্ট হয় বলিয়া, পুষ্প এবং পাত্রে এক প্রকার সংযোগ আছে বলা যায়, এ সেইরূপ সংযোগ। পুষ্প এবং পাত্র মধ্যে দেশ ব্যবধান থাকিলেও পাত্রের বর্ণ বিকৃত হইতে পারে; ইহাও সেইরূপ। এ সংযোগ নিত্য নহে, দেখা যাইতেছে; সুতরাং তাহার উচ্ছেদ হইতে পারে। সেই সংযোগ উচ্ছেদ হইলেই দুঃখের কারণ অপনীত হইল। অতএব এই সংযোগের উচ্ছিত্তিই দুঃখ নিবারণের উপায়, সুতরাং তাহাই পুরুষার্থ। "যদ্বা তদ্বা তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থস্তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ (৬,৭।)*

কালভৈরব।

ভারতের শ্রেষ্ঠ পুণ্যভূমি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র; কাশীধাম। দেবাদিদেব, সৃষ্টি স্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা, সর্ব্বজননিয়ন্তা, অষ্টমূর্ত্তি ভোলানাথ, বিশ্বেশ্বর মূর্ত্তিতে সেই পরম পুণ্যক্ষেত্রের অধিষ্ঠাতৃদেবতা। কাশীদর্শনে জীবের পাপখণ্ডন ও স্পর্শে মুক্তিলাভ হয়। যে ব্যক্তি তথায় বাস করতঃ অন্তে সেই মহিমাময় ত্রিলোকতারণ, ত্রিশূলির ত্রিশূলাগ্রাবস্থিত রাজ্যে মানবলীলা সম্বরণ করিতে পারে, সে লোকান্তরে সাযুজ্য নামধেয় চরমমুক্তি শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ভুবনসুন্দরী বারাণসীতে বাস ও বিশ্বসুন্দর বিশ্বেশ্বরের সেবা সকলের ভাগ্যে ঘটে না।

পুণ্যভূমি পুণ্যাত্মার জন্য, পাপীর সেস্থানে প্রবেশের অধিকার নাই। বিশ্বেশ্বর ভোলানাথ, তাঁহার কোন বিশেষ নিষেধ বিধি দেখিতে পাওয়া যায় না, তিনি সকলের প্রতিই সমভাবে কৃপাবান্; তবে কেন পাপাত্মা ও পুণ্যাত্মা সমান অধিকার না পায়? সে দোষ কাশীপতি বিশ্বেশ্বরের নহে। সে দোষ তাঁহারই নিয়োজিত (নিয়োজিত হইলেও লোকটা বড় কড়া) একজন কর্ম্মকারকের, এই নিয়োজিত বা আনীত কর্ম্মকারক কাশীধামে কালভৈরব নামধারী কোতয়াল।

---

* প্রবন্ধ পুস্তক হইতে উদ্ধৃত।

পাপীই হউন আর পুণ্যবানই হউন, কোতয়াল কালভৈরবের ভৈরবদৃষ্টি সকলকেই পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে, পাপী দেখিলে—পাপীকে পবিত্র কাশীধামে পাপকার্য্য করিতে দেখিলে, কালভৈরব ভীম সম্মার্জ্জনী হস্তে অবিরত ভয়ানক তাড়না করিতে থাকে, সে তাড়না সহ্য করা অসাধারণ অবিচলিত-চিত্ততা ও সহিষ্ণুতার কার্য্য। কেহবা সেই ভৈরব-তাড়নায় উৎপীড়িত হইয়া সর্ব্বসুখদায়িনী সর্ব্বসন্তাপনাশিনী বারাণসীকে অচিরে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, কেহ বা——

"ছাড়িয়া যাইতে কাশী মন নাহি যায়,
লুকায়ে রহেন যদি ভৈরবে তাড়ায়।"

যাহার বড় কাশীগত প্রাণ, বিশ্বেশ্বরে একান্ত দত্তমন, সেই-ই কালভৈরবের সম্মার্জ্জনীতাড়না কোন ক্রমে সহ্য করিয়া থাকে। পাছে কোন দিন কাশী হইতে বিতাড়িত ও বিশ্বেশ্বরদর্শনে বঞ্চিত হইতে হয় এই ভয়ে সতত ভীত হইয়া অতি সঙ্গোপনে একপার্শ্বে লুক্কায়িত ভাবে কাল যাপন করিতে থাকে। বিশ্বেশ্বরের নিয়োজিত কালভৈরব, তাঁহারই আশ্রিত অনুগত চরণারবিন্দ-দর্শনে আগত নিরীহ ব্যক্তিবর্গকে উৎপীড়িত করতঃ অবশেষে তাঁহার সুখ-রাজ্য হইতে দূরীভূত করিতে থাকে, তিনি ভবতোষ ভয়ত্রাতা ভোলানাথ—তাহাতে হস্তার্পণ করিতে পারেন না। করিলে কালভৈরব বলে, "তবে আপনার এ পুণ্য সুখময় কাশীধাম, ভাক্ত, পাপাসক্ত ভক্তে পরিপূর্ণ হউক, আপনি তাহাদের লইয়া এ মঙ্গল রাজ্যে বিরাজ করুন, আমি বিশ্রাম গ্রহণ করি।"

আমি কাশী দেখি নাই, কিন্তু এই গৃহস্থাশ্রমে—এই সংসারে কাশীধামের ন্যায় অনেক দেবদেবী দেখিয়াছি। এইখানেই এই সামান্য গৃহস্থাশ্রমের ভিতরেই অনেকানেক কালভৈরব বিরাজমান দেখিয়াছি। আশ্রমের মধ্যে উপার্জ্জক, সংসারের পরিচালক বাবু আমার বিশ্বেশ্বর—আর তাঁহার গৌরবরণা, নানালঙ্কার-ভূষিতা, গবর্ণমেণ্টসিকিওরিটিলোলুপা, করতলগৃহিতভর্ত্তৃকা, আঠারআনাস্বার্থপরায়ণা গৃহিণী আমার এই পবিত্র আশ্রমকাশীর কোতয়াল। কাশীর কোতোয়াল কালভৈরব অপেক্ষা এই আশ্রমকালভৈরবগণের প্রতাপ ও দৌরাত্ম্য ভীষণ হইতে ভীষণতর। কাশীতে কষ্টে সৃষ্টে লুকাইয়াও অনেকে

বাস করিতে পারে বলিয়াছি, কিন্তু এ আশ্রমের অধিষ্ঠাতা বিশ্বেশ্বরকে ত্যাগ করিয়া কোথায় লুকাইবে? এ সংসার কোতোয়ালের দৌরাত্ম্যে, তাহার অবিশ্রান্তপরিচালিত বিকট সম্মার্জ্জনীর জ্বালায়, আশ্রমের ভিতর লুকাইবার স্থান পর্য্যন্ত নাই।

ইঁহার নিকট পিত্রালয়ের সম্পর্কীয়—কি দূর, কি নিকট—সকলেই পুণ্যাত্মা, সকলেই তাঁহার জুরিসডিক্‌সন রূপ আশ্রমকাশীতে বাস করিবার ও সর্ব্ব প্রকার আব্‌দার আখচের ষোল আনা অধিকারী। তাহাদের দোষ তিনি নিজে দেখিতে পান না, কখন স্পষ্টতঃ পাপ করিতে দেখিলেও তাহাকে আশ্রম হইতে বিদূরিত করা দূরে থাকুক, তাহার একটা সুবিচার জন্য সে কথা আশ্রমনিয়ন্তা বিশ্বেশ্বরের কাণে পর্য্যন্ত তুলিতে চাহেন না। তাহাদেব মানবলীলা অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্যই আশ্রম কাশীরাজের জন্ম, আর তাহাদের প্রতিপালনে ও সন্তোষে সকলতৃপ্তি,কোতোয়াল কাল ভৈরবের তৃপ্তি ও আশ্রম কাশীরও সর্ব্বাঙ্গীন শান্তি। তাহাদের অতুষ্টিতে কোতোয়াল অতুষ্ট, আশ্রমেরও ঘোর অশান্তি। পিত্রালয় সম্পর্কীয় ব্যতীত অনেক সময়ে অপরাপর অনেক লোক ভৈরবের নিকট পুণ্যাত্মার ন্যায় থাকিতে পারে, তাহারা বিশ্বেশ্বরের নিকট কোন প্রকার লাভালাভের প্রার্থী হয় না। "যাই এমন কোতোয়াল ওরফে পাকা গৃহিণী এই আশ্রম কাশীর হরদম তদারক তদ্বির করিতেছেন তাই এ সংসারে কোন গোলযোগ, কোন অশান্তি নাই ; এমনটি না হইলে কি হইত বলদেখি" এবংবিধ মসৃণ বাক্য প্রয়োগ করিয়া সর্ব্ব সময়ে কালভৈরবের সেবায় বা মনঃস্তুষ্টিতে নিযুক্ত। কখন কদাচিৎ বিশ্বেশ্বর আরাধনে মনোযোগ দিতে পারে।

আর এ কোতোয়াল ভৈরবের চক্ষে শ্বশুরালয় সম্পর্কীয় অধিকাংশই পাপাসক্ত, তজ্জন্য আশ্রম কাশীতে আসিয়া তন্নিয়ন্তা বিশ্বেশ্বরের সেবার অনুপযুক্ত। অক্ষম বৃদ্ধ শ্বশুর কতক, বৃদ্ধা শাশুড়ী সম্পূর্ণ, বিধবা ননন্দা বা তাহাদের পুত্র কন্যা থাকিলে তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ অঙ্গের পাপী। অল্পবয়স্ক পঠদ্দশাগ্রস্ত বিবাহিত দেবর তাহাদের নিম্নে, পতিপুত্রবিহীনা অনাথা সর্ব্বকর্ম্মনিপুণা ভাগ্যদোষে অল্প মাত্রায় মুখরা, ভৈরবের অত্যাচার অন্বেষণে ও তৎপ্রতিকারে তৎপরা, ননন্দাকে কখন কখন কোতোয়াল পাপীবোধে সহস্র

অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিশ্বেশ্বরসমীপবর্ত্তিনী হইয়া কাশীবাস করিতে অনুজ্ঞা প্রদান করিয়া থাকেন, সে কেবল বিশ্বেশ্বরের সেবার জন্য, তেমন লোক না থাকিলে ভোগ সেবা কিছুই চলে না। দেবতার সেবা বন্ধ হইলে কোতোয়ালেরও কষ্ট ভোগ করিতে হয়। হয় ত কোতোয়ালকেই আশ্রমের যাবতীয় কার্য্যের ভারগ্রহণ ও বিশ্বনাথের ভোগ সেবার আয়োজন কুত্রাপি বা স্বহস্তে সেবা পর্য্যন্ত করিতে হয়। ভৈরব বড় কড়া লোক। এক দিনের অধিক দুই দিন সে বিরক্তিকর, কষ্টদায়ক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করেন না। সুতরাং তেমন পাপীকে স্থান না দিয়া কালভৈরব কি করেন! কিন্তু অপর সকলকেই তিনি ভীম সম্মার্জ্জনী ওরফে কলহের কুবচনকণ্টক প্রহারে দূরীভূত করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া থাকেন। যিনি বড় বিশ্বেশ্বরগতপ্রাণ; নিতান্ত কাশীবাস-লোলুপা (শাশুড়ী) তিনিই সে কুবচন কষ্ট ও বিবিধ কদাচার সহ্য করিয়াও বিশ্বেশ্বরের নিকট বাস করিতে কুণ্ঠিত হন না। যখন ভৈরব বড় বাড়াবাড়ি করেন, যখন তাঁহার উৎপীড়ন কাশীবাসিগণের অসহ্য হইয়া উঠে, শ্রেষ্ঠা পাপিষ্ঠা (শাশুড়ী) মনকে প্রবোধ দিবার জন্য বলেন "আহা! আমার এমন ছেলের এমন বৌ" বিষ্ণুঃ "আমাদের কাশীরাজ ভোলানাথ বিশ্বেশ্বরের এমন কালভৈরব কোতোয়াল।"

যদি কখন কোন দিন কালভৈরবের নিতান্ত অনুপযুক্ত অত্যাচার দর্শনে বিশ্বেশ্বরের বড় অসহ্য বোধ হয়, ভৈরবের কৈফিয়ৎ তলব না করা বড়ই অবিচার বলিয়া মনে লাগে। অতি কোমল কৈফিয়তে কোতোয়ালকে অত্যাচারের কারণ জিজ্ঞাসা করেন, সে দিন অমনি ভৈরব উত্তর দেন "আপনি তবে এ পুণ্য কাশীতে সদত পাপীসংশ্রবে ওরফে আপনার স্বসম্পর্কীয় আত্মীয় স্বজন লইয়া বাস করুন; আমি কিছু দিনের জন্য বিশ্রাম লাভ করি—বাপের বাড়ী যাই।" কোতোয়ালের অভিমান বিশ্বেশ্বর সহ্য করিতে পারেন না। তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস এই কালভৈরব হইতেই আশ্রম কাশীর যাবতীয় পুণ্য কার্য্য যাবতীয় সুখস্বাচ্ছন্দ্য অক্ষুণ্ণ রূপে নির্ব্বাহিত ও রক্ষিত হইতেছে। এই আশ্রম কাশীর বিশ্বেশ্বর কোতোয়ালের অনুগত বশীভূত বলিয়াই সংসার কাশীবাসীর উপর এত অত্যাচার। সর্ব্বরাজ্য সর্ব্ব সময়েই কোতোয়াল রাজার বশীভূত আজ্ঞাবহ—এ আশ্রম কাশীতেও তেমন আজ্ঞাবহ কোতো-

স্থল নিতান্ত দুর্লভ নহে; কিন্তু কতকগুলি কালভৈরবের জন্য সংসার কাশীধাম বড় বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিতেছে। বিশ্বেশ্বর একটু মেজাজটা কড়া করিবেন নাকি?

শ্রী * * *

কৃষ্ণচরিত্র।

ভগবদ্‌যান পর্ব্বাধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রস্তাব।

শ্রীকৃষ্ণ, পূর্ব্বকৃত অঙ্গীকারানুসারে সন্ধিস্থাপনার্থ কৌরবদিগের নিকট যাইতে প্রস্তুত হইলেন। গমনকালে পাণ্ডবেরা ও দ্রৌপদী সকলেই তাঁহাকে কিছু কিছু বলিলেন। শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদিগের কথার উত্তর দিলেন। এই সকল কথোপকথন, অবশ্য ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। তবে কবি ও ইতিহাসবেত্তা যে সকল কথা কৃষ্ণের মুখে বসাইয়াছেন, তাহার দ্বারা বুঝা যায়, যে কৃষ্ণের কিরূপ পরিচয় তিনি অবগত ছিলেন। ঐ সকল বক্তৃতা হইতে আমরা কিছু কিছু উদ্ধৃত করিব।

যুধিষ্ঠিরের কথার উত্তরে কৃষ্ণ এক স্থানে বলিতেছেন, "হে মহারাজ, ব্রহ্মচর্য্যাদি কার্য্য ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বিধেয় নহে। সমুদায় আশ্রমীরা ক্ষত্রিয়ের ভৈক্ষাচরণ নিষেধ করিয়া থাকেন। বিধাতা সংগ্রামে জয়লাভ বা প্রাণ-পরিত্যাগ ক্ষত্রিয়ের নিত্যধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; অতএব দীনতা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিতান্ত নিন্দনীয়। হে অরাতিনিপাতন যুধিষ্ঠির! আপনি দীনতা অবলম্বন করিলে, কখনই স্বীয় অংশ লাভ করিতে পারিবেন না। অতএব বিক্রম প্রকাশ করিয়া শত্রুগণকে বিনাশ করুন।"

গীতাতেও অর্জ্জুনকে কৃষ্ণ এইরূপ কথা বলিয়াছেন দেখা যায়। ইহা হইতে যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায়, তাহা পূর্ব্বে বুঝান গিয়াছে। পুনশ্চ ভীমের কথার উত্তর বলিতেছেন, "মনুষ্য পুরুষকার পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল

দৈব বা দৈব পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল পুরুষকার অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়; সে কর্ম্ম সিদ্ধ না হইলে ব্যথিত বা কর্ম্ম সিদ্ধ হইলে সন্তুষ্ট হয় না।"

গীতাতেও এইরূপ উক্তি আছে।* অর্জ্জুনের কথার উত্তরে কৃষ্ণ বলিতেছেন,

"উর্ব্বর ক্ষেত্রে যথা নিয়মে হলচালন বীজ বপনাদি করিলেও বর্ষা ব্যতীত কখনই ফলোৎপত্তি হয় না। পুরুষ যদি পুরুষকার সহকারে তাহাতে জল সেচন করে, তথাপি দৈব প্রভাবে উহা শুষ্ক হইতে পারে। অতএব প্রাচীন মহাত্মাগণ দৈব ও পুরুষকার উভয় একত্র মিলিত না হইলে কার্য্য সিদ্ধি হয় না বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আমি যথাসাধ্য পুরুষকার প্রকাশ করিতে পারি; কিন্তু দৈব কর্ম্মের অনুষ্ঠানে আমার কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই।"

এ কথার উল্লেখ আমরা পূর্ব্বে করিয়াছি। কৃষ্ণ এখানে দেবত্ব একেবারে অস্বীকার করিলেন। কেননা তিনি মানুষী শক্তির দ্বারা কর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত। ঐশী শক্তির দ্বারা কর্ম্ম সাধন ঈশ্বরের অভিপ্রেত হইলে, অবতারের কোন প্রয়োজন থাকে না।

অন্যান্য বক্তার কথা সমাপ্ত হইলে দ্রৌপদী কৃষ্ণকে কিছু বলিলেন। তাঁহার বক্তৃতায় এমন একটা কথা আছে, যে স্ত্রীলোকের মুখে তাহা অতি বিস্ময়কর। তিনি বলিতেছেন।

"অবধ্য ব্যক্তিকে বধ করিলে যে পাপ হয়, বধ্য ব্যক্তিকে বধ না করিলেও সেই পাপ হইয়া থাকে।"

এই উক্তি স্ত্রীলোকের মুখে বিস্ময়কর হইলেও স্বীকার করিতে হইবে, যে দশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদর্শনে আমি দ্রৌপদীচরিত্রের যেরূপ পরিচয় দিয়াছিলাম, তাহার সঙ্গে এই বাক্যের অত্যন্ত সুসঙ্গতি আছে। আর স্ত্রীলোকের মুখে ভাল শুনাক্ না শুনাক্, ইহা যে প্রকৃত ধর্ম্ম, এবং কৃষ্ণেরও যে এই মত, ইহাও আমি জরাসন্ধ বধের সমালোচনা কালে ও অন্য সময়ে বুঝাইয়াছি।

---

* সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে। ২।৪৮

দ্রৌপদীর এই বক্তৃতার উপসংহার কালে এক অপূর্ব্ব কবিত্ব কৌশল আছে। তাহা উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

অসিতাপাঙ্গী দ্রুপদনন্দিনী এই কথা শুনিয়া কুটিলাগ্র, পরম রমণীয়, সর্ব্বগন্ধাধিবাসিত, সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন, মহাভুজগসদৃশ, কেশকলাপ ধারণ করিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে দীন নয়নে পুনরায় কৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন, হে জনার্দ্দন, দুরাত্মা দুঃশাসন আমার এই কেশ আকর্ষণ করিয়াছিল। শত্রুগণ সন্ধি স্থাপনের মত প্রকাশ করিলে তুমি এই কেশকলাপ স্মরণ করিবে। ভীমার্জ্জুন দীনের ন্যায় সন্ধি স্থাপনে কৃতসংকল্প হইয়াছেন; তাহাতে আমার কিছুমাত্র ক্ষতি নাই, আমার বৃদ্ধ পিতা মহারথ পুত্রগণ সমভিব্যাহারে শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করিবেন, আমার মহাবল পরাক্রান্ত পঞ্চপুত্র অভিমন্যুরে পুরস্কৃত করিয়া কৌরবগণকে সংহার করিবে। দুরাত্মা দুঃশাসনের শ্যামল বাহু ছিন্ন, ধরাতলে নিপতিত ও পাংশুলুণ্ঠিত না দেখিলে আমার শান্তি লাভের সম্ভাবনা কোথায়? আমি হৃদয়ক্ষেত্রে প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় ক্রোধ স্থাপন পূর্ব্বক ত্রয়োদশ বৎসর প্রতীক্ষা করিয়াছি। এক্ষণে সেই ত্রয়োদশ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে, তথাপি তাহা উপশমিত হইবার কিছুমাত্র উপায় দেখিতেছি না; আজি আবার ধর্ম্মপথাবলম্বী বৃকোদরের বাক্যশল্যে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।

"নিবিড়নিতম্বিনী আয়তলোচনা কৃষ্ণা এই কথা কহিয়া বাষ্পগদ্গদস্বরে কম্পিত কলেবরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, দ্রবীভূত হুতাশনের ন্যায় অত্যুষ্ণ নেত্রজলে তাঁহার স্তনযুগল অভিষিক্ত হইতে লাগিল, তখন মহাবাহু বাসুদেব তাঁহারে সান্ত্বনা করত কহিতে লাগিলেন, হে কৃষ্ণে! তুমি অতি অল্প দিনের মধ্যেই কৌরব মহিলাগণকে রোদন করিতে দেখিবে। তুমি যেমন রোদন করিতেছ, কুরুকুলকামিনীরাও তাহাদের জ্ঞাতি বান্ধবগণ নিহত হইলে এইরূপ রোদন করিবে। আমি যুধিষ্ঠিরের নিয়োগানুসারে ভীমার্জ্জুন নকুল সহদেব সমভিব্যাহারে কৌরবগণের বধসাধনে প্রবৃত্ত হইব। ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ কালপ্রেরিতের ন্যায় আমার বাক্যে অনাদর প্রকাশ করিলে অচিরাৎ নিহত ও শৃগাল কুক্কুরের ভক্ষ্য হইয়া ধরাতলে শয়ন করিবে। যদি হিমবান্ প্রচলিত, মেদিনী উৎক্ষিপ্ত ও আকাশমণ্ডল নক্ষত্র

সমূহের সহিত নিপতিত হয়; তথাপি আমার বাক্য মিথ্যা হইবে না। হে কৃষ্ণে! বাষ্প সংবরণ কর; আমি তোমারে যথার্থ কহিতেছি, তুমি অচিরকাল মধ্যেই স্বীয় পতিগণকে শত্রু সংহার করিয়া রাজ্যলাভ করিতে দেখিবে।"

এই উক্তি শোণিতপিপাসুর হিংসাপ্রবৃত্তি বা ক্রুদ্ধের ক্রোধাভিব্যক্তি নহে। যিনি সর্ব্বত্রগামী সর্ব্বকালব্যাপী বুদ্ধির প্রভাবে, ভবিষ্যতে যাহা হইবে তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিলেন, তাঁহার ভবিষ্যদুক্তি মাত্র। কৃষ্ণ বিলক্ষণ জানিতেন, যে দুর্য্যোধন রাজ্যাংশ প্রত্যর্পণপূর্ব্বক সন্ধি স্থাপন করিতে কদাপি সম্মত হইবে না। ইহা জানিয়াও যে তিনি সন্ধিস্থাপনার্থ কৌরব সভায় গমনের জন্য উদ্যোগী, তাহার কারণ এই যে, যাহা অনুষ্ঠেয় তাহা সিদ্ধ হউক বা না হউক, তাহা করিতে হইবে। সিদ্ধি ও অসিদ্ধি তুল্য জ্ঞান করিতে হইবে। ইহাই তাঁহার মুখবিনির্গত গীতোক্ত অমৃতময় ধর্ম্ম। তিনি নিজেই অর্জ্জুনকে শিখাইয়াছেন, যে

সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।

সেই নীতির বশবর্ত্তী হইয়া, আদর্শযোগী, ভবিষ্যৎ জানিয়াও, সন্ধিস্থাপনের চেষ্টায় কৌরব সভায় চলিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যাত্রা।

যাত্রাকালে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত ব্যবহারই মনুষ্যোপযোগী এবং কালোচিত। তিনি "রেবতী নক্ষত্রযুক্ত কার্ত্তিক মাসীয় দিনে মৈত্রমুহূর্ত্তে কৌরব সভায় গমন করিবার বাসনায় সুবিশ্বস্ত ব্রাহ্মণগণের মাঙ্গল্য পুণ্যনির্ঘোষ শ্রবণ ও প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক স্নান ও বসন ভূষণ পরিধান করিয়া সূর্য্য ও বহ্নির উপাসনা করিলেন এবং বৃষলাঙ্গুল দর্শন, ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন, অগ্নি প্রদক্ষিণ ও কল্যাণকর দ্রব্য সকল সন্দর্শনপূর্ব্বক" যাত্রা করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যে ধর্ম্ম প্রচারিত করিয়াছেন, তাহাতে তৎকালে প্রবল কাম্যকর্ম্মপরায়ণ যে বৈদিক ধর্ম্ম, তাহার নিন্দাবাদ আছে। কিন্তু তাই

বলিয়া তিনি বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণগণকে কখনও অবমাননা করিতেন না। তিনি আদর্শ মনুষ্য, এই জন্য তৎকালে ব্রাহ্মণদিগের প্রতি যে ব্যবহার উচিত ছিল, তিনি তাহাই করিতেন। তখনকার ব্রাহ্মণেরা বিদ্বান্, জ্ঞানবান, ধর্ম্মাত্মা, এবং অস্বার্থপর হইয়া সমাজের মঙ্গলসাধনে নিরত ছিলেন, এজন্য অন্য বর্ণের নিকট, পূজা তাঁহাদের ন্যায্য প্রাপ্য। কৃষ্ণও সেই জন্য তাহাদিগকে উপযুক্তরূপ পূজা করিতেন। উদাহরণস্বরূপ, পথিমধ্যে ঋষিগণের সমাগমের বর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি।

"মহাবাহু কেশব এইরূপে কিয়দ্দূর গমন করিয়া পথের উভয়পার্শ্বে ব্রহ্মতেজে জাজ্বল্যমান কতিপয় মহর্ষিরে সন্দর্শন করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র অতিমাত্র ব্যগ্রতাসহকারে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহর্ষিগণ! সমুদায় লোকের কুশল? ধর্ম্ম উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হইতেছে? ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয় ব্রাহ্মণগণের শাসনে অবস্থান করিতেছে? আপনারা কোথায় সিদ্ধ হইয়াছেন? কোথায় যাইতে বাসনা করিতেছেন? আপনাদের প্রয়োজন কি? আমারে আপনাদের কোন্ কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে? এবং আপনারা কি নিমিত্ত ধরণীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন?

"তখন মহাভাগ জামদগ্ন্য কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া করিলেন, হে মধুসূদন! আমাদের মধ্যে কেহ কেহ দেবর্ষি, কেহ কেহ বহুশ্রুত ব্রাহ্মণ, কেহ কেহ রাজর্ষি এবং কেহ কেহ তপস্বী। আমরা অনেকবার দেবাসুরের সমাগম দেখিয়াছি; এক্ষণে সমুদায় ক্ষত্রিয়, সভাসদ্, ভূপতি ও আপনারে অবলোকন করিবার বাসনায় গমন করিতেছি। আমরা কৌরব সভামধ্যে আপনার মুখ-বিনির্গত ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। হে যাদবশ্রেষ্ঠ, ভীষ্ম দ্রোণ, বিদুর প্রভৃতি মহাত্মাগণ এবং আপনি যে সত্য ও হিতকর বাক্য কহিবেন; আমরা সেই সকল বাক্য শ্রবণে নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি।

"এক্ষণে আপনি সত্বরে কুরুরাজ্যে গমন করুন; আমরা তথায় আপনারে সভামণ্ডপে দিব্য আসনে আসীন ও তেজঃপ্রদীপ্ত দেখিয়া পুনরায় আপনার সহিত কথোপকথন করিব।"

এখানে ইহাও বক্তব্য যে এই জামদগ্ন্য পরশুরাম কৃষ্ণের সমসাময়িক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। রামায়ণে আবার তিনি রামচন্দ্রের সমসাময়িক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। অথচ পুরাণে তিনি রাম কৃষ্ণ উভয়েরই পূর্ব্বগামী বিষ্ণুর অবতারান্তর বলিয়া খ্যাত। পুরাণের দশাবতারবাদ কতদূর সঙ্গত, তাহা আমরা সময়ান্তরে বিচার করিব। আমরা বলিয়াছি যে কৃষ্ণাবতার ভিন্ন আমরা অন্য অবতারে বিশ্বাসবান নই।

এই হস্তিনা যাত্রার বর্ণনায় জানা যায়, যে কৃষ্ণ নিজেও সাধারণ প্রজার নিকটেও পূজ্য ছিলেন। হস্তিনাযাত্রার বর্ণনা, আরও কিছু উদ্ধৃত করিলাম।

"দেবকীনন্দন সর্ব্বশস্যপরিপূর্ণ অতি রম্য সুখাস্পদ পরম পবিত্রশালি-ভবন এবং অতি মনোহর ও হৃদয়তোষণ বহুবিধ গ্রাম্যপশু সন্দর্শনকরতঃ বিবিধ পুর ও রাজ্য অতিক্রম করিলেন। কুরুকুলসংরক্ষিত নিত্যপ্রহৃষ্ট অনুদ্বিগ্ন ব্যসনরহিত পুরবাসিগণ কৃষ্ণকে দর্শন করিবার মানসে উপপ্লব্য নগর হইতে পথিমধ্যে আগমন করিয়া তাঁহার পথ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিয়ৎ-ক্ষণ পরে মহাত্মা বাসুদেব সমাগত হইলে তাহারা বিধানানুসারে তাঁহার পূজা করিতে লাগিল।

"এদিকে ভগবান্ মরীচিমালী স্বীয় কিরণজাল পরিত্যাগ করিয়া লোহিত কলেবর ধারণ করিলে অরাতিনিপাতন মধুসূদন বৃকস্থলে সমুপস্থিত হইয়া সত্বরে রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক যথাবিধি শেষ সমাপনান্তে রথাশ্বমোচনে আদেশ করিয়া সন্ধ্যার উপাসনা করিতে লাগিলেন। দারুক কৃষ্ণের আজ্ঞা-নুসারে অশ্বগণকে রথ হইতে মুক্ত করতঃ শাস্ত্রানুসারে তাহাদের পরিচর্য্যা ও গাত্র হইতে সমুদায় যোক্ত্রাদি মোচন করিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিল। মহাত্মা মধুসূদন সন্ধ্যা সমাপনান্তে স্বীয় সমভিব্যাহারী জনগণকে কহিলেন, হে পরিচারকবর্গ! অদ্য যুধিষ্ঠিরের কার্য্যানুরোধে এইস্থানে রজনী অতিবাহিত করিতে হইবে। তখন পরিচারকগণ তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া ক্ষণকালমধ্যে পটমণ্ডপ নির্ম্মাণ ও বিবিধ সুমিষ্ট অন্নপান প্রস্তুত করিল। অনন্তর সেই গ্রামস্থ স্বধর্ম্মাবলম্বী আর্য্য কুলীন ব্রাহ্মণ সমুদায় অরাতিকুলকালান্তক মহাত্মা হৃষীকেশের সমীপে আগমনপূর্ব্বক বিধানানুসারে তাঁহারে পূজা ও আশীর্ব্বাদ করিয়া স্ব স্ব ভবনে আনয়ন করিতে বাসনা

করিলেন। ভগবান্ মধুসূদন তাঁহাদের অভিপ্রায়ে সম্মত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে অর্চ্চনপূর্ব্বক তাঁহাদের ভবনে গমন করিয়া তাঁহাদিগের সমভি-ব্যাহারে পুনরায় স্বীয় পটমণ্ডপে আগমন করিলেন। পরে সেই সমুদায় ব্রাহ্মণগণের সমভিব্যাহারে সুমিষ্ট দ্রব্যজাত ভোজন করিয়া পরম সুখে যামিনী যাপন করিলেন।”

ইহা নিতান্তই মানুষ চরিত্র, কিন্তু আদর্শ মনুষ্যের চরিত্র।

দেখা যাইতেছে, যে দেবতা বলিয়া কেহ তাঁহাকে পূজা করিতেছে, এমন কথা নাই। তবে শ্রেষ্ঠ মনুষ্য যেরূপ পূজা পাইবার সম্ভাবনা তাহাই তিনি পাইতেছেন, এবং আদর্শ মনুষ্যের লোকের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করা সম্ভব, তিনি তাহাই করিতেছেন।

ভারতের ইতিহাস।

(পাশ্চাত্যদিগের ঐতিহাসিকতার উদাহরণ)

(টিসিয়স রচিত)

জীবনী। টিসিয়স নিডস নিবাসী টিসিওখসের পুত্র। নিডস একটী প্রধান সমুদ্রতীরবর্ত্তী লেসিডেমনিয় উপনিবেশ। ইঁহারা আস্‌কেলেপিয়াডাই নামক পুরোহিতবংশসম্ভূত এবং পুরুষানুক্রমে চিকিৎসা ব্যবসায়ী। টিসিয়স হিপো-ক্রেটিসের সমসাময়িক এবং অনুমান ৪১৬ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে চিকিৎসা বিষয়ে বেশ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। পারস্যরাজ ঐ সময়ে তাঁহাকে স্বদেশে লইয়া গিয়া রাজচিকিৎসক নিযুক্ত করেন। টিসিয়স ১৭ বৎসর কাল পারস্যে বাস করিয়া অনুমান ৩৯৮ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে স্বদেশে ফিরিয়া আইসেন। তার পর ইতিহাসে কিছু লেখে না।

টিসিয়স কেবল ব্যবসাতেই জীবন অতিবাহিত করেন নাই--অনেকগুলি গ্রন্থও প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে পারস্যের ইতিহাসই প্রধান। ঐ গ্রন্থ এখন নাই। ভারতবর্ষের যে ইতিহাসের কথা আমরা বলিতেছি উহাও এখন নাই। তবে ফোটিয়স ঐ গ্রন্থের একখানি চুম্বক করিয়াছেন সেই 'সংক্ষিপ্ত' হইতে আমরা পাঠককে মূল গ্রন্থের কিঞ্চিৎ আভাস দিব।

ইতিহাস। সিন্ধু নদ যেখানে বড় সঙ্কীর্ণ সেখানকার বিস্তার আড়াই ক্রোশ, যেখানে অতি প্রশস্ত সেখানে দ্বাদশ ক্রোশের অধিক। নদীতে স্কোলেক্স নামক এক প্রকার পোকা জন্মে। অন্য জীবের সম্পর্ক নাই।

ভারতবর্ষের পর আর মনুষ্যের আবাস নাই। ভারতবর্ষে বৃষ্টি হয় না, নদীর জলেই সব কাজ হয়। এক প্রকার ফোয়ারা দ্রবীভূত স্বর্ণে বৎসর বৎসর পরিপূর্ণ হয়, এবং উহা হইতে একশত কলস স্বর্ণ প্রতি বৎসর পাওয়া যায়। কলসগুলি ভাঙিয়া ঐ স্বর্ণ বাহির করিয়া লইতে হয়, সুতরাং সে গুলি সব মাটির হওয়া চাই। কথিত ফোয়ারার নিম্নে এক প্রকার লৌহ পাওয়া যায় উহা অতি বিচিত্র গুণসম্পন্ন। ইতিহাস রচয়িতার নিকট ঐ লৌহের দুইখানি তরবারি ছিল—একখানি পারস্যরাজের, অপর খানি রাজমাতার দত্ত। মাটিতে

পুতিয়া রাখিলে উহা ঝড় বৃষ্টি নিবারণ করে। পারস্যরাজ দুইবার উহার পরীক্ষা করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

অপর একটী ফোয়ারার জল তুলিবামাত্র জমিয়া যায়। তখন উহার কিয়দংশ মাত্র কাহারও গলাধঃকরণ হইলে, তাহার অন্তরের সমস্ত কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে। রাজা অভিযুক্ত ব্যক্তিগণকে ঐ দ্রব্য খাওয়াইয়া মনের কথা বাহির করিয়া লন।

ভারতবর্ষের মধ্যভাগে এক জাতি ক্ষুদ্রাকার মনুষ্য আছে। উহাদের মধ্যে দীর্ঘাকারেরা দেড়হাত মাত্র। উহারা পশ্চাদ্ভাগে কেশ আজানুলম্বিত করিয়া রাখে, এবং সম্মুখে শ্মশ্রু সেইরূপ বিলম্বিত করিয়া দেয়। জানুর নিম্নে কেশ এবং শ্মশ্রুতে একত্রে বাধিয়া দেয়—আর বস্ত্রাদি পরিধানের প্রয়োজন হয় না। উহাদের মেষ সাধারণ মেষশাবকের ন্যায় এবং বৃষ অশ্ব গর্দ্দভাদি সাধারণ মেষ অপেক্ষা ছোট। এই বামনেরা বড় ধনুর্ব্বিদ্যানিপুণ তাই ভারতবর্ষের রাজা তিন হাজার বামনসৈন্য রাখেন। উহারা পরম সত্যবাদী। শিকারী পক্ষীর সাহায্যে উহারা খরগস এবং শৃগালাদি শিকার করে। ঐ দেশে একটী হ্রদে এক প্রকার তৈল উৎপন্ন হয়। নির্ব্বাত সময়ে হ্রদের উপর ঐ তৈল ভাসিয়া বেড়ায়, তখন বামনেরা ছোট ছোট নৌকা করিয়া গৃহকার্য্যের নিমিত্ত ঐ তৈল লইয়া আইসে। শস্যতৈল যে উহাদের মধ্যে প্রচলিত নাই এমন নহে। তবে হ্রদ তৈলই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

পার্ব্বত্যপ্রদেশে আর এক জাতীয় মনুষ্য আছে। উহাদের কুকুরের মত মুখ, বন্য পশুর চর্ম্ম পরিচ্ছদ এবং খাদ্য অপক্ক মাংস। মানুষের ভাষায় উহারা কথা কহিতে পারে না—কুকুরের মত ডাকে—তবে আপনা আপনি কথা বুঝিতে পারে, ভারতবর্ষীয়দিগের কথা বুঝিতে পারে, এবং আকার ইঙ্গিতে উহার উত্তর দেয়। উহাদের কুকুরের মত থাবা—একটু বেশী বড় এবং গোলাল। অন্য ভারতীয়দিগের ন্যায় ইহারাও পরম ন্যায়বান এবং আচার-সম্পন্ন।

ডুম্বুরের ভিতর যে প্রকার পোকা থাকে সেই জাতীয় ৭।৮ হাত লম্বা এবং দুই হাতে বেষ্টন করা যায় না এরূপ পরিধিবিশিষ্ট, এক প্রকার পোকা ভারতবর্ষের নদীতে আছে। উহার উপরে একটী এবং নিম্নে একটী দাঁত

আছে, উহাদের দ্বারা শিকার উদরস্থ করে। দিবসে নদীর নীচে মাটীর ভিতর থাকে—রাত্রে তীরে উঠিয়া বিচরণ করে। সেই সময় গরু ছাগল যাহা সুমুখে পড়ে দাঁতে টানিয়া নদীতে আনিয়া মারিয়া খায়। বড়সিতে ছাগল মেষ বাঁধিয়া মাছ ধরার মত ঐ জন্তু ধরিতে হয়। উহার এক প্রকার তৈল প্রস্তুত হয়, রাজা ভিন্ন আর কেহ সেই তৈল ব্যবহার করিতে পায় না। যেখানে পড়ে আগুনের মত তাহাই ধরিয়া উঠে এবং সেই আগুনে কাষ্ঠ পশু দগ্ধ হয়। কঠিন কৰ্দ্দম নিক্ষেপ না করিলে সে আগুণ নেবে না।

পার্ব্বত্যপ্রদেশে আর এক প্রকার মানুষ আছে। সেখানে স্ত্রীলোকেরা জীবনে একবার মাত্র গর্ভিনী হয়। বালক বালিকাদের দাঁতগুলি বেশ সাদা হয় কিন্তু চুল ও ভ্রূও সেই বর্ণের। ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমের পর কেশ এবং ভ্রূর বর্ণ কাল হইতে আরম্ভ হয় এবং ষাট বৎসর বয়সে আর এক গাছিও শাদা চুল থাকে না। হাতে পায়ে উহাদের আটটী করিয়া আঙুল হয় এবং কান কাঁধ পর্য্যন্ত লম্বা এবং পিঠের দিকে পরস্পর সংলগ্ন। যুদ্ধকার্য্যে ইহারা বিলক্ষণ পটু।

উত্তর ভারতবাসিরা ১৩।১৪ হাত লম্বা হয় এবং দুই শত বৎসরের অধিক বাঁচে।

নদীতে পন্তর্ব্ব (Pantarba) নামে এক প্রকার পাথর আছে। বাক্ট্রিয়া-নিবাসী নাবিক ৪৭৭ খানি বহুমূল্য প্রস্তরখণ্ড নদীতে নিক্ষেপ করিলে ঐ পন্তর্ব্ব সব আত্মসাৎ করিয়া লইল।

ভারতবর্ষের কুকুরদিগের আকার অতি বৃহৎ। উহারা সিংহের সহিত যুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়।

সিন্ধু নদের তীরে যে সকল খাকড়া জন্মে, উহাদের পরিধি দুই হাতে বেষ্টন করা যায় না এবং দৈর্ঘ্যে উহারা প্রকাণ্ড অর্ণবপোতের মাস্তুলের সমান।

সূর্য্যদেব দশগুণ বর্দ্ধিত আকারে ভারত আকাশে সদা বিরাজমান। তাঁহার অসহনীয় তেজে কতই না লোক মরে। সার্ডাস পর্ব্বত হইতে ১৫ দিনের পথে এক নির্জ্জন পবিত্র স্থান আছে। ভারতবাসীরা এই স্থানে সূর্য্য ও চন্দ্রদেবের উপাসনা করে। বৎসর বৎসর পঁয়ত্রিশ দিন এই খানে সূর্য্যকিরণ মন্দ এবং অনায়াসসহ্য থাকে—উপাসকেরা সচ্ছন্দে পূজা অর্চ্চনা সমাধা করিয়া যায়।

ভারতবর্ষে শূকর নাই—বন্যও না—পালিতও না। এক প্রকার ক্ষুদ্র বানরের আট হাত লেজ।

ভারতবাসিদিগের কখন কোন প্রকার শিরোরোগ, দন্তরোগ, চক্ষুরোগ, মুখ রোগ—কিম্বা শরীরে কোন ক্ষত হয় না। উহারা ১২০, ১৩০, ১৫০, এবং দীর্ঘজীবিরা ২০০ বৎসর বাঁচে।

ভারতবর্ষীয়দিগের সত্যনিষ্ঠা রাজানুরক্তি, এবং মৃত্যুভয়শূন্যতার বিস্তর প্রশংসা এই ইতিহাসের অনেক স্থলে আছে। লেখক মহাশয় উপসংহারে বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সে সমস্ত বিষয় ইতিহাসে লেখা হইল—সব নিতান্ত সত্য—হয় তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন না হয় বিশেষ সম্ভ্রান্ত বিশ্বাসী দর্শকের মুখে শুনিয়াছেন। সেই বিচিত্র ভূমি সম্বন্ধে আরও বহুবিধ বিচিত্র কথা তাঁহার জানা আছে কিন্তু সত্যমূল ইতিহাসগ্রন্থে তাহার সন্নিবেশ কেমন করিয়া করেন? লোকে যদি গল্পই মনে করে!!!

বিবাহের ঘটকালি।

গৃহিনীরা ইদানিং সকল বিষয়ের কর্ত্তৃত্ব একচেটে করিয়া লইয়াছেন—ব্যয় ভূষণ লৌকিকতা সামাজিকতা, সকলই এখন তাঁহাদের হাতে। বিবাহ সম্বন্ধেও তাঁহারা কর্ত্তা। পুরুষ ঘটকেরা অন্দর মহলে যায় না, সুতরাং আর ঘটকালি পায় না, কাজেই তাহাদের সে ব্যবসা ছাড়িতে হইয়াছে। তাহাদের পরিবর্ত্তে এখন স্ত্রীলোক ঘটক।

কিন্তু একটু গোল বাধিয়াছে। যেখানে বাল্যবিবাহ প্রচলিত সেখানে ঘটকের কার্য্য বড় গুরুতর। সে বিষয় একটু বিশেষ করিয়া বলা আবশ্যক। বৈজিক তত্ত্ব ভাল রূপ না জানিলে ভাল ঘটক হইতে পারে না।

বংশভেদে আকার প্রকার সকলই প্রভেদ হয়, ইহা মোটামুটি অনেকেই জানেন। অনেকেই দেখিয়াছেন কোন কোন বালক গঠনে ঠিক তাহার পিতার মত, কেহ বা স্বরে পিতার মত, কেহ বা অঙ্গচালনায় পিতার মত। কিন্তু অল্প লোকেই ইহার হেতু অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। প্রকৃত হেতু নির্দ্দেশ

করা কঠিন। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে পিতার শারীরিক ও মানসিক দোষগুণসকল বীজবাহিত হইয়া সন্তানে যায়। এই কথা শুনিতে সামান্য কিন্তু বুঝিতে তত সামান্য নহে। বুঝিতে গেলে অবশ্য মনে ধারণা করিতে হইবে যে পিতৃবীজে পিতার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অংশ, শিরা মস্তিষ্কের অংশ, রাগ দ্বেষের অংশ, রোগের পর্য্যন্ত অংশ আছে! আশ্চর্য্য!

এই আশ্চর্য্য ব্যাপার আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা জানিতেন? তাই কৌলিন্যের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং তাই কুলীনদিগের বিবাহ সম্বন্ধে এত বাঁধাবাঁধি হইয়াছিল। রাজ্যমধ্যে বিশেষ গুণবিশিষ্ট লোক বাছিয়া কৌলিন্যের সৃষ্টি হয়, এবং রাজ্যে সেই সকল গুণরক্ষার্থ কুলীনদের বিবাহ লইয়া আঁটাআঁটি করিতে হইয়াছিল। গুণসম্পন্নের বংশে দোষবিশিষ্ট রক্ত মিশ্রিত হইয়া গুণধ্বংস না হয় এই জন্য কুলীনের বিবাহ কুলীনের বংশে, অন্ততঃ শ্রোত্রীয় বংশে হইবে, নিয়ম করা হইয়াছিল। কুলীনেরা নবগুণবিশিষ্ট শ্রোত্রীয়রা অষ্টগুণ বিশিষ্ট। প্রভেদ গুরুতর নহে। কিন্তু সে নিয়ম রক্ষা হইল না। কুলীন অকুলীনের ঘরে বিবাহ করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের কুল ধ্বংস হইতে লাগিল অর্থাৎ কুলীনসন্তানদের গুণক্ষয় হইতে লাগিল, ক্রমে তাঁহাদের অধঃপতন হইল। তাঁহারাই ভঙ্গ কুলীন, বহু পুরুষ হইলে, তাঁহাদের কুলীনবংশজ অথবা সচরাচর কেবল "বংশজ" বলে। ইংলণ্ড, ফরাসিস প্রভৃতি দেশের (Breeders) পশুপালকেরা বিশেষ জানে যে পশুদের কোন ভাল গুণ রক্ষা করিতে হইলে দোষাশ্রিত অপর বংশের সহিত নির্লেপ রাখিতে হয়, অথচ দীর্ঘকাল পুরুষানুক্রমে স্ববংশে শাবক উৎপাদন করাইলে ক্রমে সে বংশ খর্ব্ব ও হীনবীর্য্য হইয়া পড়ে, এমন কি, কখন কখন বংশলোপ হইয়া যায়; এই জন্য মধ্যে মধ্যে অপর বংশের রক্ত মিশ্রিত করিতে হয়। আমাদের মধ্যে সেই জন্য পিতৃ মাতৃ গোত্রে বিবাহ নিষেধ আছে। কিন্তু দেবীবর ঘটকের মস্তকে বজ্রপাত হউক, তিনি পালটী ঘর বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, সেই জন্য স্ববংশে বিবাহ করার ফল ফলিয়াছে, দুই বংশে পুরুষানুক্রমে বিবাহ হইলে উভয় বংশের রক্ত এক হইয়া যায়, সুতরাং স্ববংশে বিবাহের ফল ফলে!

এখন বোধ হয় বুঝা গেল বিশেষ বংশপরিচয় ব্যতীত সুবিবাহ হইতে পারে না। বংশপরিচয় দিবার জন্য আমাদের ঘটক ছিল; আমরা সেই ঘটকের পদ এখন এবালিস করিতে বসিয়াছি, দুর্ভাগ্য! ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে অদ্যাপি ঘটক হয় নাই, কিন্তু ঐ সকল দেশের চতুষ্পদের ঘটক হইয়াছে তাহারা ইংলণ্ডে ব্রিডার (Breeders) বলিয়া খ্যাত। তাহাদের যত্নেই উরোপের পশু ক্রমেই উন্নত হইতেছে। গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ডবাসী মনুষ্য অপেক্ষা বোধ হয় পশুর উন্নতি অধিক হইয়াছে। ইহার কারণ চতুষ্পদীদের উপযুক্ত ঘটক আছে, দ্বিপদীদের তাহা নাই।

ঐ সকল দেশের (Breeders) পশুপালকদের নিকট যাও, তাহারা কোন্ ঘোড়া কোন্ বংশোদ্ভব; কোন্ কুক্কুর কোন্ কুলজ বলিয়া দিবে, হয় ত বলিবে অমুক ঘোটকের এই গুণ ছিল, তাহার বংশপরম্পরা সেই গুণ চলিয়া আসিতেছিল, পরে বিপরীত দোষবিশিষ্ট অন্য বংশীয় ঘোটকের রক্ত মিশ্রিত হইয়া সে গুণ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। মনুষ্য সম্বন্ধে এই সকল পরিচয় দিতে পারে এরূপ ব্যবসায়ী আবশ্যক। আমাদের পুরুষ ঘটক, আবশ্যক জানাইলে, সে পরিচয় দিতে পারিত। কিন্তু এখন স্ত্রীলোক ঘটক তাহারা কেবল অলঙ্কারের পরিচয় দিতে পারে, আবশ্যকীয় বিষয়ের পরিচয় দিতে অশক্ত। আবশ্যকীয় বিষয় কি তাহা গৃহিণীরা জানেন না, সুতরাং এক্ষণে তাহার সনুসন্ধান হয় না।

কর্ত্তৃঠাকুরাণীদের সাহায্যার্থে আমরা নিম্নে কয়েকটি আবশ্যকীয় কথা লিখিলাম, ইচ্ছা হয় সন্তান সন্ততির বিবাহ দিবার সময় এইগুলি স্মরণ করিবেন।

প্রথম। রোগগ্রস্ত বংশে বিবাহ নিষেধ। সকল রোগ কুলজ নহে, কাশ কুষ্ঠ প্রভৃতি কুলজ রোগ, রাগ দ্বেষ উন্মাদ প্রভৃতি ও কুলজ রোগ। এই সকল রোগ যে সকল বংশে আছে, সে বংশ পরিত্যজ্য। পাগলের পুত্র পাগল হয়, কখন কখন পুত্র পাগল না হইয়া পৌত্র পাগল হয়। অনেক কুলজ রোগ এক পুরুষ অন্তর প্রকাশ হয়, বিশেষতঃ কুষ্ঠরোগ। পিতার যে বয়সে কুলজ রোগ প্রকাশ পাইয়াছে, পুত্রের প্রায় সেই বয়সে কুলজ রোগ আরম্ভ হয়। তৎপূর্ব্বে বিবাহের বয়সে সেই রোগ নাই বলিয়া

ভবিষ্যতে হইবে না অনুভব করা ভুল। কোন কুলজ রোগ কেবল পুত্রগত থাকে; আবার কোন কোন বংশে সেই কুলজ রোগ পুত্র কন্যা উভয় শাখা আক্রান্ত করে। এ বিষয়ের অনবধানতা হেতু কঠিন কুলজ রোগ ক্রমেই বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। অনেক পবিত্র রক্ত অপবিত্র হইয়া যাইতেছে, সংসারের সুখ নষ্ট হইতেছে।

দ্বিতীয়। অনেক বংশের আয়ু দীর্ঘ থাকে, পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ সকলেই দীর্ঘজীবী হয়। অতএব বিবাহ স্থির করিবার সময় প্রথম কেবল এই সকল বংশের সন্তান সন্ততি অনুসন্ধান করা উচিত।

তৃতীয়। মৃতবৎসার কন্যা প্রায়ই মৃতবৎসা হয়, অতএব সে কন্যা পরিত্যাগ করিবে।

চতুর্থ। স্বল্পপুত্রীর কন্যা পরিত্যাগ করিবে। না করিলে বংশ হানি হইবার সম্ভাবনা।

পঞ্চম। কলহপ্রিয়ার কন্যা পরিত্যাগ করিবে, করিলে, সংসারে কলহ নিবৃত্ত থাকে।

ষষ্ঠ। কন্যা অপেক্ষা বরপাত্রের বয়স ন্যূনকল্পে পাঁচ বৎসরের অধিক হওয়া উচিত।

সংসারের সুখ বিবাহের উদ্দেশ্য। সুস্থ শরীর, শান্ত স্বভাব এবং ধনোপার্জ্জন প্রায় এই তিন লইয়া সংসারের সুখ। কেবল ৪ টা পাস করিলেই যে সংসারের সুখ হইবে এমন নহে। ৪ টা পাসকরা বর পাত্র ধনোপার্জ্জন করিলে করিতে পারে, কিন্তু তাহাই বলিয়া যে সে সুস্থশরীরী কি শান্ত স্বভাবাপন্ন হইবে, এরূপ বলা যায় না। সুতরাং কেবল পাসকরা পাত্র অনুসন্ধান করিলে বিবাহ সুবিবাহ হইবে এরূপ বিবেচনা গৃহিণীরা না করিলে ভাল হয়।

ফলিত জ্যোতিষ।

জ্যোতিষশাস্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত। গণিত জ্যোতিষ এবং ফলিত জ্যোতিষ।

গণিত জ্যোতিষের দ্বারা চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতির গতি প্রকৃতি এবং সংস্থিতি নিরুপণ করা যায়। ইংরাজী নাম Astronomy

ফলিত জ্যোতিষের দ্বারা গ্রহগণ হইতে মনুষ্যের জীবনের যে ফলাফল, তাহা নিরূপিত হয়। ইংরেজী নাম Astrology

উভয় শাস্ত্রই অতি প্রাচীন কাল হইতে পৃথিবীতে অধীত হইতেছে। ইউরোপীয়গণ গণিত জ্যোতিষের বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছেন। জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী সম্বন্ধে তাঁহারা যে সকল অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছে।, তাহা বিস্ময়কর, এবং অপার আনন্দের কারণ। ঈশ্বরতত্ত্ব ভিন্ন মনুষ্যের অনুশীলনীয় এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার আর কিছুই নাই।

ফলিত জ্যোতিষের সেরূপ উন্নতি ঘটে নাই। ফলিতজ্যোতিষ প্রাচীন কালে যেমন ছিল. এখন তেমনি আছে। বরং ইহা কিয়দংশে বিলুপ্ত হইয়াছে। ইউরোপে ইহার কছুমাত্র আদর নাই। ইউরোপীয় পণ্ডিত-গণ এবং জনসাধারণ ইহার প্রতি বিশ্বাসবান নহেন। যে দুই এক জন ইহার প্রতি কিছু আস্থা প্রদর্শন করেন, তাঁহারা জনসাধারণের নিকট উপহাস প্রাপ্ত হন।

ইউরোপে এইরূপ। ভারতবর্ষে ফলিত জ্যোতিষের চর্চ্চা আজি ও আছে। কিন্তু যাঁহাদিগের "কৃতবিদ্য„ বলা যায়. তাঁহারা ইউরোপীয়ের শিষ্য, অতএব তাঁহারাও সচরাচর ফলিতজ্যোতিষ ঘৃণা করিয়া থাকেন। সুশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্র গণিতজ্যোতিষ অধ্যয়ণ করিয়া থাকেন, কিন্তু ফলিত জ্যোতিষ আচার্য্য দৈবজ্ঞ ভিন্ন প্রায় কেহ অধ্যয়ন করে না। আচার্য্য দৈবজ্ঞগণ যে শ্রেণীর লোক, তাহাদিগের দ্বারা শাস্ত্রের উন্নতি সাধন সম্ভাবনা নাই।

ফলিত জ্যোতিষের প্রতি এই অনাস্থার প্রধান কারণ এই যে ইহা সত্য শাস্ত্র বলিয়া জনসাধারণের, বিশেষতঃ পণ্ডিতগণের, বিশ্বাস নাই। তাঁহারা বলেন'

যে আকাশে গ্রহ রহিল,—গ্রহটা এ দিকে না থাকিয়া ও দিগে আছে, বলিয়া কোন মনুষ্য ধনবান্ কোন মনুষ্য দরিদ্র হইবে, ইহা অসম্ভব কথা। শনি তুলায় থাকিলে জাত ব্যক্তির ইষ্ট সাধন করিবেন, এবং আকাশের বিপরীত ভাগে অর্থাৎ মেষে থাকিলে জাত ব্যক্তির অনিষ্ট সাধন করিবেন এ সকল ব্যাপারের কোন কারণ দেখা যায় না। গ্রহগণের দ্বারা মনের সুখ দুঃখ কেন সাধিত হইবে?

প্রত্যুত্তরে দুই এক জন শিক্ষিত জ্যোতির্ব্বিদ যেরূপ বিচারের দ্বারা স্বপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করেন, তাহা হৃদয়গ্রাহী হয় না। হোমিওপাথিক বটিকা বা বসন্তবীজের উপমা ঠিক সঙ্গত নহে। অমাবস্যা পূর্ণিমায় জলোচ্ছ্বাস বা মনুষ্যের রোগ বৃদ্ধি হয় বলিয়া স্থির করা যায় না, যে জড় পদার্থ ভিন্ন মনুষ্যের অদৃষ্টের উপর তাহাদের কোন আধিপত্য আছে। পূর্ণচন্দ্র শ্লীপদীর পদস্ফীতির আধিক্য সাধন করিতে পারেন স্বীকার করিব, কিন্তু তা পারেন বলিয়া যে তিনি জন্মকালে দশম রাশিতে থাকিলে চাকরি যোটাইয়া দিবেন, এতটা কেহ স্বীকার করিবে না। রবি জ্যৈষ্ঠ মাসের কিরণজালে সকলেরই শিরঃপীড়া সমুৎপন্ন করিতে পারেন, ইহা স্বীকার করা যায়. কিন্তু তাই বলিয়া তিনি জন্মকালে লগ্ন হইতে ষষ্ঠ স্থানে থাকিলে আমার সব শত্রুগুলি নষ্ট করিবেন. এতটা স্বীকাব করা যায় না। আর এই যে এতটুকু শারীরিক সম্বন্ধ চন্দ্র সূর্য্যের পক্ষে স্বীকার করা যায়, মঙ্গল বুধাদি গ্রহ সম্বন্ধে তাহাও স্বীকার করা যায় না।

কিন্তু ফলিত জ্যোতিষের পক্ষ হইতে আর এক উত্তর আছে। যাহারা আর সকল বিজ্ঞান শাস্ত্র অমোঘ অব্যর্থ বলিয়া স্বীকার করেন, আর ফলিত জ্যোতিষের প্রতি উপহাস করেন, তাঁহাদিগের যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে আপনারা গণিত জ্যোতিষে কেন শ্রদ্ধাবান্ আর ফলিত জ্যোতিষে কেন অশ্রদ্ধাবান্, তাহা হইলে তাঁহারা যে ঠিক একটা ন্যায্য উত্তর দিতে পারিবেন এমত বোধ হয় না। তোমরা বলিতেছ শনি মঙ্গলাদির অবস্থিতি অনুসারে মনুষ্য কেন সুখী বা দুঃখী হইবে, তাহার কারণ দেখা যায় না; ভাল, তোমরা বলিতে পার কি, প্রত্যেক পরমাণু অপর সকল পরমাণুকে কেন আকৃষ্ট করিবে? জন্ম বা বর্ষলগ্ন হইতে অষ্টমে পাপগ্রহ থাকিলে রোগ হইবে কেন, তাহা বলা

যায় না বটে, কিন্তু ম্যালেরিয়া লাগিলেই বা রোগ হয় কেন, তাহারই বা কোন উত্তর আছে কি? * বৃহস্পতি বা শুক্র কেন্দ্রে বা ত্রিকোণে থাকিলে মনুষ্যের শুভ ঘটিবে কেন, তাহার কোন উত্তর দিতে পারা যায় না বটে, কিন্তু কুইনাইনে জ্বর ভাল হয় কেন, তাহারই বা কেহ কি কোন উত্তর দিতে পারে? এ বিষয়ে ফলিত জ্যোতিষে বা বিজ্ঞান শাস্ত্রে কোন প্রভেদ দেখা যায় না। কিন্তু ফলিত জ্যোতিষের বিপক্ষীয়েরা এ কথার একটা উৎকৃষ্ট প্রত্যুত্তর করিতে পারেন। তাঁহারা বলিবেন "কেন হয়?" ঈদৃশ প্রশ্নই অবৈজ্ঞানিক। বিজ্ঞান শাস্ত্র ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তর দেয় না। বিজ্ঞান শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, "হইবার প্রকরণ কি?" এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া। পরমাণু মাত্রকে অপর পরমাণু মাত্র কেন আকৃষ্ট করিবে, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বিজ্ঞান শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে। শক্তিটা আকর্ষণী কি বিকর্ষণী, বিজ্ঞান তাহাই ঠিক করিয়া বলিতে পারে না। কিন্তু ইহা বিজ্ঞান ঠিক করিয়া বলিতে পারে, এই শক্তির বল, ব্যুৎক্রমে দূরতার বর্গানুযায়ী। ফলিতজ্যোতির্ব্বিদও বলিতে পারেন বটে, যে তুলায় শনি কেন বলবান্ এবং মেষে শনি কেন দুর্ব্বল, আমি এ কথার উত্তর দিতে পারিনা বটে, কিন্তু আমিও বলিতে পারি যে শনি ও অংশ কলানুসারে এবং মিত্রামিত্র গ্রহের দৃষ্টিযোগানুসারে ফলদান করেন। এতদূর ফলিত জ্যোতিষে এবং অন্য বিজ্ঞানে সাদৃশ্য বটে, কিন্তু অপর সকল বিজ্ঞানের মূল, ভূয়োদর্শন। দেখা গিয়াছে, যে যাহা সর্ব্বদাই ঘটে, তাহাই আবার ঘটিবে। তাহাই বিজ্ঞানের মূল। দেখাগিয়াছে যেখানে ক

---

* ম্যালেরিয়া এক জাতীয় বিষ—ইহা রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হইলে প্রকৃতি তাহাকে পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা করে—ইত্যাদিবৎ বাক্য উত্তর নয়। বিষ, এখানে পারিভাষিক শব্দ মাত্র—রক্তের সঙ্গে মিশিলে রোগ হয়, বলিয়াই উহাকে বিষ বলিতেছ। আসল কথাটা, ম্যালেরিয়া রক্তের সঙ্গে মিশিলে রোগ হয় কেন? প্রকৃতি তাহাকে নির্গত করিবার চেষ্টা করে কেন? ইহার কোন উত্তর নাই। আদৌ, ম্যালেরিয়া বলিয়া যে কোন পদার্থ আছে, তাহারই বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই।